সূর্যের নারীরা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

● পরিবেশক ●

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কালেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
পরেশ ভট্টাচার্য
৩৫/ডি, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
কলকাতা বইমেলা, ১৯৬৫

মুদ্রক :
শ্রীললিতমোহন পান
লক্ষ্মী জনার্দন প্রিণ্টার্স
২৬/২এ, সিমলা রোড
কলিকাতা-৬

সূর্যের নারীরা

॥ এক ॥

মোহনপুরের চৌধুরীদের মেছোঘেরি। নদীর জলে বানভাসি। কখনও পানকৌড়ি ডুবভাসি খেলে, কখনও মাছপিয়াসী মাছরাঙা ছোঁ মেরে জল ছোঁয়, মাছ ধরে ; কখনও বা জলপিপি স্থির চোখে আঁক কষে, তারই মধ্যে, বাতাসের ঠেকায় জল নাচে।

পিছনে, খানিক দূরে তাঁদেরই বাগান। বিঘে দশেক জমিতে কত কি গাছ! সবই চিরহরিৎ আর পর্ণমোচী। বাগান থেকে দিনদুপুরে রাতবিরেতে ওঠে গা-ছমছমে সব শব্দ। ছন্দময় অথবা ছন্দহীন। সেই বাগান ছুঁয়ে নতুন বাড়ি। দোতলা। বাউণ্ডারি ওয়াল। কলাপসিবল গেট। একপাশে মার্বেল স্ল্যাব। তাতে লেখা—নিভাননী স্মৃতি। গেট থেকে বারান্দা পর্যন্ত পাঁচ ফুট চওড়া পথ। কেয়ারি করা চুন-রঙ ইট দু'পাশে। সেই পথ দিয়ে যাতায়াতের সময়, বাঁ কিংবা ডান যেদিকে তাকান যাক, চোখে পড়বে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, সানফ্লাওয়ার আর ডেইজির নরম সোহাগি হাতছানি।

এককালের প্রবলপ্রতাপ জমিদার দীননাথ চৌধুরীর ভগ্নপ্রায় চকমিলান বাড়ি ভেঙে সেখানেই তাঁর একমাত্র পুত্র অলকেন্দু চৌধুরী এই বাড়ি তৈরি করিয়েছেন। রিটায়ার করার পর কলকাতার বাগানবাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। তারপর চলে এসেছিলেন এখানে, এই গ্রামে।

এবং দেখেছিলেন গ্রামের মানুষের মুখে হাসি নেই। ঢলঢলে চোখমুখও নেই। দৃষ্টি যখন-তখন ধারালো, কাতর কিংবা উদাস হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা সিনেমার নায়ক-নায়িকার মত। যে কোন সরল ভাবনাচিন্তা জটিল করে মনমরা হয়ে থাকছে সারাক্ষণ। তিনি চমকে উঠেছিলেন। চমকে উঠেছিলেন সেই জীবন দেখে যেখানে বোধনের আগেই বিজয়ার বাজনা বাজছে।

তিনি গ্রামকে দেখেছিলেন এক আশ্চর্য চোখে যা জমিদারি রক্তের পালটি নয়। দেখেছিলেন গ্রাম নয়, যেন জোতদারের বাস্তুভিটে। গরীব ভূমিহীন চাষী চাষবাস করে ফসল ফলাচ্ছে, কিন্তু তা দশ আঙুলে নিংড়ে নিচ্ছে জোতদার। অবশ্য তলানিটুকু থাকছে। তাতে কি পেট ভরে! সেই খালি পেটেই মুরগির ছানার মত এণ্ডিগেণ্ডিতে ঘর ভর্তি করছে। কাঁচা ঘর। নড়বড়ে। মাথায় গোলপাতা কিংবা খড়। বুকের চার দিকে মাটি নিকানো বাঁশ-কঞ্চির বেড়া। পথঘাট অনেক আছে। তাদের বুকে বর্ষায় থকথকে কাদা আর শীতে এবড়োখেবড়ো শুকনো মাটির ধূসর কাঠিন্য।

কি অসহায় অবস্থা মানুষের! অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করেছিলেন অলকেন্দু। একটা চিন্তাই সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল। এরা অশিক্ষিত। অদৃষ্টের ক্রীতদাস। এদের যদি শিক্ষিত আর রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে একদিন এরা এই সমাজে সঠিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেই।

দুরূহ কাজ। যতই দুরূহ হোক, অলকেন্দু পিছপা হননি। গ্রামের মানুষের ভাগ্য গড়ার কাজে নেমেছে পঞ্চায়েত। তার মনে হয়েছিল গোধিকারূপিনী দেবী চণ্ডীর মত পঞ্চায়েত এসেছে ফুল্লরা-কালকেতুর পরিবারে দুঃখ ঘোচাতে। এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই তিনি লক্ষে পৌঁছতে পারবেন। তিনি রাজনীতির আখড়ায় মহড়া দেননি। সরাসরি পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, জিতেছিলেন এবং খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রধানও হয়েছিলেন।

শুরু হয়েছিল অলকেন্দুর অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বছর চারেকের মধ্যে তিনি অশিক্ষার ভয়ংকর ড্রাগনটাকে তাড়াতে না পারলেও কব্জায় এনে ফেলেছিলেন, দারিদ্র্যের বিবর্ণতার গায়ে স্বচ্ছলতার প্রলেপ দিয়েছিলেন। আমলানী, হরিপুর, ঢোলটুকারী, মোহনপুর, তকিপুর, সিরাজপুর, রাঘবপুর, আষাঢ়িয়া, সায়মলপুর, সুন্দরিয়া, নন্দনপুরের মানুষের চোখের জলকে বুকের আত্মবিশ্বাসে পরিণত করেছিলেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার আমলানী গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রধান।

মায়ের যে স্মৃতি মনের তলায় একদিন চাপা পড়ে গিয়েছিল তা মায়ের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে পা দিতেই মনের ওপর উঠে এসেছিল। তাঁর মা নিভাননী ছিলেন সতীসাধ্বী এক কুলবধূ। রক্ষণশীল জমিদার বংশের লক্ষ্মণের গণ্ডি ডিঙিয়ে হয়েছিলেন অসতী। জমিদার দীননাথ চৌধুরী মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে পড়ে থাকতেন দিনরাত। তাঁকে কিছু না জানিয়ে নিভাননী অলকেন্দুকে কলকাতার বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। এবং ভর্তি করে দিয়েছিলেন কলেজে! এতে মায়ের কোন অপরাধ খুঁজে পাননি অলকেন্দু। সেই নিভাননীকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন তাঁর স্বামী যাঁর জন্যে হয়ত তিনি কত শিবপুজো করেছিলেন। এই কথা মনে হলে অলকেন্দুর মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মেয়েদের অসহায় অবস্থা তাঁকে কাঁদায়। চারপাশে তাকান তিনি, দেখতে পান তারা পুরুষের নিজস্ব ছাঁচে তৈরি মায়াবী সংসারে বন্দিনী। যুগ যুগ ধরে পুরুষ মনু-সংহিতায় বর্ণিত মনুর নির্দেশ,

পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থবিরে ভাবে, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

(নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর আর বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকিবেন। স্ত্রীগণের পক্ষে স্বাধীন হওয়া উচিত নয়।) অদ্ভুত দক্ষতা আর ছলাকলায় নারীর জীবনে মানানসই করে দিয়েছে। একপেশে নির্দেশ। কোন মেয়ের কিন্তু তা মনে হয় না। মেয়েরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, পুরুষ যদি নতুন চোখ দিয়ে না দেখে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার না করে, তাহলে তাদের মুক্তি অসম্ভব।

মাঝেমধ্যে নারীর সামাজিক আর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে কত কি চিন্তাভাবনা কাটাকুটি হত। কত কথা মনের তলা থেকে উঠে আসত আর নিচে চলে যেত। একটা তোলপাড় চলত। পঞ্চায়েত নির্বাচন আসার মুখে হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল লীনাই পারবে

নারীকে এই সুষুপ্তি থেকে জাগিয়ে তুলতে। নারীর ঘুম ভাঙলেই পুরুষ তাকে নতুন চোখে দেখতে বাধ্য হবে। ব্রেকফাস্ট টেবিলে একদিন বলেই ফেললেন অলকেন্দু, 'লীনা, তোকে ভোটে দাঁড়াতে হবে।'

লীনা অবাকবিস্ময়ে দাঁড়ানো চোখে অলকেন্দুর দিকে তাকাল।

'আমি ভোটে দাঁড়াব।'

'কেন দাঁড়াবি না? কত মেয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখানে থেমে থাকলেই চলবে না, প্রধানও হতে হবে তোকে।'

'প্রধান।' লীনা স্বগতোক্তির মত করে বলল।

'প্রধান হওয়া এমন কিছু নয়। তোর সে গুণও আছে। আমার বিশ্বাস, তুই-ই পারবি পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আরোপিত সামাজিক অনুশাসনের ঘেরাটোপ থেকে মেয়েদের বের করে এনে তাদের চেতনায় স্বাতন্ত্র্যের শিখা জ্বালাতে—যেখানে তারা কারও মেয়ে, বোন, স্ত্রী কিংবা মা নয়।'

'না না, আমি পারব না কাকু।' বলতে গিয়েও কথাগুলো গিলে ফেলল লীনা। যে বিশ্বাস কিংবা আস্থার সৌধ মনে মনে গড়ে তুলেছেন অলকেন্দু তা ভেঙে দিতে মন চাইল না। সে বলল, 'এ খুব কঠিন কাজ। পারব তো?'

'তোর বুকে ছাইচাপা আগুন। অসহায় মেয়েদের দিকে তাকালেই ঝড় উঠবে বুকে। উড়িয়ে নিয়ে যাবে ছাই। তখন শুধু ধিকিধিকি আগুন। একটু সমর্থনের হাওয়া পেলে তা লকলকিয়ে ছুটবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। পুড়িয়ে দেবে মেয়েদের ব্যক্তিত্ববিনাশক পুরনো মূল্যবোধের ঘেরাটোপ।

অলকেন্দুর কথা লীনার মনকে নাড়িয়ে দিল। হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, চলে গেল ধোলপুর, তিন নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে তার পিতাজির ধাবায়।

সন্ধ্যে রাতমুখো। বড়জোর সাতটা। দিনভর খাটাখাটনি। ক্লান্তিতে বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল বুধুয়া। সেই তন্দ্রার ঘোরে তার মনে হয়েছিল কে যেন তাকে ডাকছে। সবে তেরয় পা দিয়েছিল বুধুয়া। আফোটা দেহের শাখাপ্রশাখায় যৌবনের চাপা উচ্ছ্বাস। জীবনের এ এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণ। স্বপ্নে থোকা থোকা বাসনার ফুল ফোটে। তার বুকের মধ্যেও ফাল্গুনী বাসনা তিরতির করে কেঁপে উঠেছিল। মধুর আবেশে সাড়া দিয়েছিল সে, উঁ। সেই মুহূর্তে উষ্ণ নিঃশ্বাসের ঝড়ে দম নিতে কষ্ট হয়েছিল তার। সেই কষ্টের মধ্যেই ঘুম ভেঙেছিল। আবছা হলেও সে বুঝতে পেরেছিল কে যেন তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে। মুহূর্তে স্প্রিং ছুরির মত সোজা হয়ে উঠে বসেছিল সে। আচমকা তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে লোকটা তার পাশেই কাত হয়ে পড়েছিল। মুখ দিয়ে এই আঘাতের কষ্টের কোন আওয়াজ বের হয়নি। কিন্তু বুধুয়ার মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়েছিল। ভেতরের ধড়ফড়ানিতে তা মিলিয়ে যেতে সময় লাগেনি। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। পাশের ঘরের আলো খোলা জানালা পথে খানিক চলকে পড়েছে লোকটার মুখে। আরে, এ তো সেই পাঞ্জাবী ট্রাক ড্রাইভার। গত পরশু তার

মায়ের সঙ্গে একই বিছানায়···প্রায়ই তার মায়ের কাছে পুরুষ মানুষ আসে। নতুন নতুন। শীৎকারের বিচিত্র শব্দ ওঠে। এ সব শব্দের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। কখনও এ নিয়ে তেমন কোন কৌতূহল চাগতে দেয়নি। কেবল সেদিন কেন যেন এক অদম্য কৌতূহল নিয়ে চুপিচুপি বন্ধ জানলার ফুটোয় চোখ রেখেছিল। ছি ছি! লজ্জা ঘৃণায় মরে যেতে ইচ্ছে করেছিল তার।

লোকটা নিঃসাড়ে পড়ে রয়েছে। চোখ দুটো আধবোজা। হঠাৎ বুধুয়া দেখেছিল লোকটার মাথার কাছে একটা দিশি মদের বোতল। তাদের ধাবায় রোজ এরকম বোতল নিয়ে কত খদ্দের আসে। এ বোতলের মাহাত্ম্য সে জানে। বোতলটার তলানিটুকু যেন গড়াচ্ছিল ভিতরে। মদ যে লোকটাকে খেয়ে নিস্তেজ করে দিয়েছিল তা তখনই টের পেয়েছিল সে। তার ইচ্ছে হয়েছিল সেই বোতল দিয়ে কষে এক বাড়ি মারে মাথায়। লোকটা পশু। মা-মেয়ের ফারাক বোঝে না। মেয়েমানুষ হলেই হল। পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, যদি মরে যায়··সে আর এক হ্যাপা। এর মাঝেই লোকটা উঠে বসেছিল। ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। যেন নেশা কেটে গেছে। হঠাৎ ভয়ের একটা হিমস্রোত মাথা ছুঁয়ে শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নেমে এসেছিল। যেই সে এক পা পিছিয়ে খোলা দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়েছিল লোকটা এক লাফে তার কাছে গিয়ে একটা হাত খপ করে চেপে ধরেছিল। বলেছিল, 'কহাঁ ভাগতী হো? তুমহারে বাপকো নয়া তাজা দো শো রুপয়ে দিয়ে। অভি তুম মেরে দিল কী রাণী।'

বুধুয়া ফুঁসে উঠেছিল, 'বদত্মিজ, তুম মেরা হাত কাহে পকড়া? ছোড়!'

লোকটা প্রায় ষোল আনা চোখ খুলে তার দিকে তাকিয়েছিল। রক্তরাঙা চোখে যেন হলুদ ঘোর। হাত ছেড়ে দিতে হয়নি। নেশার বিবশতায় এমনিই খসে পড়েছিল। হো হো করে হেসে বলেছিল, 'রণ্ডিকী বেটি সতী বননে চলি হ্যা।'

'চুপ শালে কুত্তে। আশনাই করনে কা দিল হ্যায় তো রণ্ডিকা ঘর যা। হিঁয়া ফির কভি মত্ আনা।'

বুধুয়ার চিল্লানি শুনে ছুটে এসেছিল তার মা। 'সোচ সমঝ কর বাত কর। ইয়ে ভাইভারজি আজ রাত তেরা আদমী হ্যায়।'

এই কথা শুনে বুধুয়ার দু'চোখে চিতা জ্বলে উঠেছিল। মুহূর্তে মদের বোতলটা নিয়ে ছুটে গিয়েছিল মায়ের দিকে। বুক থেকে ওড়নি খসে পড়ে যে মাটিতে লুটোচ্ছিল সেদিকে খেয়াল ছিল না। সে বলেছিল, 'চুপ সে রহ্, তুম বহোত কা ঝুটন ফির ইয়ে বাত বোলনে সে তুমহারি হালত বহোত বুরা হোগী।'

ভয়ের কাটব্যাঙটা তার মায়ের বুকের ভিতর তুড়ুক করে লাফিয়েছিল। দু'পা পিছিয়ে গিয়েছিল সে। বোধহয় তার কথা বাইরে দাঁড়িয়ে শুনেছিল তার বাবা। সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকে হুংকার দিয়ে উঠেছিল, বুধুয়া।

ইতিমধ্যে বুধুয়ার কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়েছিল তীব্র রাগের আগুন। মুহূর্তে সে বাবার দিকে তাকিয়েছিল। চেরা গলায় বলেছিল, 'তুম মুঝে রণ্ডি বনানা চাহতে হো। ছি, তুম বাপ হো?'

'ইত্না গোস্সা কি'উ করতী হো ? রে বাপ, তু ভি বেরিয়া কা লড়কী। ইহ তেরা কাম। যা, ড্রাইভার কা বাত মান। ইয়াদ রাখ, ইহ হমারা সমাজ কা রোশন হ্যায়।'

'সমাজ কা রোশন! আপনা বেটি কী ইজ্জত বেচ্ কর মাওজ করনা সমাজ কা রোশন! ঝাড়ু মারতি হুঁ অ্যায়সে রোশন কী।' বলেই সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল।

এতক্ষণ ড্রাইভারের দুটো চোখ যেন জিভ হয়েছিল, কেবলই চেটে যাচ্ছিল বুধুয়ার দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ফুলে ফুলে ওঠা ডাঁসা পেয়ারার মত দুটো স্তন। মদ আর মেয়ে-মানুষের ককটেল বেশ রঙিন ঘোরের মধ্যে নিয়ে নিয়েছিল তাকে। হঠাৎ সেই ঘোর কেটে যাওয়ায় বেশ বিরক্ত হয়েছিল। 'লড়কী বহোত খতরনাক', বিড়বিড় করে বলতে বলতে তার পিছনে পিছনে ছুটেছিল ভাদ্দরের কুকুরের মত।

তালঢ্যাঙা চেহারা। তায় চার-হাতি পদক্ষেপ। কতক্ষণ আর। ক' পা গিয়েই ধরে ফেলেছিল। তারপর শুরু হয়েছিল খিস্তি-খেউড়। 'এ শালী, হারামজাদী। রণ্ডি কা বেটি। মেরা কলেজা ফাঁড়োকে লে যাও গি কাঁহা ? আ, চলি আ।

লাইটপোস্ট থেকে সাদা আলোর ঢল নেমেছিল রাস্তায়। সেই আলো যেন বুধুয়ার বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। সামনের জগতকে অনেক বড় মনে হয়েছিল তার। সুন্দর জীবনে বাঁচার ছোট্ট আশা যা অভাবিত সর্বনাশের নিঃসীম অন্ধকারে নিথর, নিস্পন্দ হয়ে যাচ্ছিল তা আবার চোখেমুখে হাঁটাচলা করতে শুরু করেছিল।

তার হাত লোকটার হাতে। অত্যন্ত সতর্ক হাত। যেন ভীমরুলের মত কামড়ে পড়ে রয়েছে। অগত্যা একটা পুলিশের গাড়ি দেখে সে চিৎকার করে উঠেছিল, বচাও—

গাড়িটা তাদের সামনে ঝপ করে থেমে গিয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে এসেছিলেন অলকেন্দু। তখন তিনি আই পি এস অফিসার। দিল্লীতে থাকতেন। পুলিসি চোখে পরখ করেছিলেন লোকটাকে আর বুধুয়াকে। মেয়েটার চেহারা ছিপছিপে পাতলা। ধবধবে ফর্সা রঙ। পরনে রঙচটা ঘাগরা, কাঁচুলি। চোখমুখে কেমন করুণ আর্তি। লোকটার ঝাঁকড়া চুল, বসন্তের দাগভরা বসা গাল, দগদগে চোখ, বিরংসু চাউনি সব কিছু কেমন ঝানু অসামাজিক লোকের মত। সেই মুহূর্তে তিনি আঁচ করেছিলেন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কিছু ঘটতে পারে। এই তল্লাটের আদিবাসীদের অপরাধের খতিয়ান মোটা। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী নজর কাড়ত পুরনো সামাজিক প্রথার হাত ধরে, বর্তমানে আইনত অবৈধ, আদিম ব্যবসায়ে নিজের বউ-মেয়েকে টেনে আনা। সুতরাং তিনিও তৎপর হয়েছিলেন। ধারালো চোখে গলা তুলে বলেছিলেন, 'এ, ইস লেড়কী কী হাত কি'উ পকড়া ? ছোড় !'

তাঁর বাজখাঁই কণ্ঠস্বরে লোকটা মুখ তুলে তাকিয়েছিল। চোখে চোখ বিঁধতেই ভয় অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরেছিল। তবু অলকেন্দুর আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে অস্ফুটে বলেছিল, 'শালে', বলেই প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

লোকটার বুকের উষ্ণতা বজ্রহীন মেঘের ডাকেই যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তা ভাবতে

পারেননি অলকেন্দু। যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বুধুয়ার দিকে তাকিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কি নাম তোমার ?'

'বুধুয়া।'

'জিস আদমী নে তুমহারা হাত পকড়া থা, কৌন হ্যায় ও ?'

'জি, উহ্ তো ট্রাক ড্রাইভার। হররোজ সাম কো হমারে ধাবা মে আতা হ্যায়।'

'তোমাদের ধাবা আছে ?'

'জি, হাঁ।'

'তব তো সব ঠিক হ্যায়। লেকিন কিঁউ চিল্লাতি থী ?'

বুধুয়ার সহজ সরল কুমারী চোখেমুখে একগুচ্ছ কিংশুক লজ্জা পাপড়ি মেলেছিল। তার ভারেই বোধহয় মুখটা নিচু হয়েছিল। অলকেন্দু তাকিয়েছিলেন তার দিকে। একটু পরে বুধুয়াই লজ্জাবিনম্র গলায় বলেছিল, 'উহ্ আদমী বহোত খারাব হ্যায়। জোরসে হামকো—'

বুধুয়ার অসমাপ্ত কথা বুঝতে কষ্ট হয়নি অলকেন্দুর। একটা অস্বস্তি মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঘের থাবা। এখন, এই মুহূর্তে বাঁচান গেলেও রেহাই পাবে না মেয়েটা। সামাজিক প্রথার অনির্দেশ্য অন্ধকারে হারিয়ে যাবেই। কিন্তু কি করতে পারেন তিনি ? সেই অস্বস্তি প্রবল হবার আগেই বলেছিলেন, 'চলো তোমাকে ধাবায় পেঁছে দিই।'

বুধুয়া বলেছিল, 'আপ কা বাত হাম সমঝা নেহি।'

তখন অলকেন্দু বলেছিল, 'চলো, তুমহে ধাবামে পেঁছা দেগা।

মুহূর্তে বুধুয়ার বুক শ্রাবণের আকাশ। মেঘ গুড়গুড় করে ডেকে উঠেছিল। তার দৃষ্টি, তার মন, তার আশা যা কিছু সামনের জগতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল তা সব দুর্যোগের ঘনঘটায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। দিশেহারা হয়ে সে বলেছিল, 'নেহি, নেহি যাউঙ্গী।' এবং তার সেই আর্তস্বর করুণ কান্নার মত ছড়িয়ে পড়েছিল।

বেশ সমস্যায় পড়েছিলেন অলকেন্দু। না পেরেছিলেন জোর করে ধাবায় নিয়ে যেতে, না ফেলে রেখে চলে যেতে। সেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন। ফুরফুর ধোঁয়া ছেড়ে, ভরভর ধোঁয়া গিলেও কোন সমাধান বের করতে পারেননি। খানিক অসহায় গলায় বলেছিলেন, 'তাহলে কোথায় যাবে ?'

অসহায় গলায় বললেও তার গমগমে গলা বেশ কঠিন শুনিয়েছিল। পুলিসি অভ্যাস তো ! বুকে আবেগ তরঙ্গ নিয়ে রাতে বিছানায় স্ত্রীকে প্রেম নিবেদন করার সময়ও এমন কর্কশ কাঠিন্য ঝড়ে পড়ে।

পুলিসের এমন কণ্ঠস্বরে যম চমকে ওঠে। আর বুধুয়া তো যমের টার্গেট। তার বেতস দেহ থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। সে ভয়কাঁপা গলায় বলেছিল, 'জি, ম্যায় নেহি জানতী।'

গাড়িতে বসে সব কিছু চুপচাপ শুনছিলেন সুরমা। অলকেন্দুর স্ত্রী। 'ম্যায় নেহি জানতী' বাক্যটা হঠাৎ তাঁর বুকের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল যেন। মুহূর্তে এক

অব্যক্ত ব্যথায় তার মুখের আলো ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তিনি গাড়ি থেকে নেমে বুধুয়ার কাছে গিয়েছিলেন। ঘনঘোর দুর্যোগে পালকে মুখ গোঁজা ভীতসন্ত্রস্ত পাখির মত জড়োসড়ো দাঁড়িয়েছিল সে। তাকে দেখে খুব মায়া হয়েছিল। তার চিবুক তুলে ধরে স্নেহভরা গলায় বলেছিলেন, 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে মা?'

হঠাৎ যেন সীমাহীন সমুদ্রে কূল খুঁজে পেয়েছিল বুঁধুয়া। সেই অপ্রত্যাশিত পাবার আনন্দে তার চোখ দিয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়েছিল। ঈষৎ কাঁপা গলায় সে বলেছিল, 'জি, হাঁ। ম্যায় শরিফ লেড়কি কী তরহ্ জিনা চাহ্‌তী হু চাচী।'

এ জীবনের অতি সাধারণ চাওয়া। এতে প্রশ্ন কিংবা বিস্ময় জাগে না। প্রশ্ন বা বিস্ময় না জাগলেও অলকেন্দুর মনে অন্য কথা জেগেছিল। ধাবার নোংরা পরিবেশে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা বুধুয়ার কথা। তার যা বয়েস, সেই বয়সে জৈবিক নিয়মে মনের কোণে স্বপ্ন তার আপন বাসা বুনতে শুরু করে। যেখানে নিত্য নতুন পুরুষ আসে মেয়েমানুষের বুকচাপা অন্ধকার গলির খোঁজে সেখানে সেই স্বপ্ন মঞ্জরিত মনের কন্দরে আত্মহত্যা করেনি, বরং বসন্তের অনাবিল মলয় পাবার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। কি আশ্চর্য, সামাজিক অনুশাসনও তাকে মা-ঠাকুমার অসুন্দর পথে নিয়ে যেতে পারেনি। যখন চারপাশে অন্যায়, অসুন্দরকে সমাজ কিংবা ধর্মের দোহাই দিয়ে আঁকড়ে ধরার প্রতিযোগিতা চলেছে, তখন মেয়েটার যা সুন্দর, যা মন চায়, তা আঁকড়ে ধরার সেই দুর্মর ইচ্ছায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই যখন সুরমা বলেছিলেন, 'সুন্দর জীবনে বাঁচতে চাও? ঠিক আছে। এস।' তখন অলকেন্দু কোন প্রশ্ন তোলেননি।

এর পর সুরমা বুধুয়ার কাছে এক আশ্চর্য আশ্চিট হয়ে উঠেছিলেন। হ্যাঁ, আশ্চর্যই মনে হত সুরমাকে। অবসর সময়ে তিনিই পড়াতেন। পড়ানোর সময়ে একদিন সুরমা বলেছিলেন, নারী হবে গাছের মত। মানুষকে ফুল দেবে, ফল দেবে, শীতল ছায়া দেবে এবং বাঁচার পরিপূর্ণ রসদ জোগাবে। কিন্তু বিনিময়ে কিছুই চাইবে না। বুধুয়া এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিল, বলেছিল, 'না, নারী হবে নদীর মত। আপন গতিতে বয়ে চলবে। ধ্বংস করবে, আবার গড়বেও। সাগরসঙ্গমে নিজের বিরাটত্ব উপলব্ধি করবে, কিন্তু স্বাধীন সত্তা হারাবে না। সুরমা তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিলেন, 'এমন হতে পারবি তো?'

'পারব।' বুধুয়ার মুখে প্রত্যয়ের হাসি ফুটে উঠেছিল।

সেই ঘটনার পর থেকে সুরমার কি হয়েছিল কে জানে। চাওয়ার আগে সব কিছু পেয়ে যেত সে। তার মধ্যে সেরা পাওনা নতুন নাম। যখন সুরমা বলেছিলেন, 'তোর নাম আর বুধুয়া নয়, 'লীনা।' তার মনে হয়েছিল এই নামকরণ অস্তিত্বসর্বস্ব জীবনের মত অর্থহীন। অবশ্য পরে সে বুঝতে পেরেছিল তার অতীত জীবনে দাঁড়ি টানতেই তিনি তার নাম দিয়েছিলেন লীনা চৌধুরী।

লীনাকে চিন্তান্বিত দেখে অলকেন্দু বললেন, 'কি হল? কি ভাবছিস?'

চমক ভাঙতে বেশ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল লীনা, 'না না, কিছু না।'

তবু অলকেন্দু তাকে আর একবার বাজিয়ে নিলেন, 'কিরে, তোর কি ভোটে দাঁড়াতে আপত্তি আছে ?'

এবার লীনা স্পষ্ট গলায় বলল, 'না।'

অলকেন্দু বললেন, 'গুড। শেকল ভাঙার লড়াইয়ে মেয়েদেরই দুঃসাহসীর ভূমিকায় নামতে হবে। ঘরে-বাইরে। আর তুই তাদের নেত্রী।'

॥ দুই ॥

লীনা জিতল। এবং বিপুল ভোটে। অলকেন্দু নির্দল হিসেবে দাঁড়ালেও লীনা দাঁড়িয়েছিল পার্টির টিকিটে। তার প্রধান হতে খুব বেশি অসুবিধে হল না।

টাকি রোড থেকে বেরিয়ে যে পাকা রাস্তা ভেরিয়া-চৌমাথার দিকে চলে গেছে সেই রাস্তায় প্রায় সমকোণের মত বাঁক সৃষ্টি করে যে সরু পিচ ঢালা রাস্তা হাসনাবাদের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে একটু এগোলে ডাইনে আমলানী পঞ্চায়েত-অফিস। দু' কামরার পাকা ঘর। সামনে-পিছনে। সামনের ঘরে বসে লীনা আর অরিত। অরিত দাস। উপপ্রধান।

অফিস বন্ধ হয় যথারীতি, কর্মচারীরাও চলে যান। কিন্তু লীনা থাকে, কাজ করে। বিকেল সন্ধেমুখো, সন্ধ্যে রাতমুখো হয়। তাঁকে দেখে মনে হয় অফিসগুলোতে কাজে ফাঁকি দেবার পরিবেশ তৈরি করে পুরুষরা এবং মেয়েদের বাধ্য করে সেই পরিবেশ নীরবে মেনে নিতে।

বিকেলের ম্লান আলোয় সন্ধ্যের চাপা পদধ্বনি। কিন্তু অফিসের ভিতর সেই সন্ধ্যের ধূসরতা। সুইচ টিপে আলো জ্বালাল লীনা। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল।

বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েছিল অরিত, আলো জ্বলতে দেখে ভিতরে ঢুকল। লীনা মুখ নিচু করে কি যেন ভাবছে, সামনে একটা ফাইল খোলা। পরনে সাদা খোলের পাছাপেড়ে শাড়ি। ছাঁদা খোপার দু'পাশে ঝুলছে বেলফুলের মালা।

অরিত বলল, 'কি ব্যাপার ? সামনে ফাইল খুলে রেখে কেমন অন্যমনস্ক ?'

লীনা মুখ তুলে হাসল। 'ভাবছি।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। কি ?'

'গ্রামের মানুষের কথা।'

সেই মুহূর্তে অরিতের নাসারন্ধ্রের অলফ্যাকটরি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল একটা গন্ধ। নাকটা কুঁচকে গেল। সে উচ্ছ্বসিত হল, 'বাঃ, বেশ মিষ্টি গন্ধ তো !'

'গন্ধ ! কিসের গন্ধ ?'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে লীনার সামনে বসল। বলল, 'আপনি কোন গন্ধ পাচ্ছেন না?'

লীনা নাক দিয়ে একটু বাতাস টানল। তারপর খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। সে হাসি তার পঁচিশটা বসন্তের দেহগাঙে ঢেউ তুলল। 'ওঃ হো, এতো বেলফুলের গন্ধ।'

সেই ঢেউয়ে বোধহয় অরিত খানিক ভেসে গিয়েছিল। নিজের মধ্যে ফিরতে একটু সময় লাগল।

'আপনার বেলফুল খুব পছন্দ, তাই না?'

লীনা একটু হাসল, 'হ্যাঁ! এর গন্ধ আমার ভারী মিষ্টি লাগে। তাছাড়া খোপার সৌন্দর্য তো বাড়েই।'

খোপাটোপা অরিত দেখে না। ও সব দেখতে হয় কবিরা দেখুক। অরিত দেখে দেহ। নারীদেহ। নিতম্ব, বুক, চোখ, চিবুক, ঠোঁট, ভুরু, নাভি, সম্ভব হলে নাভিমূল।

আসলে অরিতের যৌবনধর্ম কলুষিত। হয় জেনারেশন গ্যাপ, নয় যুগের হাওয়ায়। উঠতি বয়েস থেকেই মেয়ে দেখলে তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয়, মনের দরজাগুলো হাট করে খুলে দিয়ে।

দোষগুণে মানুষ। গুণ কিছু আছে অরিতের। কেউ বিপদে পড়লে অরিত তার পাশে। গরীব মরলে, তার শেষযাত্রায় অরিত। তৃণমূলে তার বাস। তাকে কি গ্রাম্য রাজনীতি থেকে দূরে রাখা যায়! পার্টি তাকে টিকিট দিয়েছে। উপপ্রধান করেছে।

সে বলল, 'খোপা দেখতে পাচ্ছি না, দেখছি আপনাকে। সত্যিই আপনি সুন্দর। উগ্র সৌন্দর্য আপনার। কিন্তু পরনের সাদা জমিনের শাড়িটা সেই উগ্রতাকে কিছুটা স্নিগ্ধ করেছে। স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আমার একদম পছন্দ নয়। রোজই দেখি আপনি সাদা খোলের শাড়ি পরেন, কেন বলুন তো?'

এহেন গায়ে-পড়া আলাপে সে বিরক্ত হল। ফাইলে পুনরায় মনোযোগ নিবন্ধ করে, বলতে হয় তাই বলল, 'সাদা খোলের শাড়ি আমি পছন্দ করি।'

'সাদা খোলের শাড়ি পছন্দ আপনার! আপনি তো উওমী।'

অরিতের কথা থেমে করার ভঙ্গিটা অদ্ভুত। আপনিই চোখ চলে যাবে। লীনা তাকাল তার দিকে। 'মানে!'

'আপনি উদার, রুচিশীলা, ধৈর্যবতী, সংযমী…'

লীনা তাকে একরকম থামিয়েই দিল, 'থাক, অনেক হয়েছে। আপনি কি রঙিন মনস্তত্ত্ব জানেন?'

অরিত হো হো করে হাসল।

'মেয়ে পটাতে হলে এ সব এক-আধটু জানতে হয়।'

লীনার চোখে কৌতুক, 'তাই বুঝি? তা এ পর্যন্ত ক'জন মেয়ে পটিয়েছেন?'

'সরি!' মেয়েরা যেন কেমন। হাসে, মনের ভাষা দিয়ে। কথা বলে চোখের

ভাষা দিয়ে। বৈশাখে দেখা হয়, জ্যৈষ্ঠতে আর পরিচয় হয় না। কি হ্যাপা বলুন তো।'

'হ্যাপা সামলাচ্ছেন কেন? একটা বিয়ে করলে তো হয়!'

'তেমন মেয়ে আছে?'

'কিরকম আপনার পছন্দ?'

'এই ধরুন, সুন্দরী, স্মার্ট। স্বাধীনচেতা।'

অরিতের পছন্দের মেয়ে সত্যিকারের কে তা অরিত নিজে না বললেও লীনা ঠিক বুঝতে পারল। লীনা জবাবও দিল। বলল, 'একটা কেন, অমন অনেক মেয়ে পাবেন। আসুন না আমাদের সঙ্গে—'

'আপনাদের সঙ্গে! তাহলে যা শুনছি তা সত্যি! এই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গোপনে মেয়েদের সংগঠিত করছেন! জানেন শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি কি হতে পারে?'

'জানি। মুক্তি বা মৃত্যু। যাই হোক, সব সমাজের মঙ্গলের জন্যে।'

'খুব ভাল কথা। তা আমাকে কি করতে হবে?'

'একটা দায়িত্ব নিতে হবে।'

'কি দায়িত্ব?'

'নারী-সুরক্ষা সমিতির সদস্যা সংগ্রহ।'

'নারী-সুরক্ষা সমিতি?'

'গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মত এই সমিতি। তবে এর কাজ নারীমুক্তি আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর সদস্যা সংগ্রহের কাজ চলছে। ঢিমেতালে। আমি চাই, কাজটা দ্রুত হোক। অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে এর ছাতার তলায় সমবেত হোক। আপনি এই কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেবেন।'

'লীনা, এই সমাজের অধিকাংশ মেয়ে অভ্যস্ত জীবনটাকে স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক আর ন্যায়সঙ্গত ভাবে। সত্য বলতে কি, তাদের চিন্তা ও চেতনা সামাজিক অভ্যাসের দাস হয়ে গেছে। এখন কি বোঝান যাবে তাদের ধারণা অসত্য আর অযৌক্তিক?'

'কেন যাবে না?' হয়ত একটু দেরি হবে। যদি তাদের সহজ সরল ভাষায় বোঝাতে পারেন, যে গৃহকোণকে তারা সাম্রাজ্য ভাবে আসলে সেটা কারাগার আর অলঙ্কার হল শিকল, তাহলে বিভ্রান্তি কিছুটা দূর হবে।

'কোন কোন মেয়ের বিভ্রান্তি দূর হলেও অধিকাংশেরই হবে না। কেননা তারা সেন্ট পার্সেন্ট নারী। পুরুষের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা আর নির্যাতনের নিষ্ঠুর অসহনীয় জোয়াল কাঁধে করেও তারা নারীত্ব বাঁচাতে তৎপর। শুধু কি তাই, নারীত্বের মহিমা মনেপ্রাণে কীর্তন করে। তারা জানে না, এই ভ্রান্ত মহিমার সৃষ্টি ভ্রান্ত চেতনা থেকে। তারা বোঝে না, এই চেতনা তাদের যুক্তিবাদী, বস্তুনিষ্ঠ, স্বাধীনচেতা, আত্মবিশ্বাসী, সক্রিয় আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে বাধা দেয়।'

লীনা অবাক হয়ে বলল, 'আপনি তো মুক্তদৃষ্টি পুরুষ! পুরুষশাসিত সমাজের স্বরূপ আপনার চোখে স্পষ্ট।'

'এই যে বললাম মেয়ে পটাতে হলে এ সব জানতে হয়।'

লীনা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। আপনার এই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স একটু কাজে লাগান।'

'আপনি যখন বলছেন লাগাব।'

এই সময় লীনা উঠে দাঁড়িয়ে চৌকিদারকে ডাকল। বলল, 'আমরা যাচ্ছি। তুমি এসে অফিস বন্ধ করো।'

চৌকিদার বারান্দার টুলে বসেছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনারা যান।'

লীনার পিছনে অরিত। আবার তার খোলা নাকে ফুলের মিষ্টি গন্ধ এসে লাগল। মনটা হঠাৎ যেন এক অনির্বচনীয় পুলকে শিহরিত হল।

॥ তিন ॥

অরিত কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত। একদিকে প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে পৌরুষ। একদিকে আধিপত্য। অপরদিকে কর্তব্য। পুরুষের মৌরুসী অধিকার ভাঙতে নারী-সুরক্ষা সমিতির মিটিংয়ে যেতে পারছে না। সংকোচ হচ্ছে। ভাববে, সে নারীবাদী। নারী-আন্দোলনের কাজে দলের ছেলেদের উৎসাহিত করার চেষ্টাও করতে হচ্ছে। তা নাহলে লীনা ভাববে, কথার ধোকড়। প্রণয়িনীর এই ভাবনা যে কি হৃদয়বেধী, তা অরিতের বয়সী একটা ছেলেই শুধু জানে।

সে বাড়ি থেকে বেরুল। নবীন মাঘের শেষ দুপুর। হালকা কমলা রঙের নরম রোদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা গ্রামের শরীরে। সে হরিপুর হাটখোলায় এল। দু'রাত ঘুমের বারটা বাজিয়ে ভেবেছে। বিভ্রান্তিও ঝরে মরে গেছে অনেকটা।

পিছন থেকে রামসুন্দর হাঁক দিলেন, 'অরিত কোথায় যাচ্ছ?'

অরিত পিছন ফিরল। উপেন খুড়োর চায়ের দোকানে রামসুন্দর বসে আছেন। গলা চড়িয়ে বলল, 'রাঘবপুর। মিটিংয়ে।'

'ব্যস্ত।'

একটু ভেবে অরিত বলল, 'না। কেন?'

'না, এমনি। এসো, চা খেয়ে যাও।' পরে রামসুন্দর উপেনকে বললেন, 'একটা চা দিও।'

অরিত এল। দোকানে খদ্দেরের হাট। দুটো বেঞ্চই গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি। রামসুন্দর নিজেই জায়গা ছেড়ে দিলেন, 'বসো।'

রামসুন্দরের বয়েস এখন আশির বুকে হামাগুড়ি দিচ্ছে। চুল সাদা, গোঁফ সাদা, খোঁচা-দাড়ি সাদা, ভুরু সাদা। দু' কর্ণছিদ্রে একগুচ্ছ করে চুল, তাও সাদা। বৃদ্ধ হলেও

ফোকলা নন। সাদা ঝকঝকে দাঁত, কেবল মনটা সাদা নয়। সে যাই হোক, এখনও বেশ কর্মক্ষম। অলকেন্দুর ঘেরির ম্যানেজার। এবং অরিতের গুরু। মন্ত্রণাদাতা।

অরিত বলল, 'তুমি দাঁড়াবে আর আমি বসবো। না, এ হয় না। ওঁরা কি ভাববেন বলতো?'

হাতের কামাই নেই উপেনের। কেটলির গরম জল ঢালছে গেলাসের ভিতরে, বাইরে। ভাপ উঠছে। এবার লিকার দিচ্ছে গেলাসে। দুধ দিচ্ছে। তারপর চামচের সহবাসে জলতরঙ্গের শব্দ তুলছে। এগিয়ে দিচ্ছে এ-কথা সে-কথায় আসর সরগরম করা লোকগুলোর দিকে। এর মাঝেই সে ডাবাহুঁকোর মত মুখ তুলে বলল, 'ও-সব ছ্যাদাকথা বলবা না উপ-পেরধানবাবু। ও-সব মেইয়ে ভুলানি কথা। মেইয়েকে বলগে।'

অরিত ভুরু কুঁচকে তাকাল উপেনের দিকে। বলল, 'খুড়ো, হঠাৎ চা-গরম ঝাঁজ, 'কি হয়েছে।'

উপেন চা করা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসল, বলল, 'মেইয়ামানুষ কোল পেলে মাথায় ওঠে একথা জান?'

অরিত মুচকি হাসল। 'না, খুড়ো। কোল পেলে ওঠে কিনা জানি না, কিন্তু বর পেলে যে ওঠে তা আমি দেখেছি। তোমরা তো সে ধরনের বর নও। তোমাদের কাছে মেয়েমানুষ পায়ের জুতো, পায়ের তলায় থাকে। মাথায় চড়বে কি করে?'

'শুনলে, শুনলে তো গা-জ্বালানে ঠেস। উনি আবার আমরা কি-ভাববো না-ভাববো তা ভাবেন।' খর গলায় কথাটা রামসুন্দরের দিকে ঠেলে দিল উপেন।

রামসুন্দর ফের বসে পড়লেন। বললেন, 'তোমাকে একটা কথা না বলে পারছি না অরিত। মেয়েদের নিয়ে মিটিং করছ, করো। ভবিষ্যতে ভোটে জেতার পথ সহজ করো। কিন্তু তা মেয়েদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে মদত দিয়ে নয়, অন্যভাবে।'

'এ সব তুমি জানলে কি করে?'

'দিনরাত ঘেরিতে পড়ে থাকলেও সব কথা আমার কানে আসে। লীনার খপ্পরে পড়লেই মরেছ। বেজায় সেয়ানা মেয়ে।'

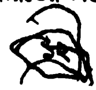
অরিত মলিন হাসল। কিন্তু বলতে পারল না, সত্যিই আমি মরেছি!

এসব কথার মধ্যেই চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছে জাফর। এক মুখ ধোঁয়াও ছেড়েছে। বড় অদ্ভুত ছেলে এই জাফর। এম. এ. পাশ। বেকার। বেকারত্বের জ্বালা নেই বুকে। চা খেতে আসে। মাঝে মধ্যে। সবাই কথার বান ছোটায়। সে চা খায়, সিগারেট টানে আর শোনে। কিছুই বলে না। যেন মুখ সেলাই করে দেওয়া হয়েছে।

আজ কি হল কে জানে। হঠাৎ সে বলল, 'রাইট দাদু! প্রধান বেজায় সেয়ানা। কিন্তু আপনারাও কম সেয়ানা নন। এবার তাহলে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। বাঃ! দারুণ হবে।'

এই কথা শুনে জোড়া জোড়া চোখ ঝপ করে তার উপরে গিয়ে পড়ল। কেবল রামসুন্দরের ধূর্ত অভিজ্ঞ চোখজোড়ার দৃষ্টি কিঞ্চিৎ সরু হল।

এর মাঝেই উপেন চায়ের গেলাস অরিতের দিকে এগিয়ে ধরল, 'উপ-পেরধানবাবু, চা।'



অরিত চা নিয়ে একটা চুমুক দিতে না দিতেই শুনতে পেল রামসুন্দরের গলা, 'তুমি রহিম মিঞার ছেলে জাফর না ?'

'জি।'

'তুমি তো এম. এ. পাশ ?'

'জি।'

'চাকরি পাওনি বুঝি ?'

'না।'

এবার ঠিক ঘাটে না ভিড়িয়েছ। দেখ, প্রধান যদি একটা চাকরি দেয়।'

জাফর ভুরু কোঁচকাল, 'কি বলতে চান আপনি ?'

রামসুন্দর থমকে গেলেন। একটু চুপ করে থাকলেন, তারপর আস্তে আস্তে থেমে থেমে বললেন, 'চাকরির জন্যে চেলা হওয়া যায়। কিন্তু মেয়েমানুষের চেলা হওয়া…'

জাফরের মাথায় যৌবনের তাত ভর করল। তার রক্তের গতি দ্রুততর হল। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। কিন্তু সে এই দারুণ রাগ তার চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলতে পারল না। তার শিক্ষা, তার বিবেক তাকে বাধা দিল।

তবুও সেই রাগের অবশেষ কুড়িয়ে জাফর গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'একটা নোংরা নিম্নস্তরের জীব আপনি। মেয়েমাত্র আপনার কাছে মেয়েমানুষ। কদর্থে। শুনে রাখুন, প্রধান দেখতে মেয়েমানুষ, কিন্তু একমাত্র পুরুষ। এই পঞ্চায়েতে।'

সেই কথা শুনে সকলেরই পৌরুষের অহংকার যেন চমকে উঠল। এই চমকে ওঠা যেন বা ভবিষ্যতের অশনি সংকেতের কারণে। এই চমকানির ছটা তাদের চোখেও ঠিকরে উঠল।

নির্বাক উপেন প্রথমে রামসুন্দরের দিকে তাকাল। তার নিজের চোখে চমকানির ছটা থাকলেও বুকে প্রত্যাশার একরাশ আলো। এই বুঝি রামসুন্দর মোক্ষম জবাবের তীর ছুঁড়ে তাকে বিদ্ধ করেন। কিন্তু রামসুন্দর অস্বাভাবিক নীরব, মুখটা যেন পাথর, সেই মুহূর্তে তার বুকের আলো দপ করে নিভে গেল। কেমন যেন জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানুষের মত অসহায় লাগল নিজেকে। সে তাকাল অরিতের দিকে। ঠিক সেই সময় অরিত কতক অপ্রস্তুত মুখে বলল, 'খুড়ো, এই থাকল চায়ের দাম।'

বলে সে কিছু পয়সা চিনির কৌটোর উপর রেখে রামসুন্দরকে বলল, 'চলি গুরু।'

দোকান থেকে হাত চারেক দূরে রাস্তা। রাস্তায় ওঠেনি তখনও, সামনে এসে দাঁড়াল শমসের। শমসের মণ্ডল। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'একটু দাঁড়ান উপ-পেরধানবাবু।'

অরিত থমকে দাঁড়াল। বলল, 'কিছু বলবে ?'

শমসের এক মুহূর্ত দেরি করল, যেন কথাটা মনে মনে সাজিয়ে নিল। তারপর বলল, 'পেরধান আমার বউকে সমিতিতে নাম লিখাতে বলতেছে। কেন গো ?'

অরিত বলল, 'প্রধান তোমাদের ভালো করতে চান। যা বলছেন তাই কর। কারণটারণ খুঁজতে যেও না।'

'কিন্তু রোববারে রোববারে মিটিংয়ে যাতি হবে যে !'

'যেতে হলে যাবে। কেন, তোমার বউ কি বাইরে বেরয় না ?'

গলায় কি যেন আটকে গেল শমসেরের, বড় করে ঢোঁক গিলল। তারপর হেসে ফেলল, আজ্ঞে, কি যে বলেন। দিন নেই রাত নেই, খালি বাইরে টোটো। যেন পোষা পাখি ছাড়ান পেয়েচে।'

হঠাৎ অরিত সামনে ঝুঁকে গলা খাটো করে হেসে বলল, 'দেখ, ডানা যেন হালকা না হয়।'

'আজ্ঞে, সেইজন্যি তো আপনার কাছে এইচি। নানা লোকে নানা কথা বলছেছে।'

'বলবেই তো! এই সমাজে যত দোষ নারীর। জোরে হাসা দোষ, জোরে পাদা দোষ, এলোচাল দোষ, বাসি কাপড়ে দোষ, হাঁচলে দোষ, ঘরে-বাইরে রাত কাটালে দোষ। বিয়ের পরে দোষ আরও বেড়ে যায়। স্বামীর অনুগামিনী না হলে দোষ, স্বামীর আগে খেলে দোষ, ঘোমটা না দিলে দোষ, পরপুরুষের সংগে হাসাহাসি করলে দোষ। দোষ, দোষ আর দোষ। অথচ পুরুষের কোন দোষ নেই। একেবারে গঙ্গাজল। এ কি একটা সমাজ ?'

তার নিজের কথা নিজের কানেই বেসুরো বাজল। সে পুরুষ হয়ে এ কি বলল! সঙ্গে সঙ্গেই সে জিভ কাটল।

শমসের কিছু না বুঝতে পেরে চোখ বড় করল, 'আজ্ঞে, কি হল? জিভ কাটলেন কেন ?'

'ও কিছু না। এমনি। তোমার বউ সমিতির সদস্যা হলে এবং মিটিংয়ে গেলে অনেক কিছু জানতে পারবে, শিখতে পারবে। তাছাড়া অল্পস্বল্প টাকাপয়সাও পাবে ?'

শমসেরের চোখের তারায় চকচকানি, 'টাকা পাবে ? সত্যি বলতিচেন ?'

অরিত যেন একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। স্বাভাবিক হতে সময় নিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'আর দেরি করতে পারছি না। চলি।'

খানিক এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকাল। গলা চড়িয়ে বলল, 'লোকের কথায় কান দিও না শমসের।'

সেই সময় সামনে মাঠে ছাগল হাঁকল, ব্যা অ্যা অ্যা অ্যা। রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল পর পর দুটো ভ্যানরিক্সা পক্ পক্ শব্দ ছড়িয়ে। বাজল সাইকেলের ঠিং ঠিং। এর মাঝেই রামসুন্দর হো হো হেসে উঠলেন। বললেন, 'শুনেছ উপেন, মরার কানে রাম নাম দিয়ে গেল ?'

'তা আর শুনিনি দাদা।' বলেই উপেনও হেসে উঠল, একই স্কেলে।

ইতিমধ্যে শমসের দোকানের দিকে বারকয়েক তাকিয়েছে। এবং দেখেছে, যারা দোকানে বসে আছে তারা চুপচাপ তাদের কথা শুনছে।

শমসের মদ খায়। পাঁড় মাতাল হয়। কিন্তু এখন সে সুস্থ স্বাভাবিক। এমন বিদ্রূপ মাখানো হাসি শুনে রাগে অপমানে খুব অসহায় বোধ করল সে। তার প্রতিবাদ করার জোর এল না মনে। এবং তখন হনহন করে রাস্তায় উঠে বাড়িমুখো হল।

বাড়িতে এসে চম্পাকে সব কথা খুলে বলতেই সে দিল মুখ-ঝামটা, 'ভালোর জন্য তো সমিতিতে নাম লিখাতে বলতেচে পেরধান। টাকা নেব কেন ?'

শমসের খিঁচিয়ে উঠল, 'টাকা নিবি নে ! কি ভালোটা হবে শুনি ?'

স্বামীকে চম্পা হাড়ে হাড়ে চেনে। তখুনি সে হনুমানের মত লাফালাফি করবে। মারধর দেবে। মুহূর্তে সে নিজেকে সামলে নিল। একগাল হেসে বলল, 'জানো দিদি বলেচে সমিতিতে গেলি আর তার কথা মন দে শুনলি আর বাচ্চাকাচ্চা হবে না।'

অবিশ্বাসের সরল চিহ্ন ফুটে উঠল শমসেরের চোখে-মুখে, 'কি বলতিচিস। বাচ্চা-কাচ্চা দেয় তো খোদা।'

এই কথা শুনে হাসি পেল চম্পার। সামনে দাওয়ায় বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছে সে। হাতের চিরুনি চুলে ঝুলে রইল। চোখজোড়া চলে গেল উঠোনের কাঁঠাল গাছটার বুকে। ক' মিনিট ঘুরে বেড়াল। হঠাৎ মনে ভেসে উঠল গত রোববারের মিটিংয়ে প্রধানের ভাষণের একটা অংশ যা তার মনে দাগ কেটেছিল। 'আপনাদের আমি এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, যেখানে দাঁড়িয়ে আপনারা নিজেদের স্বাধীন সত্তাকে উপলব্ধি করবেন। স্বামীর বংশ রক্ষার তাগিদে নয়, অন্তরের তাগিদে সন্তান জন্ম দেবেন। তখন দেখবেন, আপনাদের ঘরে ভগবানের বাচ্চা জন্মাচ্ছে না, জন্মাচ্ছে মানুষের বাচ্চা। একটা কিংবা দুটো।' সে বলল, 'ধ্যানাটি করো না তো। রাতকেলে সোহাগ করে বুঝি খোদা ?'

শমসের ফ্যাকাশে ডুমুর চোখ তুলে চম্পার দিকে তাকাল। বউটা দিনে দিনে গোল্লায় যাচ্ছে। খোদাকে নিয়েও মস্করা করছে। সে বলল, 'ছি ছি ! অমন কথা বল না গো। খোদার কত খ্যামতা ! রেগে গেলে কিন্তু এক ঘর বাচ্চাকাচ্চা দেবে।'

চম্পা ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল। ওদের একমাত্র ছেলে। বছর দুয়েক বয়স। দোলনায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সে বলল, যাই বলো না তুমি, আর বাচ্চা-কাচ্চা নয়। দিদি বলেচে, ছোট পরিবার সুখী পরিবার।'

চম্পার এই অদ্ভুত কথা শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকল শমসের। তখন মনে হল, তার তোয়াক্কা না করে সে সমিতিতে নাম লিখিয়েছে। কিংবা তর সয়নি, আগেভাগে একটা মিটিং সেরে নিয়েছে। তা না হলে এই অধঃপতন তার হয় কি করে। গেল রাতের আকস্মিক ঘটনাটা মনে পড়ে গেল তার। চম্পার পাশে শুতেই হঠাৎ তার বুকের মধ্যে অশান্ত প্রলয়কারী আবেগের দাপাদাপি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে একটা হাত চম্পার বুকে রেখেছিল। সামান্য পীড়নে প্রলয় ঘটে গিয়েছিল। তার হাতটা দ্রুত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিল চম্পা ! চাপা চিৎকারে বলেছিল, 'যাও না অণ্ডকোষ ছেঁটে খাসী হয়ে এস, তারপর। বেঁধে গেলে—?'

চম্পা ফের বলল, 'কি গো, চুপ করে আছ কেন ? তাই না ?'

একথার জবাব দিল না শমসের। পরে সে বলল, 'তুই কি সমিতির মিটিংয়ে গিচিলি ?'

শমসেরের চোখ দুটো দু' খণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার যেন। চম্পার বুকটা ভয়ে হিম হয়ে গেল। একটা ঢোক গিলে সে বলল, 'হ্যাঁ, সুন্দরী ছাড়ল না, তাই—

'সুন্দরী! সুন্দরী কে?'

'আমার খালাত বুন। তকিপুর বাড়ি।'

'কি, এত সাহস।' প্রচণ্ড চিৎকার করে শমসের বলল, আমার মত না নে, মিটিংয়ে গিচিলি।'

সেই মুহূর্তে চম্পার মনের মধ্যে প্রধানের অনেক কথা গড়িয়ে গেল। তার মধ্যে একটা হল—বিষে বিষ কাটে, গরমে কাটে গরম। যে চম্পা একটু আগে ভয়ে জড়সড় হয়ে গিয়েছিল, সেই চম্পাই কটমটিয়ে তাকাল। শমসেরকে অবাক করে করকরে গলায় বলল, 'চোটপাট করতেচ কেন? কি এমন অন্যায় করিচি। সবসময় অত মতটত নিতি পারব না, বুয়েচ?'

শমসেরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত রিরি করে জ্বলে উঠল। সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। সপাটে এক চড় দিল চম্পার মুখে। মাথাটা এক পাশে টলে গেল চম্পার। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে সাইরেনের মত কেঁদে উঠল।

মদচুরচুর শমসের প্রায়ই চম্পাকে পেঁদায়, পাড়া জাগায় খিস্তিখেউড়ে। পাড়াপড়শি বিরক্ত। কেউ ঠেকাতে কিংবা মিটমাট করে দিতে আসে না। দু-চারজন পথচলতি কৌতূহলী মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। শমসেরের ছুঁড়ে দেওয়া কথা তারা শুনল, 'অতশত বুঝিনে। ফের মিটিংয়ে গেলি তোর খাল খিঁচে দেব।'

চম্পা ভাবল এরপরেই তো শয়তানটার দিক থেকে ছুটে আশা আরও বড় ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে। সে নাগালের বাইরে থাকতে যেন উঠোনে নেমে এল। তারপর দাঁতে দাঁত টিপে ভাঙা গলায় বলল, 'শয়তান, এরপর গায়ে হাত তুললি খুন করবো?'

মুহূর্তে শমসেরের দেহের সব রক্ত যেন চোখে এসে জড়ো হল। রাগে গর গর করতে করতে নীচে এসে, চম্পার চুল ধরে হিড় হিড় করে খানিক টেনে উঠোনের মাঝখানে নিয়ে এল। তারপর গর্জে উঠল, 'খানকি! খুন করবা। ফের একথা বললি কানের চাবালি ভেঙে দিব।'

চম্পার মুখটা রাগে, ঘৃণায়, অসহায়তায় যেমন কঠিন, তেমনি করুণ। সে এক হাত দিয়ে শমসেরের হাত চেপে ধরেছে। চুল ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াসে শরীরের সব শক্তি ঢেলে দিয়েছে। এবং কাঁদছে। একটানা।

ইতিমধ্যে কখন যে প্রধানের ভ্যানরিক্সা সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কেউ খেয়াল করেনি। মিটিং সেরে ফিরছিল লীনা। কান্নার শব্দ শুনে সে চালককে গাড়ি থামাতে বলেছিল। তারপর নেমে ক' মুহূর্ত দেখেছিল। দেখেই ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে সে দ্রুত ওদের কাছে গিয়েছিল। প্রচণ্ড চিৎকারে কাঁপিয়ে দিয়েছিল উঠোন, 'ছেড়ে দাও ওর চুল।' চম্পা চমকে কান্নাক্রান্ত চোখে, কিন্তু শমসের জ্বলন্ত চোখে লীনার দিকে তাকাল। মনে পড়ে গেল শুঁড়িখানায় এক গেলাসের বন্ধু মোনাজাতের কথা।

'অ্যাই শালা, বউকে পিটিয়ে, তা আবার বড় গলায় বলতিচিস? চেপে যা। পেরধান বলেচে, বউকে মারলি হাতে না মেরে মালে মারবে। শুঁড়ি আর মাল দেবে না।'

লীনা একই রকম চড়া গলায় বলল, 'কি হল? এখনও ছেড়ে দিলে না?'

এবার শমসের শামুকের মত গুটিয়ে গেল ভয়ে। মদ না খেলে তার ঘুম হয় না, পায়খানা হয় না। ভরদিন ম্যাজম্যাজ করে শরীর। সে জানে হুকুম না মানলে প্রধানের কথার নড়চড় হয় না। সে চুল ছেড়ে দিল।

সেই মুহূর্তে চম্পা 'দিদি' বলে লীনার পায়ে আছড়ে পড়ল। এবং হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

লীনা প্রচণ্ড এক ধমক দিল, 'চুপ করো। কেঁদে কিছু হবে না। পার তো চোখে আগুন জ্বালো।'

এই এক ধমকে আগুনে যেন জল পড়ল। থেমে গেল তার কান্না। থামলেই বা, মাঝে মাঝে ফোঁপানির চোটে দেহ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

শমসেরের অবস্থা কিঞ্চিৎ শোচনীয়। ওদিকে মোনাজাতের সতর্কীকরণ, এদিকে প্রধানের ধমকানি। দুই আবর্তে পড়ে সে বিভ্রান্ত, নির্বাক।

লীনা শমসেরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভিন্ন সুরে বলল, 'চম্পাকে মেরেছ কেন?'

শমসের খুব ভড়কে গেল। 'আজ্ঞে, ভুল হয়েচে। আর কখনও...'

'ঠিক বলছেন তো?'

'মা কালীর দিব্যি।' শমসের বলল, 'থুড়ি, খোদার কসম।'

লীনা জানে, যে লোক এত তাড়াতাড়ি ভয়ের হিম পাথার থেকে উঠে ভাঁড়ামির উষ্ণ সরসীতে অবগাহন করতে পারে, সে আর যাই হোক, সুবিধের নয়। ঘুঘু। এই ধরনের ঘুঘু দু-একটা নয়। অসংখ্য। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে। এদের নিয়ে তাকে উঠতে-বসতে হবে, চলতে হবে। এরাই তো এই সমাজের প্রতিভূ।

সে সহানুভূতির স্বরে বলল, 'ঝগড়াঝাঁটি না করে মিলেমিশে থাকা যায় না! চম্পা সুতো কলে কাজ করে। যা পায়, মাঝেমধ্যে এদিক ওদিক কোনও কাজ ধরে তুমি যা পাও, দুজনের এই আয়ে তোমাদের হয়ত কোনওমতে চলে যায়। এরকম মারধর করলে ও যদি তালাক দেয় তোমাকে, তখন কি হবে?'

প্রধানের এহেন ছেলেমানুষী প্রশ্নে অবাক হল শমসের। সংসার মানে মিলেমিশে থাকা, বাঁচা। বাঁচতে হলে দরকার আনন্দ-ফুর্তি। সুন্দরী মেয়েমানুষের সোহাগে এ সব মেলে। এ সব পেতে সে হবে বউয়ের মুখাপেক্ষী! তাঁবেদার! কখনও না। সে পুরুষ, দামী। মেয়েমানুষ, সস্তা। দরকার হলে আবার বিয়ে করবে।

এ সব কথা কি বলা যায়। হাজার হোক, প্রধান। অনেক ক্ষমতা। তাছাড়া চম্পা ওর স্বজাতি! স্বজাতিপ্রীতি কি সহজে যায়!

সে কাঁচুমাচু মুখে নিখুঁত অভিনয়ের গলায় বলল, 'আজ্ঞে, তালাক দেবে কেন? সংসার করতে গেলি অ্যামন একটু-আধটু হয়েই থাকে। কি, তাই না বউ?'

মুহূর্তে চম্পার মুখ বৃষ্টিধোয়া আকাশের মত ঝকঝকে হয়ে গেল। সে মুখ নীচু করে মাথা নাড়ল।

লীনা অবাক হয়ে চম্পার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তখনই তার মনে হল, নারীর কষ্ট নারীরই গড়া।

॥ চার ॥

লীনার এই ধারণা কেবল চম্পার অর্থহীন আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের কারণে নয়, একই রকম জীবনধারায় অস্তিত্বসর্বস্ব হয়ে ওঠা সদস্যাদের অসহযোগিতা বা বিরোধিতার কারণেও। মিটিংয়ে তার কথার গুরুত্ব অনুধাবন না করে টিপ্পনী, মুখ টিপে হাসাহাসি এই সব কিছুই তাকে মনে করিয়ে দেয় বকলস পরা কুকুরের প্রভুর প্রতি আনুগত্য।

মাঝেমধ্যে একটা চিনচিনে কষ্ট তার বুকের ভিতরটাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেয়। তার কাজ থেমে নেই। অফিসে যায়, মিটিংয়ে যায়। নারীত্ব ও নির্ভরশীলতার চোরাবালিতে আটকে পড়া মেয়েদের দিকে চেয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কথা ভাবে, বিচার-বিশ্লেষণ করে।

কত কী ভাবা যায়! এই ধরনের কাজে সহজে কোন প্রাপ্তি থাকে না। এই পৃথিবীর সমুদয় মাথামোটা মানুষদের জন্যে এই কাজ কিছু উৎসর্গীকৃত প্রাণের দান। এতে শত্রু জন্মায়, জীবন বিপন্ন হয়। এমন কি, মৃত্যুকেও চ্যাপলিনের মত তামাশার ব্যাপার বলতে হয়।

সে যাই হোক, লীনা এখন আর একা নয়। তার চারপাশে কিছু উৎসর্গীকৃত টগবগে তাজা প্রাণ! তাঁরা তাঁর চিন্তাভাবনাকে মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কখনও মিটিংয়ে, কখনও বা বাড়িতে। বাড়িতে অবশ্য গোপনে। তাদের মধ্যে দুজনের অভাবিত সাফল্যে সে খুব খুশি। মুগ্ধ। একজন জাফর, অন্যজন কল্পনা। কল্পনা দাস। তকিপুর গ্রামসভার সদস্যা।

আই. আর. ডি. পি.-র কাজকর্ম নিয়ে কিছু অভিযোগ লীনার কাছে এসেছে। সে-সম্পর্কে অরিতের সঙ্গে আলোচনা করে উঠে দাঁড়াতে অফিস ঘরে ঢুকল সুনীল মণ্ডল। বিরোধী দলের গ্রামসভার সদস্য। তার পিছনে জনাপাঁচেক লোক। লীনা সবে 'কি ব্যাপার, সুনীলবাবু' বলে কথা শুরু করতে যাবে, তার আগেই কর্কশ গলায় সুনীল বলে উঠল, 'ঝড়ে যাদের ঘরবাড়ির খুব ক্ষতি হয়নি তাদের ঘর তৈরি করতে সাহায্য করা হয়েছে। এদের সকলেরই ঘর একেবারে পড়ে গেছে! এদের কিন্তু সাহায্য করা হয়নি। অন্য দলের লোক বলে কি?'

লীনা ভুরু কুঁচকে লোকগুলোকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর গম্ভীর গলায় বলল,

'সুনীলবাবু, আমি যে দলের টিকিটে লড়ে থাকি না কেন, এখন কোন দলের লোক নই। এখন আমি প্রধান। সব মানুষের।'

সুনীল অদ্ভুতভাবে হাসল, 'তাই নাকি? তাহলে তো এরা সাহায্য পাবেই।'

লীনা লোকগুলোকে বলল, 'আপনারা সবাই দরখাস্ত করেছিলেন?'

সবাই মাথা নাড়ল। এই মাথা নাড়া এক্ষেত্রে হ্যাঁ গোছের সম্মতিজ্ঞাপক জবাব নয়, লীনার মনে হল, ক্ষোভজ্ঞাপক শুধু হ্যাঁ একটা। লীনা জানে, গণতন্ত্রে কেউ স্থায়ী বিরোধী নয়। আজ যে বিরোধী, কাল সে স্বমতের। এইজন্যেই সে দলবাজি করে না। সে বলল, 'ঠিক আছে। সত্যিই যদি আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন নিশ্চয়ই সাহায্য পাবেন।'

পঞ্চায়েত সচিবের পাশে একটা চেয়ারে বসে পলিথিনের শিট, ইউরিয়া আর মিনিকিট তাঁর গ্রামের কে কে পেয়েছে, কে-ই বা পায়নি তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল কল্পনা। সুনীলরা চলে যাবার খানিক পরে লীনাকে বেরিয়ে যেতে দেখে সে বলল, 'দিদি, বাড়ি যাচ্ছ?'

লীনা তার দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, যাবে?'

'হ্যাঁ।' বলে সে উঠে এল।

তারা মোড়ে এলেই আচমকা হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। রাস্তার উপরেই মুদিখানা দোকান। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল তারা। আরও ক'জন দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ মালপত্র কিনছে।

'দিদি, একটা জব্বর খবর আছে।' দোকানদারের হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে জাফর ধরাতে গিয়েও ধরাল না, এগিয়ে এসে বলল।

তারা দুজনে ওর দিকে তাকাল। লীনা কিছু বলল না। সামান্য হাসল। শুধু এটুকু বুঝল, সে আর এক প্রস্থ সফল। সেই সফলতা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে জাফরের কাছে। এমনই তো হয়।

কল্পনাই বলল, 'তা খবরটা কি শুনি?'

জাফর উপেনের দোকানের ঘটনাটা বলল। শুনে লীনা বলল, 'এটা জব্বর খবর?'

'কি আশ্চর্য!' জাফর কিঞ্চিৎ বিস্মিত, 'অরিতবাবু নারী সুরক্ষা সমিতির মিটিংয়ে গেলেন। এটা জব্বর নয়?'

কল্পনা তাকাল লীনার চোখে। তার মনে হল কথাটা লীনা এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলেও তার বুকের ভিতর খুশির বাদ্যি বাজছে। চোখে তারই ঝকঝকে দ্যুতি। সে বলল, 'জাফর ভাই, দিদি যাই বলুক, এটা সত্যি খুশির খবর। এভাবে যদি বর্তমান কিংবা আগামী প্রজন্ম নারীকে নতুন চোখে দেখে নারীমুক্তি গল্পকথা হবে না।'

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। হঠাৎ ট্রেনের সময়টা জাফরের মনের মধ্যে ভাসান খেল। সে ব্যস্তভাবে বলল, 'দিদি চলি। কলকাতায় যাব এখন। কাল একটা ইন্টারভিউ আছে।'

জাফর চলে গেল। কল্পনা আর লীনা বাড়ির রাস্তা ধরল। রাস্তার দুপাশে

গাছ। সারি সারি। শীত জরায় রিক্ত, জহর রোজগার যোজনা প্রকল্পের সার খেয়ে চেগে ওঠা বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, হঠাৎ বল পেয়ে কেমন যেন সজীব হয়ে উঠেছে। বাতাসের ধাক্কায় দুলছে। টুপটাপ জল পড়ছে। হঠাৎ খানিক জল পড়ল লীনার মাথায়। সে চট করে সরে এল কল্পনার পাশে। এবং হাঁটতে হাঁটতে একরকম হঠাৎই মনে পড়ল নারী আন্দোলনের কথা। সায়মলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিটিংয়ে এক ঝাঁক বউ মুখ টিপে হেসেছিল যখন সে বলেছিল যৌনমুক্তি ছাড়া নারীমুক্তি অর্থহীন। এবং এই আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিল। এমন করে নন্দনপুর, আষাঢ়িয়া, রাঘবপুরের বউরাও আশঙ্কার কথা শুনিয়েছে। তাছাড়া বলেছে সমান অধিকার আদায়ের কারণে আন্দোলনে যোগ দিলে সব স্বামী খেপে যাবেন। বারোভাতারির আসামী করে জোরসে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন কিংবা আইনের আশ্রয় নিয়ে ডিভোর্স করবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, এই বউদের পাশাপাশি কিছু সাহসী স্বাধীনতাকামী নারী একথার যথার্থতা উপলব্ধি করেছে। এবং এই সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে ঘরে ঘরে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেছে।

একই সঙ্গে সাফল্য আর অসাফল্যের উল্টোমুখী ভাবনার স্রোতে অরিতের কথার ঢেউ এসে পড়ল—দোষ, দোষ আর দোষ। অথচ পুরুষের কোন দোষ নেই। একেবারে গঙ্গা জল। একি একটা সমাজ ?

এই সময় কল্পনা তার মুখের দিকে তাকাল। রসিকতার রস গলায় ঢেলে বলল, 'কি ব্যাপার! অরিতবাবুকে রাতারাতি দলে নিয়ে এলে কোন মন্ত্রে ?'

লীনার মুখের ছায়া সরে গেল হঠাৎ, সেখানে এক ঝলক হাসির ঢেউ খেলে গেল। সে বলল, 'মন্ত্র ? মন্ত্র দিয়ে কি হবে ? দুর্বল পুরুষ নারীদেহের চুম্বকীয় আকর্ষণে এমনিই ঘায়েল হয়। যে মজেছে তাকে আর মজাব কি ?'

'মজেছে, না প্রেমে পড়েছে ?'

এবার প্রবল কৌতুকে, যেন খুব মজা পেয়েছে এসন ভঙ্গিতে খিলখিল করে হেসে উঠল লীনা, হাসতে হাসতেই বলল, 'প্রেম! অরিতবাবু পড়বেন প্রেমে—'

কল্পনা লীনার এই অকারণ হাসির কোন অর্থ খুঁজে পেল না, তবে একটু অপ্রস্তুত হল। এবং মুখ নিচু করল। ঠিক সেই সময় হঠাৎ সামনে থেকে তাদের পাশে এসে দাঁড়াল বিডিও-র জিপ। ওরা একটু চমকে তাকাল। দেখল, জিপের মধ্যে বিডিও এবং ফর্সা সুদর্শন একজন ভদ্রলোক। পিছনের সীটে। পাশাপাশি। বিডিও-ই প্রথম কথা পাড়লেন, মিস চৌধুরী আমি আপনার অফিসে যাচ্ছিলাম। একটা ঝামেলায় পড়েছি।'

লীনা ভুরু কুঁচকে বলল, 'ঝামেলা ?'

বিডিও বললেন, তকিপুরের দিঘির উত্তর পাড় দিয়ে নন্দনপুর পর্যন্ত যে মোরাম রাস্তা পঞ্চায়েত করেছে সেই রাস্তা প্রথমেই সুনীল মণ্ডলের ভাইয়ের কিছু জমি খেয়ে নিয়েছে। সেইটা নিয়েই—গত পরশু উনি আমার অফিসে গিয়ে হৈচৈ করে এসেছেন।'

'প্রথমেই, মানে যেখান থেকে রাস্তাটা শুরু হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা না হলে তো রাস্তা শুরু করাই যেত না। তাহলে নন্দনপুর, সিরাজপুর, সায়মলপুরের মানুষ যাতায়াতের অমন সুন্দর রাস্তা পেত কি করে ? তারপর একটু থেমে লীনা ফের বলল, 'তা সুনীলবাবুর ভাই তো ক্ষতিপূরণের জন্যে আর্জি জানাতে পারতেন, তাই নিয়ে হুজ্জুতি করার কি আছে ?'

'উনি বলছেন, ওঁর ভাই খুব গরীব। এমনিতেই চাষের জমি বলে কিছু নেই, ওইটুকু সম্বল। এখন তাকে নাকি তার জমি ফেরত দিতে হবে।'

'এখুনি তো সুনীলবাবু পঞ্চায়েত-অফিসে এসেছিলেন। এ ব্যাপারে কোন কথা বললেন না তো।'

বিডিও বললেন, 'বললে তো ভেজাল চুকেবুকে যেত। ব্যাপারটাকে ইস্যু করে পঞ্চায়েতের অবিচার দেখান যেত না।'

'ও, এই কথা। তাহলে রাজনীতি করুন।' লীনার গলায় যেন বিরক্তির সুর।'

তারপর একটু পরে বলল, 'তা কতটা জমি ?'

বিডিও বললেন, 'চুয়াত্তর ডেসিমেল। তার মধ্যে রাস্তায় পড়েছে আটতিরিশ।'

লীনা বলল, 'ঠিক আছে। আপনি সুনীলবাবুকে বলবেন তাঁর ভাই যেন সব কিছু জানিয়ে পঞ্চায়েতে একটা দরখাস্ত করেন। ওই জমিটা থেকে কিছু দূরে, একই মৌজায়, কিছু খাস জমি আছে। সেই জমি থেকে আটতিরিশ ডেসিমেলের একটা প্রপোজাল আমি সুপারিশ করব। মাস খানেকের মধ্যে জে এল আর ও-র কাছ থেকে পাট্টা পেয়ে যাবেন। তবে যৌথপাট্টা, অবশ্য তার ভাই যদি বিবাহিত হন।'

বিস্ময়ে তাক লাগল বিডিও-র। 'যৌথপাট্টা।'

লীনা বলল, 'এটা স্বামীর সম্পত্তির উপর স্ত্রীর সমান অধিকারের ব্যবস্থা।'

পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে ডেপুটেশন দিচ্ছে বিরোধী দলের সদস্যরা। সেই ডেপুটেশন লীড করছে সুনীল। মাঝে মাঝেই এক দঙ্গল লোক নিয়ে এসে এক-একটা ইস্যু নিয়ে বিডিও অফিসে হম্বিতম্বি করে যাচ্ছে। তার মধ্যে যে ইস্যুটা বিডিওকে খুব বিব্রত করছে তা হচ্ছে পঞ্চায়েতের ক্ষমতার অপব্যবহার। গত সোমবার তো বিডিও-র ঘরে ঢুকে চোখ পাকিয়ে সুনীল বলেছিল, 'আপনি তো বহাল তবিয়তে আছেন বিডিও সাহেব, আসছেন-যাচ্ছেন, খাচ্ছেন-শুচ্ছেন ; আর প্রধানের কথায় চোখ বুজিয়ে সায় দিচ্ছেন। আমাদের কি বউ ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে দেবেন না ?'

বিডিও তখন সবে চেম্বারে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসেছিলেন। বউ নতুন রুমাল-খানায় দামী সেণ্ট মাখিয়ে দিয়েছিল। সেই রুমাল বের করে মুখ মুছতেই একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লেগেছিল, কেন যেন বউয়ের স্পর্শ টের পেয়েছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই কেমন একটা ভালো লাগা অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তা সেই অনুভূতি যে সুনীলের তোপের মুখে উড়ে যাবে তা ভাবতে পারেননি। তিনি মেরুদণ্ড সটান করে বলেছিলেন, 'কেন, কি হয়েছে সুনীলবাবু ?'

'নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোলে জানবেন কি করে?' সুনীলের চোখ লাট্টুর মত ঘুরতে শুরু করেছিল অক্ষিগোলকে, 'এদিকে জনদরদী পঞ্চায়েত, ওদিকে সেই জনগণের যাতে ঘর ভাঙা যায় তার ব্যবস্থা করছেন প্রধান। বলি ব্যাপারটা কি অ্যাঁ? নারী-আন্দোলন করছেন নারীদের ভালো করবেন বলে, তার জন্যে ঘরের বউদের সনাতন রীতিনীতি ভেঙ্গে ফেলতে উস্কানি দেবেন? যৌনমুক্তির কথা বলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন?'

বিডিও শান্তশিষ্ট রসিক মানুষ। রাজনৈতিক দলের লোকদের চোখাচোখা কথার বাণে ঘায়েল হয়ে খাবি খান, রসের কথা বলার সময়-সুযোগ হয় না। হঠাৎ তার ভেতরের রস চলকে উঠেছিল, 'যৌনমুক্তি! গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে? যেমন পুরুষ করে আসছে। কি সর্বনাশ। এখুনি বদলি হতে হবে। তা না হলে ওই হাওয়া আমার বউয়ের গায়েও লাগবে।'

সুনীল বলেছিল, 'আপনি না হয় পালিয়ে বাঁচবেন, আমাদের কি হবে?'

বিডিও একটু ভেবে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে। আমি দেখছি ব্যাপারটা।'

এখন এই মুহূর্তে, একটু উষ্মা প্রকাশ করে বিডিও বললেন, 'কি বলছেন আপনি? এ তো রীতিমত বেআইনী ব্যবস্থা। এভাবে পঞ্চায়েতের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন কেন?'

বিডিও-র হঠাৎ এহেন মন্তব্যে থতমত খেল লীনা। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'গ্রামীণ মানুষের কল্যাণ সাধন পঞ্চায়েতের লক্ষ্য। এই ব্যবস্থায় সেই লক্ষ্য সুস্পষ্ট। অথচ আপনি এর মধ্যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতার অপব্যবহার দেখতে পাচ্ছেন। এ কি বিরোধীপক্ষের চাপ না মৌরুসী অধিকার হারানোর ভয়?'

বিডিও তবু বললেন, 'এতে অনেক ঝুঁকি। কেসটেস হতে পারে।'

লীনা জেদি হল, 'হোক না—'

বিডিও হাসলেন। 'মিস চৌধুরী, আপনি কোনও মতেই যৌথপাট্টা ব্যবস্থা চালু করতে পারবেন না। আইন আপনাকে ফাঁসিয়ে দেবে। সুতরাং সম্পত্তির উপর সমান অধিকারের সামাজিক মর্যাদা ফিরে পাবার সম্ভাবনা কম। সেই কবে, কোন যুগে, সমাজ বিকাশের মূল তত্ত্বের মধ্যে মেয়েরা এই মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। এখন সম্পদের মালিক পুরুষ, পুরুষই সমাজের নিয়ামক। নারী গৃহলক্ষ্মী। পরাধীন। পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মেয়েদের এই শোচনীয় দশা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকবেও।

এতক্ষণ কল্পনা নির্বাক শ্রোতার মত তাদের কথা শুনছিল। এহেন অদ্ভুত মন্তব্যে শুধু লীনাই নয়, সেও স্তব্ধ, হতবাক। বোধহয় কেউই ভাবতে পারেনি বিডিও এমন কথা বলতে পারেন। তারা দুজনে একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল; ঠিক তখনই বিডিও লেগে গেলেন অন্য কাজে। নতুন জয়েন্ট বিডিও সুব্রত চ্যাটার্জীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লীনার।

লীনা নমস্কার করল। সুব্রত-প্রতি-নমস্কার করে বলতে চাইল, যেমন সুন্দর চেহারা আপনার তেমনি সুন্দর চিন্তাভাবনা—

কিন্তু তার গলা দিয়ে কোন স্বরই বেরুল না। আসলে ঘোথপাট্টার কথা শুনে সে কেমন সম্মোহিতের মত লীনার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তার ঢলঢলে মুখে এক স্বপ্নময় মায়া জড়িয়ে আছে। সেই মায়ার মৌতাতে সে বিভোর হয়ে গিয়েছিল।

বিডিও নিশ্চয় ব্যাপারটা খেয়াল করে থাকবেন। সেই ঘোর ভাঙাতে বললেন, 'বুঝলেন, ইনি নারীবাদী। পুরুষ নিয়মিত নারীর কানে মন্ত্র দিচ্ছে, তিনি মা। শিক্ষিতা, স্বনির্ভর, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতায় প্রতিষ্ঠিতা কিংবা বিশ্বসুন্দরী হলেও তিনি মা। তা ছাড়া মাতৃবন্দনার রকমারি স্তোত্র। আহা, কি মধুর! মায়েদের ঘোর লেগে গেছে। তাঁরা বিশ্বাস করছেন যে তাঁরা সত্যিই স্বর্গাদপি গরীয়সী। তা, স্বর্গের চেয়েও যাঁরা বড়, পৃথিবীর সামান্য স্বাধীনতা নিয়ে তারা কি করবেন? সুতরাং আপন কারাগারে স্বেচ্ছায় বন্দিনীরা অধিষ্ঠাতা আছেন। সমাজের উপর নিজের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্যে পুরুষের এই রণকৌশল ধরে ফেলেছেন। এবং সেটা মেয়েদের বোঝাতে ব্যস্ত আছেন।'

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে গলায় শ্লেষ ঝরিয়ে বিডিও থামলেন। এই সময় সুব্রত বলল, 'মাত্র এক মাসের মধ্যে আপনার নাম বিভিন্ন মুখে অনেকবার শুনেছি। কেউ করেছেন প্রশংসা, কেউ বা নিন্দা। নিন্দার পাল্লাটা ভারী। এখন মনে হচ্ছে সেই শোনা আর এই দেখা ও শোনার মধ্যে বিস্তর ফারাক। সত্যিই আপনি সাহসিনী। অদ্ভুত।'

লীনা হাসল। এই দুপুরে রাতের একরাশ জোছনা ঝরল। সেই মুখ নিয়ে সে কল্পনার দিকে তাকাল। কল্পনার মুখে মিটিমিটি হাসি। সে মুখ নিচু করল। ঠিক তখনই বিডিও ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে নির্দেশ দিলেন।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কল্পনা বলল, 'সুব্রতবাবুকে দেখতে খুব সুন্দর, তাই না?'

লীনা হেসে বলল, 'কল্পনা, যুদ্ধে নেমে শত্রুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলে কিন্তু পরাজয়, বন্দীত্ব।'

'সুব্রতবাবুকে শত্রু ভাবছ কেন? উনি তো বন্ধু হতেও পারেন।'

'কি জানি হয়ত পারেন। এতদিন তো সব পুরুষকেই বন্ধু ভেবেছি। কি পেয়েছি? এখন শত্রু ভেবে দেখি কিছু পাই কি না—'

এই কথা শুনে কল্পনার মনে হল লীনা নারীর মনে শ্রেণীচেতনা সৃষ্টি করতে চায়। যেমন এই সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখাতে দুটো শ্রেণীর কথা বলা হয়, শোষক এবং শোষিত; তেমনি সামাজিক বৈষম্য দেখাতে সে বুঝি মানব সমাজকে বিভাজিত করতে চায় দুটো শ্রেণীতে, নারী ও পুরুষ। এই সমাজে পুরুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়ক উপাদান ভূরি ভূরি। কিন্তু নারীর? এই পিতৃতন্ত্রে ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে পরিচালিত পঠন-পাঠন, বদ্ধ ধারণায় নিমজ্জিত পাঠক্রম, বৈষম্যমূলক কর্মজগত আর শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ নারীর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য তো করেই না, বরং পুরুষের শাসন নিরাপদ রাখতে নারীত্ব গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। একমাত্র শ্রেণীচেতনার উন্মেষই এই আরোপিত পার্থক্য মেয়েদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে।

সত্যি! মাঝে মাঝেই লীনার কথা শুনে খুব অবাক হয়ে যায় কল্পনা। ব্যস্ততার ঘূর্ণিপাকেও সে কোন বিষয়ের এত গভীরে যেতে পারে যা ভাবাই যায় না।

আমলানীর মোড় থেকে 'নিভাননী স্মৃতি' পায়ে হেঁটে মিনিট পনের; তার আগে চোলটুকারীতে এসে বাঁক নিতে হয় ছোট রাস্তার নির্জনতায়। সেখান থেকে মিনিট পাঁচেক গেলে চোখে পড়ে মোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। তারপর দু' মিনিট গেলে একটা বাঁক। তার সামনে বাড়ি। সেখান থেকে রাস্তা আরও দু'বার বাঁক নিয়ে মেছো-ঘেরির ডান সীমানা দিয়ে নদীতীরের ভেড়িতে পড়েছে। সেই ভেড়িপথে বাঁয়ে হাসনাবাদ ফেরিঘাট আর ডাইনে ভবানীপুর পর্যন্ত যাওয়া যায়।

চোলটুকারীর বাঁক থেকে একটা ভ্যান রিক্সায় চেপে চলে গেল কল্পনা। লীনা ছোট রাস্তায় উঠে বাড়িমুখো হল। গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখল বারান্দায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে অর্ক।

অর্ক অলকেন্দুর একমাত্র সন্তান। ব্যাঙ্কের বড় চাকুরে। বাগবাজারের বাড়িতে থাকে। বিয়ের পরে দ্বিতীয়বার এই আসা।

প্রথমবার এসেছিল সরমার মৃত্যুর খবর পেয়ে। মা-বাবার অমতে বিয়ে করার জন্যে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক এক রকম নেই বললে চলে। তবু খবরটবর ঠিকই পায়। রামসুন্দর কলকাতায় গেলে গ্যাঁটের পয়সা খসিয়ে হোটেলে খান না। অর্কের বাড়িতে যান। রামসুন্দরের দৌলতে দেশগাঁয়ের খবর তার প্রায় সব জানা।

অর্ক বসে আছে বেতের চেয়ারে, গা এলিয়ে, সিগারেট টানছে। অন্যমনস্ক, চিন্তিত। লীনার পায়ের শব্দে চমকে উঠল। সামনে রাউন্ড টেবিলে অ্যাশট্রেতে আধ-খাওয়া সিগারেটটা গুঁজে হাসল, কেমন বিষণ্ণ, বলল, 'কেমন আছিস?'

লীনা মৃদু হেসে বলল, 'ভালো।'

'বাবা?'

'কেন, কাকুর সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'না। বাড়ি তো দেখছি না।'

'কাকুও ভালো আছেন। তা মানদা তোমাকে ঢুকতে দিল?'

হঠাৎ চঞ্চল হল অর্ক, 'মেয়েটার নাম মানদা? ওটাকে কবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলি?'

'প্রায় তিন বছর।'

'মেয়েটাকে ঝি বলে মনে হয় না।'

'কি মনে হয়?'

'রিসেপসনিস্ট। যখন শুনল আমিই শ্রীমান অর্ক চৌধুরী তখন যদি অভ্যর্থনার বহর দেখতিস—চা না কফি? চানের জল দেব? এখন খাবেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।'

লীনা হা হা করে হাসল। ইতিমধ্যে, কথার ফাঁকে ফাঁকে অর্ককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে লীনা। চেহারায় কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই ছিপছিপে, ব্যায়ামবীরের মত বুক উঁচু পেটানো শরীর, তামাটে রঙ। একটু অবাক হয়েছে পরনে আধ-নোংরা পাঞ্জাবি-পাতলুন আর মুখে কালো ছোপধরা দাড়ি দেখে।

সে বলল, 'কখন এসেছ ?'

'প্রায় এক ঘণ্টা।'

'বউ-ছেলে আসেনি ?'

অর্ক মাথা নাড়ল। 'আমার ছেলের কথা কি করে জানলি ? আমাদের যে ছেলে হয়েছে তা তো জানাইনি।'

'মাস ছয়েক আগে আমি বাগবাজারে গিয়েছিলাম। তখন তুমি দিল্লীতে অফিসের কাজে। তোমার বউটা না খুব ভালো। ইউ আর রিয়েলি ফরচুনেট। ভাগ্যিস আমাকে বিয়ে করনি।' কথাটা বলেই হঠাৎ ভিতরে চলে গেল লীনা। অর্ক কেমন অপ্রস্তুত হল। মনে হল কোথায় যেন সুর কেটে গেছে।

একা বসে থাকতে থাকতে তার মনে হল পারমিতাকে কতটুকু জানে লীনা। যদিও মেয়েদের কাছে মেয়েদের ত্রুটি আগে ধরা পড়ে। তবু সেই সময় কি পেয়েছে ? হঠাৎ মনে ভেসে উঠল বাবার কথাগুলো। দেখতে দেখতে দশ বছর পেরিয়ে গেছে। অথচ মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। সে আর পারমিতা দুজনে স্থির করেছিল তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। মুক্ত বিবাহ। এক অভিনব বিবাহ-ব্যবস্থা। এতে বিয়ের পরেও স্বামী-স্ত্রী স্বাধীন। এবং তা মা-বাবাকে জানাতে বাড়ি এসেছিল। ব্রেকফাস্টের প্রায় আধ ঘণ্টা পরে নিচে মায়ের ঘরে ঢুকেছিল। মা অসুস্থ, শয্যাশায়ী। চোখ বুজে শুয়েছিলেন। তার পাশে বসে লীনা। বাবা মায়ের বিছানার কাছে চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছিলেন। সে কেন যেন কিছু বলতে পারেনি, তায় নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাকে পিছন থেকে ডেকেছিলেন অলকেন্দু। অর্ক তাঁর কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। অলকেন্দু কোন ভূমিকা না করে বলেছিলেন, 'তোমার মায়ের অবস্থা ভাল না। এখন-তখন। তিনি তোমার বিয়ে দিতে চান এবং এজন্যে মেয়েও ঠিক করে রেখেছেন।' অর্ক চমকে তাকিয়েছিল বাবার মুখের দিকে, বুকে ঢিপঢিপানি।

অলকেন্দু বলেছিলেন, 'তোমার মা আর আমার পছন্দ একই। তোমারও নিশ্চয় মনে ধরবে।'

সেই মুহূর্তে তার চোখজোড়া লীনার দিকে অজান্তেই চলে গিয়েছিল। সেই মেয়ে যে লীনা তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয়নি। তবু সে বলেছিল, 'মেয়েটা কে ?'

এতক্ষণ লীনা মুখ নিচু করে অলকেন্দুর কথা শুনছিল। এবার তার মুখে লজ্জার লালচে আভা ফুটে উঠল। কেননা সে বুঝতে পারল অলকেন্দু তার কথাই বলতে যাচ্ছেন। অলকেন্দু কিন্তু সরাসরি তার কথা বললেন না। তিনি বলে উঠেছিলেন, 'তুমি এখনও বুঝতে পারনি ?'

অর্ক অসম্ভব গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'পেরেছি, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না।'

অলকেন্দু ভূরু কুঁচকে বলেছিলেন, 'কেন, লীনা কি তোমার অযোগ্যা ?'

'একটা আদিবাসী নিচু জাতের মেয়েকে তুমি যোগ্য ভাবতে পারো, কিন্তু আমি পারি না। আমার বংশমর্যাদা আছে।' বলেই ধুপধাপ পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

মানদার ডাকে অর্কের চমক ভাঙল, 'দাদাবাবু, বেলা পড়ে এয়েচে। খাবা চলো।'

খেতে বসে অর্ক বলল, 'লীনা, বাবা তো এখনও এলেন না ?'

লীনা খেতে খেতে মুখ তুলল, কিন্তু কিছু বলবার আগেই মানদা বলল, 'কাকাবাবু খেয়েদেয়ে গেচে। ফিরতে দেরী হবে।'

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে তিনখানা ঘরের বাঁ দিকের কোণের ঘরটা অর্কের। না, অর্কের ছিল। অর্ক এখন আসে না। দরজায় ঢাউস তালা ঝোলে দিনরাত। কেবল সকালে একবার খুলে ঝাড়পোঁছ করে মানদা। সে-ই তালা খুলে দিয়েছে। ঘরে একটা সিঙ্গল খাট, দুখানা সবুজ রঙের ঝকঝকে স্টিল ফ্রেমের চেয়ার এবং একটা টেবল। টেবিল জুড়ে নানা চেহারার ময়লা ক্যানভাস, শূন্য জমিঅলা ইজেল, রঙ, তুলি, প্যালেট, পেন্সিল। ভিতরে ঢুকলে কোন শখের শিল্পীর ঘর বলে মনে হবে।

অর্ক শিল্পী না। শিশুপ্রেমের অস্থিরতা কিংবা ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণায় কবি হয়ে যাওয়া শিল্পীর মত মঝেমাঝেই শিল্পী হয়ে যায়। এই সময় সে জাত শিল্পীর মত চোখের দেখার বাইরে যে গভীর সত্য, যে গভীর অন্তঃসৌন্দর্য আছে তা দেখতে পায়। তার দু' একটা কম্পোজিশনাল-কাজ দেখলে সে রকমই মনে হয়।

সে নাইলনের মালটিপকেট ঝোলায় আঁকার কিছু সাজসরঞ্জাম নিয়ে ঘর থেকে বেরুচ্ছিল, তখনই লীনা ওর সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে চা, ঝোলার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ফিক করে হেসে বলল, 'চা খেয়ে যাও।'

লীনা একেবারে মুখোমুখি, স্পষ্ট। বিকেলের কনে-দেখা আলোয় হঠাৎ অর্কের মনে হল লীনা যেন নাটোরের বনলতা সেন। পাখির নীড়ের মত দু'চোখে মায়া কাজল। আশ্রয়ের আভাস। সে অপলকে তাকিয়ে রইল সেই মুখে, যে মুখের দিকে সে কখনও ভাল করে তাকায়নি। লীনা হা হা করে হেসে উঠল। অর্ক চমকে উঠে চায়ের কাপ নিল। তারপর একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'হাসলি কেন ?'

'তোমার মন বেলাইন হয়ে যাচ্ছিলে, লাইনে নিয়ে হাসা হল।' কি ব্যাপার বল তো ? অসুখ না হলে তো তোমার শিল্পী সত্তা জাগে না।'

'আমার শিল্পী সত্তা কখন জাগে না-জাগে তাও জানিস ?'

লীনা কি বলতে যাচ্ছিল বলা হল না। মানদার অকারণ অধিক চপলতায় চাপা পড়ল।

'দিদি, ও দিদি, তোমাকে কারা ডাকতেচে।'

'যাচ্ছি। ও সম্পর্কে পরে কথা বলব।' বলে কেমন যেন বিষণ্ণ চোখে সে তাকাল এক পলক, শেষে চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'মানদা, কাপটা নিয়ে আসিস।'

এক মিনিট পরে মানদার পিছনে পিছনে অর্ক নিচে নেমে এল। বারান্দায় চার-পাঁচ জন লোক লীনার সঙ্গে কথা বলছে। তাদের দিকে চোখ যেতেই কানে এল। 'দাদুভাই, বাবা আছেন ?'

অর্ক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল রামসুন্দর। সে মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। তারপর হনহন করে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পরে সে মেছোঘেরির অনিবর্চনীয় মায়াবী আলোয় এসে দাঁড়াল। বসল

প্রধান আলাঘরের সামনে ভেড়ির উপর, নদীর দিকে মুখ করে। একটু পরে জল রঙে তুলি ভিজিয়ে দৃষ্টি রাখল কাগজে।

কখন যে বেবাক চরাচর ঝলমলে কাপড় ছেড়ে ধূসর কাপড় পরেছে তা খেয়াল করেনি সে। খেয়াল করেনি কেউ একজন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারপর কিছুক্ষণ তার ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছেন, 'বাঃ!'

ঘাড় ঘুরিয়ে এক অপরিচিতা বৃদ্ধাকে দেখে অবাক হল অর্ক। 'কিছু বলছেন ?'

বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। তোমার আঁকা যেন এক ক্লিকে হুল্ট করানো ছবি।'

এবার অর্ক তুলি রেখে বৃদ্ধার দিকে তাকাল। কাঞ্চনবর্ণ, বেশবাস পুরোপুরি বিধবার। হালকা চেহারা। সামনের দিকের চুলের গুছি একেবারে সাদা। চোখে সেলুলয়েডের ঘিয়ে ফ্রেম। পুরু লেন্স।

'আচ্ছা, আপনি কি দেবযানী ?' যেন বহু যুগের ওপার থেকে অর্কের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সেই মুহূর্তে আরও কিছু মনে পড়ে গেল, 'আপনিই তো কয়েক বছর আগে এখানে এসেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু দেবযানী না, নিভাননী। নিভাননী চৌধুরী। সেদিন নাম গোপন করেছিলাম।'

'মনে পড়েছে। আপনিই রামসুন্দরের রক্ষিতা। বলেছিলেন, ধূর্ত রাজনীতিকের মত রামসুন্দর কথার জাল বুনে আমাদের সম্পত্তি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে লুটেপুটে খাচ্ছেন। সরল বিশ্বাসে আমরা সেই জালে আটকে আছি। এই মেছোঘেরি তুলে দিলে রামসুন্দর জব্দ। পুকুর চুরি বন্ধ হয়ে যাবে।

একটা বড় শ্বাস ফেলে নিভাননী বললেন, 'তবু মেছো ঘেরি কিন্তু তুলে দাওনি।'

কিছু জবাব দিল না অর্ক। বলল, 'আসুন, আলাঘরের ভিতরে গিয়ে বসি।'

বলেই বুঝতে পারল যে নিভাননী আর তাঁর স্বাভাবিক মনে নেই! সন্ত্রস্ত, অন্যমনস্ক। কথাটা বোধহয় কানের পাশ দিয়ে পিছলে গিয়েছে।

'আপনি এখন এসেছেন কেন বললেন না তো ?'

'সেই কথাই মনে করিয়ে দিতে এসেছি।' বলে রাস্তার দিকে মুখ ফেরালেন। বোধহয় কেউ আসছে কিনা দেখছেন।

'কি হল ?' ওর কথায় মুখ ফিরিয়ে আনলেন আবার।

'আচ্ছা, এখন রামসুন্দর এসে পড়তে পারেন, না ?' অর্ক সামান্য হাসল। তারপর আঁকার সাজ-সরঞ্জাম গোছাতে গোছাতে বলল, 'তা পারেন বৈকি !'

একটু থেমে ফের বলল, 'একটা কথা কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারছি না, রামসুন্দর সম্পর্কে যা বললেন তা আমাদের বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলছেন না কেন ?'

হঠাৎ একদলা কান্না নিভাননীর গলায় এসে আটকে গেল। তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে জবাব দিলেন, রামসুন্দর তোমার বাবার পুরনো বিশ্বস্ত কর্মচারী। তোমার কথা তিনি বিশ্বাস করবেন কেন ?'

'হুঁ' অর্ক মাথা নাড়ল। 'আমি এলেই আপনি আসেন। তা খবরটা যোগায় কে আপনাকে ?'

'কে আর যোগাবে ? রামসুন্দর। বসিরহাট থেকে ফেরার সময় ট্রেনে তোমাকে দেখেছিলেন উনি। আর তুমি বাড়ি এলেই যে এখানে আস তা অনেকবার শুনেছি রামসুন্দরের কাছে।'

হঠাৎ চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন নিভাননী। বোধহয় কারও পদশব্দ শুনতে পেয়েছেন। অর্ক কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি চোখের পলকে আবছা ভেড়িপথে মিলিয়ে গেলেন।

অর্ক একটু হেসে ঝোলা কাঁধে নিয়ে দেখল রামসুন্দর প্রধান আলাঘরে ঢুকছেন।

॥ পাঁচ ॥

রামসুন্দরের চোখে এখনও একমাত্র ভগবানের লেন্স। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি বিড়ালের মত। আবছা অন্ধকারেও দূর থেকে তিনি নিভাননীকে দেখতে পেলেন। রাতে যখন হাসনাবাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন তখন তিনি একদম বিপর্যস্ত। সারাদিনের কাজের ধকলে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। অসুস্থ নিভাননীও ঘুমিয়ে পড়েছিল। এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করলেন না। কাপড়-চোপড় ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে, নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিজলী। সে জিজ্ঞাসা করল, 'খাবেন না ?'

বিজলী কাজের মেয়ে। তিনি বিজলীর দিকে তাকালেন, বললেন, 'না। তুমি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়।'

পরের দিন নিভাননী বিছানায় উঠে বসলে তাঁর দিকে রাগ রাগ মুখে তাকালেন রামসুন্দর। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা অভিমান তার মনকে ঘিরে ধরল। যার সুখের জন্য জীবনের এতগুলো বছর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পার করলেন, তাঁর কাছ থেকে শুধু ঘৃণা আর অবহেলা ছাড়া কি-ই বা পেয়েছেন। দরকার নেই আর মাথামাথি করে। যে কটা দিন বাঁচে, নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা করে বাঁচুক।

এই উদার চিন্তা অতি সহজে করলেও সহজ হতে পারলেন না তিনি। মেয়েমানুষকে এত স্বাধীনতা দেওয়া যায় ? টাকা আর মেয়েমানুষ, সে বৈধ কিংবা অবৈধ যাই হোক ; আগলে রাখতে হয়। নৈলে বেহাত হয়ে যায়। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তবু এ চিন্তা যায় না তাঁর।

সুদীর্ঘ পঞ্চাশটা বছর রামসুন্দরের সঙ্গে আছেন, কিন্তু পঞ্চাশ দিনও ঘরের বাইরে যাননি নিভাননী। ঘরে রামসুন্দরের সলিড স্বামীবাজি, বাইরে পরিচিত মুখের ভয়। এই দুয়ের আবর্তে পড়ে তিনি হয়েছিলেন একেবারেই দিশেহারা—তালকানা। সেই

আড়ষ্টতা আর নেই। মাঝে মধ্যে এখন তিনি ভাবেন কেন নিজেকে আড়ালে রেখেছেন। সমাজের ভয়ে। কিসের সমাজ? যে সমাজ পতিতার জন্ম দেয়, সে সমাজ অসুস্থ। তাকে মেরে ফেলা সভ্যতা। এই মুহূর্তে, সে কথা তাঁর মনে হল। সামনে বারান্দায় আরাম-চেয়ারে বসে রামসুন্দর কাজ দেখছেন। তিনি ক্লান্ত পায়ে তার কাছে গেলেন। একরকম হঠাৎই বললেন, 'হ্যাঁ গো, কি যেন নাম সেই মেয়েটার—'

রামসুন্দর মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন, 'কোন্ মেয়েটা?'

'ঐযে গো, অলকেন্দুর দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়ের মেয়ে যে নারীবাদী।'

এখন সবাই জানে লীনা অলকেন্দুর দূর সম্পর্কের দাদার মেয়ে। সময় মৌনীর মত উদাসীন, নিস্পৃহ। আপন গতিতে চলে, মুছে দেয় মানুষ। তার সভ্যতা, তার পরিচয়। সে রকমই মুছে দিয়েছে লীনার পরিচয়।

রামসুন্দর বললেন, 'লীনা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, লীনা। তোমার কাছে ওর কথা যত শুনেছি তত হতবাক হয়েছি। একদিন ওকে নিয়ে এস না গো—'

'আচ্ছা, ওকে না হয় একদিন নিয়ে আসব! কিন্তু অবাক হয়েছ কেন?'

'ওমা অবাক হব না। কি সাহস বল তো? যে সমাজের ভয়ে পুরুষের অন্যায় অবিচারকে মেয়েরা ভবিতব্য বলে মেনে নেয় সেই সমাজের কফিনে প্রথম পেরেকটা পুঁততে সে উঠেপড়ে লেগেছে। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান? এই অসুস্থ শরীর নিয়ে ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াই।'

'আহা, বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে। বলে রামসুন্দর ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের উপর কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন, সাপের পাঁচ পা দেখছে। যত সব।'

ঢোকার বেগেই আবার বেরিয়ে এলেন। তখন দেয়ালের ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় দশটা। কিন্তু বাইরে ছমছম করছে গা ঝলসানো রোদ বৈশাখের ধারাক্রমে। সেই ঝাঁজ কিছুটা ছাতা রুখে দিলেও যখন তিনি অলকেন্দুর বাড়ি পেঁছিলেন তখন তাঁর ভিতরের ঝাঁজ একটুও কমেনি, বরং চিন্তায় চিন্তায় বেড়ে গেছে। মেছো ঘেরির জাবেদা খাতায় হিসেবে গরমিল। ক'দিন ধরে হিসেব দেখতে হচ্ছে অলকেন্দুর সঙ্গে। আজও বসতে হবে।

রামসুন্দরকে দেখতে পেল লীনা। অর্কের ঘরের সামনের জানলায় দাঁড়িয়ে সে। অর্ক মানদাকে চায়ের অর্ডার দিয়েছিল। একটু পরেই লীনাই চা নিয়ে এসেছিল। অর্ক ভালবাসে বলে লেবু চা-ই করেছিল। তারপর তাকে চা দিয়ে সে এখানে, এই জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ খোল-করতাল আর 'হরিবল' আওয়াজে চমকে উঠে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। মনে মনে বলেছিল, একজন অতিথি ফিরে যাচ্ছেন। কে জানে নারী না পুরুষ। নারী কিংবা পুরুষ যাই হোন, তিনি কি দিয়ে গেলেন পৃথিবীকে? সমস্যা? কিছু সমাধান? অর্কের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'দাদা, ঐ যিনি চলে যাচ্ছেন তিনি না জন্মালে পৃথিবীর কি কোন ক্ষতি হত?'

অর্ক রঙ-তুলি নিয়ে তার সৃষ্টির মাঝে হৃদয়ের সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে মগ্ন থাকলেও

সে শুনতে পেয়েছিল দূর থেকে ভেসে আসা খোলকরতাল আর 'হরিবোল' ধ্বনি। এই অদ্ভুত প্রশ্নে সে প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর হো হো করে হেসে উঠে বলেছিল, 'আমি না জন্মালে পৃথিবীর কি কোন ক্ষতি হত ? বা তুই ?'

'ক্ষতি হত না ? তুমি না জন্মালে কি এমন শিল্প সৃষ্টি হত ?' আমি না থাকলে কি অসংখ্য মাটির প্রতিমার চক্ষুদান সম্ভব হত ?'

'লীনা, এই পৃথিবীতে কেউ অপরিহার্য নয়।'

'অপরিহার্য না হলেও সে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই অপরিহার্যতার জোরেই টিকে আছে মানুষ, টিকে আছে সংসার, আছে তার বর্তমান, আছে ভবিষ্যৎ।'

অর্ক উদাসীন গলায় বলল, 'হয়ত উনি এমনই এক অপরিহার্য মানুষ।'

'না। অনেকের মত উনি পৃথিবীর কোন কাজে আসেননি। নিজের আখের গুছিয়েছেন। বংশরক্ষার নামে বংশবিস্তার করেছেন। এবং সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। এই রকম মানুষের জন্ম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।'

অর্ক থ'। তার তুলি থেমে গেছে। এ কেমন কথা রে বাবা ! কে আখের গুছোতে আসবেন, কে মানুষের জন্যে আসবেন তা আগে থেকে কি করে জানা যাবে ! তাই কথা রহস্যের কিনারা করতে সে বলল, 'কঠোরভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করলে কি সব মহাপুরুষ জন্মাবেন ?'

লীনা বলল, 'মহাপুরুষের সংজ্ঞা কি তা আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি, একজন মানুষের তার দেশের প্রতি কিছু কর্তব্য থাকে। সেই কর্তব্যবোধ ওই স্বার্থসর্বস্ব মানুষটার ছিল না। 'এক দম্পতি, এক সন্তান' নীতি চালু হলে অবশ্যই এমন মানুষ কিছু জন্মাবেন, কিন্তু একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটে যাবে।'

'সামাজিক বিপ্লব ? মানে ?'

'সন্তান যদি মেয়ে হয়, তাহলে সেই মেয়ে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে মা-বাবাকে। মা-বাবা তখন মেয়ের মধ্যে ছেলেকে খুঁজে ফিরবেন। তখনকার মত ছেলেবেলা থেকে তার কাছে নারীত্বের কীর্তন করবেন না। এর ফলাফলও হবে সুদূরপ্রসারী। মেয়ে হয়ে উঠবে মা-বাবার ভবিষ্যনিধি। এবং স্বাবলম্বী। কেননা মা-বাবা অনিবার্য স্বার্থে এটা চাইবেন। হয়ত নাতি-নাতনির মুখ দেখার জন্যে মেয়ের বিয়ের কথা ভাববেন। কিন্তু মেয়ে কোন মতে দায় হয়ে দাঁড়াবে না। নারীপুরুষের বৈষম্য দূর হবে। কন্যা-ভ্রূণ হত্যা বন্ধ হবে। পুরুষের লাম্পট্য থাকলেও সমাজে আর পতিতা জন্ম নেবে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হবে কি জান—

অর্কের মুখে রা নেই। সে একেবারেই হাঁ। হাতের তুলি খসে পড়েছে। বসার কথাও ভুলে গেছে। এই কথা বলার মাঝেই ক'মুহূর্ত বাইরে তাকিয়েছিল লীনা, ফিরতেই অর্কের এ হেন অবস্থা দেখেছিল। মুচকি হেসে বলেছিল, 'পিতৃতন্ত্রের বড় কথা 'বংশরক্ষা', তখন 'প্রজাতিরক্ষা'-য় পরিণত হবে।'

এবার অর্ক ক্লান্ত পরিশ্রান্ত লোকের মত ধপাস করে চেয়ারে বসে বলেছিল, 'তোর কথাগুলো শুনতে বেশ ভালো লাগল, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ?'

'কেন, সরকার।'

'তাহলেই হয়েছে। সরকার পিতৃতন্ত্রের ধারক ও বাহক। তাছাড়া এই নীতি চালু করলে গদি থাকবে?'

'গদি তো আজ বা কাল যাবেই। কিন্তু দেশের স্বার্থের চেয়ে দল বা নিজের স্বার্থ বড় হবে? এঁরা কেমন দেশনেতা? আমি জানি আগামী নির্বাচনে পার্টি আমাকে নমিনেশান দেবে না। যদি দেয়ও, কোন পুরুষ আমাকে ভোট দেবে না। সেই ভয়ে নারী-আন্দোলনের মত একটা মহান কর্মযজ্ঞ বন্ধ করে দেব? সত্যি বলতে কি, এখন নেতারা সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছেন। সবাই যদি সাধারণ হয়ে যান, তাহলে ব্যতিক্রম হবেন কে? অথচ শরৎচন্দ্রের ভাষায়, এই ব্যতিক্রমটার জোরেই টিকে আছে ধর্ম, টিকে আছে পুণ্য, আছে কাব্য-সাহিত্য, আছে অবিচলিত শ্রদ্ধা-বিশ্বাস। তাহলে বল, এঁদের, এই দেশনেতাদের কি কোন প্রয়োজন আছে? এরা না জন্মালে কি দেশের কোন ক্ষতি হত?'

বলে বাইরে তাকাতেই দেখল আশির যুবক রামসুন্দরকে। হঠাৎ লীনা কিশোরীর চঞ্চল গলায় বলল, 'দাদা, দেখ।'

'কি?' অর্ক ওর পাশে গিয়ে বাইরে তাকাল। লীনা সেইভাবেই তাকিয়ে থেকে বলল, 'রামসুন্দর। এই সমাজব্যবস্থার বিদূষক। পিতৃস্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী! হিপোক্রিট। সব পুরুষই হিপোক্রিট, কিন্তু রামসুন্দর—'

অর্ক লীনার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ধমকের সুরে বলল, 'থামতো, খালি পুরুষ-বিদ্বেষ।' বলেই মনে পড়ল কাল বিকেলের ঘটনাটা। সঙ্গে সঙ্গে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বলল, 'কাল বিকেলে মেছোঘোরিতে কি হয়েছিল জানিস?'

লীনা ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

অর্ক একে একে সব বলে গেল, যেমন যেমন ঘটেছিল যেমন যেমন শুনেছিল, সব।

অর্ক খেয়াল করেনি। করলে নিশ্চয়ই দেখতে পেত কাহিনী শুনতে শুনতে একসময় লীনার মুখে শ্রাবণের মেঘের ছায়া পড়েছিল। কাহিনী শেষ হলে সে কতক ইতস্তত করে বলল, 'কাকুকে বলেছ?'

'খেপেছিস! কি বলতে কি বলে ফেলব! শেষে চিড় খাওয়া সম্পর্ক চিচিংফাঁক হয়ে যাবে।'

লীনা ভেবেছিল, এ নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলবে অর্ক। কিন্তু কই, তুলল না তো। তার এই নিরাসক্তি লীনাকে ভাবিয়ে তুলল। সে জানে নিরাসক্তি মানেই বোধহীনতা নয়। পৃথিবীতে সব নিরাসক্তিরই একটা কারণ আছে, যদিও সেই কারণ, যেহেতু সুপ্ত, সবসময় বোঝা যায় না। যায় না বলেই অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। মরুক গে। সে সেই ভাবনাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই প্রশ্ন ছুঁড়ল। 'আচ্ছা, তোমার দিদু যিনি নিখোঁজ, তাঁর নাম তো নিভাননী চৌধুরী। রামসুন্দরের রক্ষিতারও ঐ একই নাম। ব্যাপারটা কাকতালীয় না অন্য কিছু?'

অর্কের ভুরু কুঁচকে গেল, সেই সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়ল। 'মানে?'

'মানেটা আগে খ‌ুঁজতে দাও।' লীনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'প্লিজ, এ নিয়ে কোথাও কোন আলোচনা করবে না। স্পিকটি নট।'

যেভাবে বলল, তাতে সামান্য একটু নির্দেশের ছোঁয়া ছিল। অর্ক সেটা গায়ে মাখল না, বলল, 'ঠিক আছে।'

বেরিয়ে যাচ্ছিল লীনা। কিন্তু দরজা পর্যন্ত নিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল আবার। বলল, 'আঁকাটাকা রেখে নিচে এসো। চান কর।'

লীনা চলে যাবার পরও খানিকক্ষণ অর্ক থম হয়ে বসে থাকল। কিছুটা অস্থিরতা, কিছুটা অস্বস্তি, কিছুটা সংশয় নিয়ে যখন হাতের কব্জিতে চোখ রাখল তখন বারটা বাজতে পাঁচ। নিচে যাবে বলে সে উঠে পড়ল।

বিকেলে মেছোঘেরিতে যাবার আগে সে লীনার ঘরে এল। কাঁধে ঝোলা। লীনাকে দু-একটা কথা বলে যাওয়া দরকার। কি জানি আজ যদি আবার নিভাননী আসেন।

লীনা অন্যদিকে মুখ করে শুয়ে আছে। সত্যই ঘুমোচ্ছে কিনা, কে জানে। সে একটু জোরেই ডাকল। এক ডাকেই সে বিছানায় উঠে বসল। গায়ের কাপড় ঠিকঠাক করতে করতে বলল, 'দাদা! তুমি?'

'মেছোঘেরিতে যাব বলে বেরিয়েছি। কিন্তু—।'

'কিন্তু? কি, থেমে গেলে কেন?'

'আজ যদি আবার উনি আসেন?'

'আসবেন। তাতে কি হয়েছে?'

'না, মানে কেমন নার্ভাস হয়ে পড়ছি!'

'আহা-হা, কি সাহসী পুরুষ। বসো। বসো। বাবার একমাত্র ছেলে। বউয়ের একমাত্র স্বামী। ভগবান না করুন, কিছু একটা ভাল-মন্দ হলে কান্নার ইঞ্জিন কে থামাবে?'

বারান্দার দিকে, জানলার প্রায় গা ঘেঁষে লীনার খাট। মুখোমুখি সোফায় বসে পড়ে অর্ক বলল, 'একজন কাদায় পড়ে তো, অন্য জন ঠোকর দেয়। পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর।'

হঠাৎ লীনা আবেগকম্পিত গলায় আউড়ে গেল, স্বপ্নের এস্কেলেটারে চড়ে / আকাশের সীমানায় / বর্ণময় আকাশে যে ঘোরে / অযুত নক্ষত্রের আলো ঝলসানো চোখে / সে কি পায় / আকাশের কান্নাভেজা মাটির / সোঁদা গন্ধের ঠিকানা··· ···লীনার ভাব এসে গিয়েছিল। হয়ত আরও দু-একটা লাইন আবেগতরঙ্গে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু সেই ভাব পট করে কেটে গেল গ্রীল জানলা দিয়ে চোখ বারান্দায় যেতেই। সেখানে বসে আছে এক মহিলা। ঘোমটার ঘেরাটোপে বেবাক মুখখানা ঢাকা। লীনার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে এল, 'আহা, এই না হলে বঙ্গললনা! 'ধীরতা নম্রতা মাখা / ঘোমটায় মুখ ঢাকা / রয়েছে উননধারে চিরকাল ধরি।' ছুটে গিয়ে একটানে ঘোমটাটা খুলে দিয়ে মধ্যবিত্ত ন্যাকামি ঘুচিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল

হল, অর্ক বসে আছে। সে পুরুষ। পুরুষই একদিন প্রবর্তন করেছিল এই ঘোমটা প্রথা। ভয়ে পাছে অন্য পুরুষ তার বউয়ের শ্রীমুখখানা দেখে মোহিত হয়। এবং নিয়ে ভেগে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজের লাগাম টেনে ধরল। রাগরাগ ভাব নিয়ে খাট থেকে নামতে যাচ্ছিল। সংযত হল। পদ্মিনী পায়ে নামল। অর্ককে বলল, 'বসো। আমি আসছি।'

কিছুক্ষণ মহিলাকে ভুরু কুঁচকে দেখে চড়া গলায় লীনা বলল, 'কে তুমি?'

শিউরে উঠে নিঃশ্বাস বন্ধ করে মহিলা বলল, 'আমি চম্পা।'

'ঘোমটায় মুখ আড়াল করে রেখেছ কেন?'

মাথার কাপড় খানিকটা পিছন দিকে টেনে আড়চোখে ঘরের ভিতর দেখল চম্পা। তারপর আবার মাথা হেঁট করে বলল, 'উনি ঘরের ভিতর বসে আছেন বলে—'

এতক্ষণে লীনা ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বলল, 'এক হাত ঘোমটা দিয়েছ! রাবিস্‌। বলো, কি দরকার?'

সহসা পিঠের কাপড় ফেলে দিল চম্পা। জলধরা গলায় বলল, 'তাকাও। আমার পিঠটার দিকে তাকাও।'

দেখার কিবা আছে। গুচ্ছের কালশিটে পিঠে। স্বামীত্বের অধিকারের বর্বরতা। সে রোজই দেখছে। দেখতে দেখতে তার মন অসাড় হয়ে গেছে। সব অনুভূতির ঊর্ধ্বে সে।

কাপড়ের আলগা আঁচলটা পিছন দিকে টেনে চম্পার একহাতি কালো খোলা পিঠ চাপা দিয়ে লীনা বলল, 'পেঁদানি খেতে জন্মেছ, খেয়েই যাও। এ নিয়ে আমার কাছে কিছু বলতে এসো না।'

লীনার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে চম্পা বলল, 'একথা বলছ কেন দিদি?'

'কি বলবো? তোমরা কোন কথা শোন? তোমার এই অবস্থার জন্যে তুমিও কম দায়ী নও। যে স্ত্রী স্বামীর কাছে ধরা দিয়েও অধরা থাকতে পারে, সে তার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে পারে। কিন্তু তুমি এমনভাবে আত্মসমর্পণ করে বসে আছ যে এখন তার বাবার সম্পত্তি। যথেচ্ছ ব্যবহার করছে।' একটু থেমে লীনা বলল, 'কিছুটা সমীহ আদায় করার একটা পথ এখনও খোলা আছে।'

চম্পা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কি?'

'সোহাগে সোহাগ, হিংসায় হিংসা। কি, পারবে?'

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের এমনতর ব্যাখ্যা চম্পার স্বপ্নেরও অগোচর। গরমে গরম দিয়ে এই পরম প্রাপ্তি। এখন হিংসায় হিংসা দিলে কোন চরম প্রাপ্তি তার ভাগ্যে জুটবে কে জানে! সে শিশুকাল থেকে শুনে আসছে স্বামীর পায়ের তলায় স্ত্রীর বেহেস্ত। কে না বেহেস্তে থাকতে চায়? সেও আছে। আহা, কি বেহেস্ত। প্রতি মুহূর্তে নরকযন্ত্রণা। এখন তার মনে হচ্ছে পুরুষ মহা ধড়িবাজ। অন্য পুরুষের মোহময় আবেশ থেকে অন্দরমহলকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে এই বেহেস্ত নিশ্চিত একটা টোপ। এই টোপ যথারীতি গিলেছে। দোজখকে বেহেস্ত ভেবে মরছে। এই ভাবনাই বুঝি কে সন্ত্রস্ত করেছে।

এই নূতন উপলব্ধি নিয়ে চম্পা উঠে দাঁড়াল। তার উপলব্ধির জগতে এ এক অভিনব সংযোজন। এবং এই উপলব্ধির বাস্তবতা চলার পথের অন্ধকারে। আপাতত চম্পার বোঝাপড়া সেই অন্ধকারের সঙ্গেই। সে বলল, 'তোমার কথামত চলতে চেষ্টা করব।'

লীনার কথা শুনে অর্কের মন ব্যাজার হয়ে গিয়েছিল। সে মনে মনে ভেবে রেখেছিল ঘরে আসামাত্র সে ও নিয়ে একটা বোঝাপড়া করবে। সেই ইচ্ছের সুতো ছাড়তে সে একদম দেরি করল না। সে বলল, 'এক চালের তলায় থেকে হিংসায় হিংসা? অসম্ভব! ইমপসিবল।'

লীনা তার প্রায় মুখোমুখি বসে বলল, 'তাহলে কি একজন মারবে, অন্যজন মার খেয়ে যাবে চিরকাল?

'কিন্তু এটা কি সমস্যা সমাধানের কোন পথ?'

'এই সমস্যার সমাধান হবে নারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এটা অস্থায়ী ব্যবস্থামাত্র। মানুষ শক্তের ভক্ত। চম্পা একটু শক্ত হলে—'

'ওঁর স্বামীর দৈহিক শক্তি কমে যাবে। বিনীত হয়ে যাবে স্বামী। ইডিয়েট!'

এ কথা সব পুরুষের। লীনা এর প্রতিবাদ করল না। অর্ক আবার বলল, 'একটা কথা বলি শোন, নারী-পুরুষের সমতা, স্ত্রী-স্বাধীনতা কোন পুরুষ চায় না। এমনকি, মেয়েরাও। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমরকে আজও অনেকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে বা মেনে নিতে পারেনি।'

লীনা হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল বারান্দায়, তারপর লনে। বলল, 'একথা কে না জানে? কিন্তু এই জানা শেষ কথা নয়। এখানে পূর্ণচ্ছেদ চলে না।'

'তারপর অর্কের দিকে তাকিয়ে পরিহাসের সুরে বলল, 'এমন কথার যুক্তিজালে বৌদির নারীবাদী চিন্তাভাবনা কি হাঁড়িতে সিদ্ধ করতে পেরেছ?'

লীনার প্রশ্ন শুনে অর্কের বুকের ভিতরে চৈত্র শেষের এক অপরাহ্ণের আলোআঁধারি ঘনাল, ঘরের গুমোটে বৈদ্যুতিক পাখার বনবন হাওয়া ঘুরল। সেই শব্দের ভিতর দিয়ে অর্ক শুনতে পেল মায়ের কণ্ঠস্বর, তুই ফ্রিজ, পারমিতা ফার্নেস। এই সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর নারী-পুরুষের বিয়ে সাধারণত সুখের হয় না। তাছাড়া পারমিতা নারীবাদী। পুরুষশাসিত সমাজের কংক্রিটের ভিত ও অঘটনের ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়। কি সেই অঘটন কে জানে! সেই কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে উঠল তার নিজের গমগমে আওয়াজ, বিয়ের আগে অনেক কিছু বলে মেয়েরা, বিয়ের পরে সবই হাঁড়িতে সিদ্ধ হয়। অর্ক আপাতত সেই কণ্ঠস্বর শুনছে।

সেই সঙ্গে অর্কের মাঝেমাঝেই যে মুখটা মনে আসছে সেটা লীনার। অদূরে মেঝেতে বসে উল বুনছে। নীরবতার দুঃসহ বাতাস সেখানে থমথম করছে।

এদিকে অর্কের মুখ দেখে লীনার মনে হচ্ছে অর্কের বুকের ভিতরে জমে থাকা ব্যথা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। কি হয়েছে অর্কের! তার নিরুদ্বিগ্ন জীবন-আকাশে দুঃখের মেঘ কেন? অন্ধকার একটা বৃত্তের মধ্যে খানিক অস্বস্তি নিয়ে লীনা কিছুক্ষণ

ঘুরল। তারপর হঠাৎই গেয়ে উঠল ভৈরবী—'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল…'

মগ্ন হয়ে গাইছে, সুরের কাঁপনে বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে ব্যথামিশ্রিত আনন্দ। গান শেষ করে সে বলল, 'কি হয়েছে তোমার? এনি প্রব্লেম?'

অর্ক খুব অবাক হয়ে গেল, ঠিক বুঝতে পারল না লীনার হঠাৎ এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কি। রবীন্দ্রনাথের এই গানটা, এই মুহূর্তে, সে বেছে নিলই বা কেন। নিয়মের সংসারে অভ্যস্ত জানোয়ারের মত অনিয়মে জন্ম দেওয়া পারমিতার সন্তানের কথা সে জেনে গেছে নাকি। অর্ক অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'না এমন কিছু না। একটু দাম্পত্য কলহ।'

লীনা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সেকি! তোমাদের মুক্ত বিয়ে না?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অর্ক মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে বিবাদ কেন? শুনেছি বিভিন্ন বিষয়ে ছেলেমেয়ের মতে ফারাক থাকলে মুক্ত বিয়ে হয় না?'

'একটা কথা ভেবে খুব খারাপ লাগছে জানিস? আমাদের দুজনের মতের বিস্তর ফারাক। অথচ, ওকে পাবার জন্যে এত নিখুঁত অভিনয় করেছি, ও নিশ্চয়ই ভেবেছে, আমরা মুক্ত বিয়ের উত্তম জুড়ি। যখন বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি ও নিঃসংশয়ে রাজি হয়েছে।'

'কাজটা ভালো করনি দাদা।'

'কি করব বল। ওর রূপে-গুণে এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে অন্য কিছু ভাবতেই পারিনি।'

'এখন কি ভাবছ?'

এ প্রশ্নে সে থতমত খেল। পারমিতা আর সে এখন এক ছাদের তলায় নেই। সে প্রায় কপালজোরেই একখানা ঘর পেয়েছে, একতলায়। বাগবাজার স্ট্রীটেই। বাড়িউলির ভাড়া দেবার ইচ্ছে ছিল না। অনুরোধ-উপরোধেই শেষ পর্যন্ত দিয়েছেন। সে কথা বলতে গিয়েও কেন যেন বলল না। সে বলল, 'ডিভোর্সের নোটিশ ধরিয়ে দেব কিনা।'

'ডিভোর্স!' হতভম্ব লীনা, 'ব্যাপারটা এত দূর গড়িয়েছে? এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিলে কি নয়?'

অর্ক সঙ্গে সঙ্গে বলল; 'তুই জানিস না কি করেছে ও। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।'

'লজ্জা তো নারীর ভূষণ।' অদ্ভুত গলায় বলল লীনা। অর্ক বুঝল পুরুষবিদ্বেষ প্রবল না হলে এমন গলায় কথা বলা যায় না।

'সেই লজ্জায় পুরুষকেও মাঝেমধ্যে পড়তে হয়। সেই অবস্থাটা মোটেই সুখকর নয়।'

'ও।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ অর্ক বলল, 'কোন সুস্থ স্ত্রী পারে অবৈধ সন্তান জন্ম [দিয়ে] স্বামীকে দিনের পর দিন ঠকাতে?' বলেই সে ভয়ে দরজার দিকে তাকাল।

'ইস্! জোরে বলে ফেললাম। মানদা শুনতে পেয়েছে কিনা কে জানে!'

'মানদা ভিতরে নেই। কিছু কেনাকাটা করতে ওকে হাসনাবাদ পাঠিয়েছি।' লীনা বলল, 'তা কি করে জানলে তোমাদের সন্তান অবৈধ? সন্তানের পিতৃপরিচয় তো একমাত্র মা দিতে পারে। পারমিতা বলেছে?'

'অপরাধী কি সহজে অপরাধ স্বীকার করে? লোকে বলছে।'

'পাগলামি করো না দাদা—' লীনা বিচলিত হয়ে বলল, 'কাকুর কানে এসব কথা কিছুতেই তুলো না। দ্যাখো, এই সমাজে মেয়েরা নিয়মের বাইরে পা ফেললে এরকম একটু-আধটু বলে লোকে। ও কিছু নয়। দু-দিনের হইচই। দেখ সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অর্ক নিঃশ্বাস নিল 'আই অ্যাম টোট্যালি পাজলড লীনা। পথেঘাটে লোকের বিদ্রূপবর্ষী হাসি আমার বুকে প্যাটপ্যাট করে বেঁধে। মনে হয় দেহের রক্তকণিকাগুলো মরে যাচ্ছে, জল হয়ে যাচ্ছে রক্ত। এক যন্ত্রণাকর অনুভূতি আমাকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে। আমি···আমি···।' অর্কের স্বর বুজে এল। লীনা চমকে উঠল। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। পরে একটু ইতস্তত করে বলল, 'তোমার কোথাও একটা ভুল হচ্ছে দাদা। বৌদির সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করো।'

অর্ক যেন চিৎকার করে বলতে চাইল, সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুঁড়েছে, পারমিতা কোন জবাব দেয়নি। এক রহস্যময় নীরবতার গর্ভে সে ছোট্ট শিশুর মত হাত-পা নেড়েছে শুধু। তার গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। একটা দমবন্ধ করা কষ্ট তার সব শক্তি নিংড়ে নিয়েছে যেন। সে প্রায় অসাড় হয়ে চুপচাপ বসে থাকল।

সেই সময় বারান্দা থেকে অলকেন্দুর ক্লান্ত গলা ভেসে এল, 'মানদা'। মানদা!

লীনা গিয়ে বলল, 'মানদা নেই। কি বলো।'

অলকেন্দু চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'একটু চা দিবি মা?' লীনা তাঁর কাছে গেল। তাঁর চুল আঙুল দিয়ে সাব্যস্ত করতে করতে বলল, 'তুমি কি বলো তো! পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে মানদাকে ডাক। আমাকে ডাকতে পার না!'

'তুই কি সব সময় বাড়ি থাকিস? তাছাড়া—'

'তাছাড়া?'

'কত আশা করেছিলাম তোকে অর্কের বউ করব, মৃত্যু পর্যন্ত তোর হাতের সেবা নেব। তা তো হল না। কিসের জোরে তোর সেবা চাইব বল।' শেষে অলকেন্দুর গলা ধরে এল।

'খুব হয়েছে। থাম তো এবার। বলেছি না একথা বলবে না। আমি তোমার মেয়ে। ব্যস, এটাই বড় জোর।'

অলকেন্দু হাসলেন। হেসে লীনাকে কাছে টেনে বললেন, 'তোকে আমি খুব ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দেব রে লীনা।'

'বেশ তো। আগে তোমার কাজটা শেষ করি।' বলে লীনা ভিতরে গেল।

॥ ছয় ॥

লীনা একলা তকিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে। মাথার উপর ময়ূরকণ্ঠী আকাশে বিকেলের হালকা রোদ তিরতির করছে। পায়ের নিচে সবুজ ঘাস। দুপুরে বোধহয় অল্প বৃষ্টি হয়েছিল। ঘাসের ডগায় জল। মাটি ভিজে ভিজে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ ঘরের ভিতর লক্ষ্য করল। এক অদ্ভুত সজীবতায় মেয়েরা কলকল করছে। তাঁর মনে হল আজ মিটিংয়ে উপস্থিতির সংখ্যা অনেক, অনেক বেশি। আশাতীত। সেই ধারণার সঙ্গে বাস্তবতার কতখানি মিল আছে এ বিষয়ে টালমাটাল সংশয় নিয়ে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল।

বিদ্যালয়ের লম্বা বড় ঘরে পা দিয়ে সে বুঝতে পারল, যে নারীবাদ গত কয়েকটা মিটিংয়ে সে প্রচার করেছে তা বাতাসের সমুদ্রে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যায়নি, ফুরিয়ে যায়নি আতস বাজির মত, সত্যি সত্যি গিলেছে মেয়েরা। অনির্বচনীয় পুলকে তার বুকের ভিতর ছড়িয়ে পড়ল ঝিরি তাপ।

সামনে দিয়ে ঢোকায় সবার দৃষ্টি তার উপর পড়ল। এগিয়ে এল ছন্দা। সে মিষ্টি হেসে বলল, 'আসুন দিদি।'

ছন্দা তকিপুর গ্রাম কমিটির সেক্রেটারি। তার আন্তরিকতা নারী-আন্দোলনে জোয়ার এনেছে। সম্ভবত এই জমায়েত তারই ইঙ্গিত দেয়।

লীনা মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অধিকার আদাদের লড়াইয়ে সামিল হবার জন্যে প্রথমে উপস্থিত সদস্যাদের ধন্যবাদ দিয়ে বলল, আমাদের আন্দোলন যত জোরদার হচ্ছে তত পিতৃতন্ত্রের প্রহরী এবং কিছু কিছু মূঢ় নারী এর বিরুদ্ধে মরিয়ার মত অর্থহীন ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন। মাতৃত্বে নাকি মেয়েদের পূর্ণতা। টেরেসা, সারদা, দুর্গা, কালীর মত মহীয়সী নারীরা কি সন্তান জন্ম দিয়ে মা হয়েছেন? এঁরা পূর্ণতায় ঝলমল করছেন কেন? আসলে নারী ঝলমল করে ব্যক্তিত্বে, নারীত্বে নয়। নারী মা হবার জন্যে উদ্‌গ্রীব একথা পুরুষ একটু বেশি করেই জানে। সেইজন্যেই তাড়াতাড়ি মাতৃত্ব দিয়ে তার তৈরি কারাগারে বন্দী করে ফেলে। এই বন্ধনদশায় মেয়েদের দেহমন অসাড় হয়ে গেছে। যেমন ইংরেজ শাসনে ভারতবাসীর অবস্থা হয়েছিল, মাথা তোলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। আমার অনুরোধ, এই অবস্থা, এই পরাধীনতা আপনারা আর মেনে নেবেন না। সমান অধিকারের লক্ষ্যে নরমপন্থীদের মত অহিংস কিংবা চরমপন্থীদের মত সহিংস আন্দোলন গড়ে তুলুন। একটা কথা মনে রাখবেন, নারী পুরুষের প্রয়োজন পারস্পরিক। এই আন্দোলন পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।'

ভাষণ শেষ করে সে স্লোগান দিল, নারী সুরক্ষা সমিতি জিন্দাবাদ।

জিন্দাবাদ···জিন্দাবাদ···। ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ল মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ।

এবার এল ছন্দা। সে কিছু ঘোষণা করতে যাচ্ছিল, হয়ত পরবর্তী বক্তার নাম। একজন লোককে ঘরে ঢুকতে দেখেই বোধ হয় থেমে গেল। পরিচিত, যেন দু-একবার দেখা এমন মনে হচ্ছিল কিন্তু স্মৃতির মধ্যে ধরতে পারছিল না। লোকটার গায়ে আধ-ময়লা সাদা হাফ শার্ট, পরনে মুসলমানী লুঙ্গি, তোবড়ানো গাল, চিরুনি না-পড়া এলোমেলো চুল। ইতিমধ্যে প্রায় সব কটা মাথা, ওর দিকে ফিরেছে। লীনা উঠে দাঁড়াল, 'কে আপনি? কাকে চান?'

লোকটা এক পলক চোখ তুলে দেখল। ক্লান্ত-পাতা ভারী চোখে রোগী যেমন করে কাছের জিনিসকে দেখে। চারপাশ চিনে নিতে চায়। তার বেসামাল চোখে ধরা পড়ল ঘরময় রঙবেরঙ পোশাকের মেয়েমানুষ। কেন না সে অভ্যস্ত মাতাল, নেশার খোয়ারিতে অসাড় হয়ে যায়নি। লীনার কথা যেন বা শুনতে পায়নি। সে জড়ানো গলায় ডাক দিল, সুন্দরী—সুন্দরী—

তার ডাকের অনুচ্চ শব্দ প্রবল কৌতূহলী মেয়েদের পোশাকের ঘষটানির শব্দকে ছাপিয়ে গেলেও সুন্দরী মাথা তুলল না।

এবার সে দাঁত ঘষটাল, 'এখনও উঠি আয় বউ। রাগ মাথায় চড়তেচে।'

এই মুহূর্তে ঘরের ভিতর যেন দুটো পৃথিবী। একটার মধ্যে ঘড়ি চলছে টিক্ টিক্ টিক্। সেখানে নিচু নজরে ধ্যানী বকের মত দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। অন্যটায় সময় স্তব্ধ। বাতাস অস্বস্তিকর, একটা চাপা গুঞ্জন এখানে ওখানে। এক মুঠো বিরক্তি নিয়ে ছন্দা লীনার মুখের দিকে তাকাল। আর তখনই লীনা লোকটাকে বলল, 'আপনার বউ বোধহয় এখানে নেই। আপনি এখন যান।'

লোকটা নিচু নজর উঁচু করে, গলা জড়িয়ে বলল, 'আলবত আছে।'

লোকটার গলার স্বরে কেমন এক প্রত্যয় ও দৃঢ়তার ভাব। ভিড়ের মধ্যে যাকে খুঁজছে সে পলকের জন্যে দেখা দিয়ে অদৃশ্য হলে মানুষের যেমন হয়।

লীনার রাগ হল না। হয়ত ওর বউ সত্যি এখানে আছে। ভয়ে ঘাপটি মেরেছে। এই সমাজটা এত একপেশে কেন! একপেশে বলেই স্বামী এসে চেঁচাতে পারে, ভয় দেখাতে পারে। এমনটা স্ত্রী করলে চারদিকে রব ওঠে, গেল গেল।

সেই কবে, যখন শ্বেতকেতু বিয়ের প্রচলন করলেন, এক নারীর উপর একই পুরুষের অধিকার জন্মাল, তখন, সেই তখন থেকে, স্ত্রী স্বামী নামক অদ্ভুত জীবটার ছায়া হয়ে বেড়াচ্ছে। জীবনের রৌদ্রজলে স্বামীর পায়ের চিহ্নে পা ফেলে চলছে সমস্ত পথ। সেই পথে পাতিব্রত্যের কত নাটক। উপবাস, ব্রত, পুজো। স্বামীর কোন আচার পালন নেই। যেন স্বামী ভগবান, শ্রদ্ধা-ভক্তি, সমীহ শুধু ভক্তই নিবেদন করে যাবে।

উপস্থিত সদস্যাদের মধ্যে ফিসফিসানি লেগে আছে। মাঝে মধ্যে কুঁইকুঁই হাসি ঠেলে উঠছে। ছন্দা একে একে দেখল, যতগুলো মুখ দৃষ্টিতে ধরে। মনে হল সুন্দরীকে সে

চেনে। কিন্তু গলা তুলে ডাকল না। যদি থাকে, বিব্রত হবে। তারপর সে জ্বলন্ত চোখ লোকটার তেলাকুচো চোখের দিকে তাগ করল। সে বলে উঠল, 'বলি যাবেন, না বের করে দিতে হবে?'

এই কথা শুনে লোকটার চোখমুখে আগুন নেচে উঠল। সোজা ছন্দার দিকে তাকাল। উঃ, রাগের কি ভয়ংকর নীরব অভিব্যক্তি!

ছন্দা ভয়ার্ত চোখে লীনার দিকে ফিরে বলল, 'দিদি, লোকটাকে জোর করে বের করে দেবার ব্যবস্থা করুন।'

লীনা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। সত্যিই, লোকটাকে এখন শয়তান কিংবা পিশাচের মত মনে হচ্ছে। কে জানে মাথায় বজ্জাতির ভূত আছে কিনা! এতগুলো মেয়ে রয়েছে বলেই বুঝি এখনও সংযত।

হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল লীনা। সটান সে চলে গেল লোকটার সামনে। তার চোখের পানে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে সে বেশ জোরে বলল, 'অনেক হয়েছে। এবার আসুন।'

মুহূর্তে লোকটার মোচড় খাওয়া ঠোঁটের কোণে আকাশে চকিত বিদ্যুতের মত হাসির একটা চিকন রেখা কেঁপে উঠে মিলিয়ে গেল, 'কোন ডর নেই। মাল খেইচি, কিন্তু মাতাল হইনি।'

লীনা কিছু বলতে যাচ্ছিল। পায়ের শব্দে থমকে গেল।

'আপনি যাবেন, না ঢিসুমঢুসুম ঘুষি চালাতে হবে?'

একটা মেয়ে লোকটার একেবারে পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বয়েস কুড়ি-একুশ। মাঝারি গড়ন। রং কালো। পরনে শালোয়ার-কামিজ।

আচমকা এক অবিশ্বাস্য বিস্ফোরণ। এক ঝাঁক চমকিত চোখ মেয়েটার দিকে ফিরল। লোকটা দেখল মেয়েটাকে। গাছ কিনতে এসে ক্রেতা যেভাবে গাছ দেখে, সেভাবেই অভ্যস্ত কায়দায় নিচে থেকে উপরে।

মেয়েটার আঁটোসাঁটো পোশাকের আড়ালে বশ না মানা দুটো স্তন যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত উঁচু হয়ে দেহগাঙে সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে। লোকটা পলকের জন্যে কেমন হড়কে গেল। সে 'আঃ' করে উঠল। ঠিক জায়গায় শিরশির করে উঠেছে।

লোকটার চাউনি এবং সেই সঙ্গে এই অস্ফুট ধ্বনি মেয়েটার কাছে অপমানকর ইভটিজিং বলে মনে হল। যেই মনে হল, অমনি সে মার্শাল আর্টের কৌশল অভিজ্ঞ হাতে প্রয়োগ করেই তাকে ধরাশায়ী করে দিল। একটু পরে লোকটা ধরাশায়ী বক্সারের মত উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। যখন তার প্রচেষ্টা বার দুয়েক ব্যর্থ হল সে বিড়বিড় করল, 'বিলিতি প্যাঁচ মেরেছে মাগী। দিশি প্যাঁচে আয় না—'

অসভ্য লোকের মুখ থেকে 'শা' 'বা' এর মত 'মাগী' শব্দটাও হামেশা বেরয়—তার নিজেরই অজান্তে। এ তার কান-সওয়া। কিন্তু এই মুহূর্তে তার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া ঐ শব্দটা তার কানে উত্তপ্ত তরল সীসে ঢেলে দিল। সে কথা শেষ করার আগেই মেয়েটা এবার একটা ভারী ঘুসি বাগিয়ে নিয়ে গেল লোকটার মুখের দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই

ভিড়ের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল একটা বউ। প্রায় মিনতির স্বরে বলে উঠল, 'না না, ওকে মের না।'

এতক্ষণের রুদ্ধশ্বাস নাটকের দর্শকেরা চমকে উঠল এই কথায়। এই ঘটনার জন্যে তারা তৈরি ছিল না। পিছন ফিরতেই দেখতে পেল উপবিষ্ট মাঝারি উচ্চতার একটা ফর্সা বউ বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে কয়েক কদম এগিয়েছে।

বউটার ওই মিনতির সঙ্গে এক আশ্চর্য আর্তি জড়িয়ে ছিল। সেই আর্তি কিংবা ঘটনার আকস্মিকতায় মেয়েটা থমকে গেল। এর মাঝেই বউটা লোকটার কাছে এসে হাত ধরে অপ্রসন্ন মুখে বলল, 'ওঠো। এখেনে মরতি এয়েচ কেন ?'

লোকটা কাত হয়ে পড়েছিল। চোখ আধবোজা। যন্ত্রণা কিংবা নেশার বুজগুড়িতে দু' দফা বিকৃত হয়েছিল মুখ। সে উঠে দাঁড়াল। মেয়েরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। কোন অস্বস্তি নেই। সে মেয়েটার দিকে তাকাল। দৃষ্টি কেমন কটকটে। মেয়েটা চোখ সরিয়ে একরাশ বিরক্তি নিয়ে সুন্দরীকে বলল, 'আপনার জন্যে এই সব ঝামেলা। যান, স্বামীকে নিয়ে বাড়ি যান।'

'হ্যাঁ, যাব।' সুন্দরী নির্বিকার গলায় বলল, 'তোমার নাম জবা না ?'

'হ্যাঁ,। আমাকে চেনেন ?'

'ওমা, চিনব না। এখন না হয় কলকতায় থাক। এই গাঁয়েরই তো মেয়ে। তোমার কাছে তো চম্পা কেরাটি শিখতেচে ?'

'কেরাটি নয়, ক্যারাটে। শুধু চম্পা নয়, অনেকেই।'

'আমাকে শিখাবা ?'

'নিশ্চয়ই। আমি তো চাইছি সব মেয়েই শিখতে আসুক।'

'চম্পা বলতিছিল ক্যারাটি শিখলি স্বামী আর মারতি সাহস পাবে না। সত্যি ?' বলেই সে ভয়ে ভয়ে স্বামীর দিকে তাকাল।

জবা বলতে যাচ্ছিল, যে সংসারে প্রায়ই খুনসুটি হয় সেই সংসারে শক্তির ভারসাম্যে শান্তি সুনিশ্চিত করা যায়। যেহেতু চম্পার কাছে কথাটার অর্থ বোধগম্য না-ও হতে পারে তাই সে কিছু বলল না।

সেই সময় লীনা কথা বলল। গলার স্বর বেশ গম্ভীর। শিখলেই জানতে পারবে। এখন যাও।

সুন্দরী লীনার দিকে এক পলক তাকাল এবং তার পরেই স্বামীর দিকে তাকাতে দেখল, তার দৃষ্টি মৌমাছি হয়ে জবার এ-স্তন থেকে ও-স্তনে মধু সংগ্রহে ব্যস্ত। বেশ অস্বস্তি হল তার। হঠাৎ রুক্ষ গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'আঃ মরণ !' বলে সে তার হাত ধরে জোরে টান দিয়ে বলল, 'এসো।'

তাদের যাওয়ার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে লীনা জবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'লোকটাকে মারা ঠিক হয়নি তোমার। ধমকটমক দিলে উনি চলে যেতেন।'

জবা যেন লজ্জিত হল, 'কোন পুরুষ আমার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালে মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'তুমি কি কলকাতায় পড়াশ্না করো ?'

জবা মাথা নাড়ল। 'ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়ছি।'

'ওহো। আমি তুমি বলছি বলে কিছু মনে করছ না তো ?'

'না না। আপনি আমাকে 'তুমি' বলবেন।'

ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে জিপের শব্দ ভেসে এল। শব্দটা ক্রমশ থেমে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দ্বার হর্ণ বাজল। লীনা সামান্য এগিয়ে এসে দরজায় দাঁড়াল। বি, ডি, ও,-র জিপ একটু দূরে দাঁড়িয়ে। ভিতরে জয়েণ্ট বি, ডি, ও,। তার ড্রাইভার আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে এদিকে।

লীনা সামান্য গলা তুলে সবাইকে শ্নিয়ে ছন্দাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ছন্দা, ওরা তো আছেন। আপনি মিটিং চালিয়ে যান। আমাকে বোধহয় এখন যেতে হবে।'

এক মুহূর্ত থেমে জবাকে বলল, 'জবা, তুমি শেষ পর্যন্ত থেকো।'

এই সময় ড্রাইভার এসে তাকে জানাল জয়েণ্ট বি ডি ও তার সঙ্গে দেখা করতে চান।

লীনা আর দাঁড়াল না। তৎক্ষণাৎ সে ড্রাইভারের সঙ্গে জিপের কাছে এল। সে কৌতুক চোখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে ইশারায় চুপ করতে বলল সুব্রত। তার খোঁজে এই পর্যন্ত এসেছে বলে হাসি-মস্করা করতে পারে। ড্রাইভার যা একটা চিজ, নিশ্চয়ই পাঁচ কান করবে। সে দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'আসুন।'

গাড়ি চলতে শুরু করার পর লীনা সুব্রতের দিকে মুখ ফেরাল। তার চোখ সামনে ! নিপাট ভদ্রলোকের মত কেমন উদাসীন, নিস্পৃহ। ভালবাসতে যাকে মন চায়, তার মনের খবর আঁচ করতে না পারলে, তারই নৈকট্যে অনেক সময় দ্বিধাদ্বন্দ্বে এমন হয়ে যায় মানুষ। ব্যাপারটা তেমন কিছু কিনা ভাবতে গিয়ে তার এক্সট্রা সেনসরি পারসেপসন ডবল হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত পরে সে মনে মনে হেসে সামনে রাস্তায় চোখ রাখল।

যখন চোলটুকারীর বাঁকে এসে গাড়ির গতি সামান্য কমিয়ে ড্রাইভার তাদের বাড়ির পথ ধরল, তখন সে বলে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

সুব্রত ওইভাবেই বলল, 'আপনাদের বাড়ি।'

সমিতির মিটিং থেকে হাইজ্যাক করলেন। আমি তো ভাবলাম কোন জরুরী কাজে এসেছেন। অফিসে যেতে হবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কেস খুব সিরিয়াস। দ্বিধাহীনভাবে বলল লীনা।

এবার সুব্রত লীনার দিকে তাকিয়ে হাসল, কিছু বলল না। ড্রাইভার এক পলক লীনার দিকে তাকিয়ে ফের সামনে চোখ রেখে বলল, দিদি, কেসটা সিরিয়াস করেছেন সাহেব। আপনাদের বাড়ি গেলাম অর্কবাবুর খোঁজ করতে। পেলাম না। কাজের মেয়েটা তাঁর সন্ধান দিতে পারল না। যখন চলে আসছি, মেয়েটা আপনার কথা বল্লে। তখন সাহেব আমাকে কি বললেন জানেন ? 'চলো, প্রধানকে ধরে আনি। কান টানলে মাথা আসবে।'

লীনা হালকা সুরে বলল, 'বোনকে টানলে দাদা চলে আসবে। এ তো পুলিশি কৌশল। তোমার সাহেবও তাহলে এ কৌশল জানেন।'

এই কথার কোন জবাব দিল না ড্রাইভার, এই সময় গেটের সামনে গাড়িটাকে দাঁড় করাল। প্রথমে লীনা নামল, বলল, 'আসুন।'

লীনা ভিতরে ঢুকে যাবার পর সুব্রত ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে ঢুকল। তারপর লীনাকে অনুসরণ করল। লীনা তার নিজের ঘরে গিয়ে সোফা দেখিয়ে বলল, 'বসুন। আমি চা করতে বলে আসি। ও হ্যাঁ, চা না কফি ?'

'চা। প্লিজ, নো আদার ফর্মালিটি।'

লীনা কিছু বলল না। মৃদু হেসে ভিতরে চলে গেল।

কেমন অদ্ভুত আলো-আঁধারি ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে সুব্রত গা-শিরশিরে এক ঘোরের মধ্যে পড়ল। এই ঝকঝকে তকতকে ঘর, ওই ছিমছাম ধবধবে বিছানা তো লীনার, যার দেহলতায় বাহারী ফুল ফুটেছে। গন্ধ ছড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে তিরিশটা বসন্ত একে একে অজান্তে তার জীবন থেকে ঝরে গেছে। অথচ এই গন্ধ এখনও তার অচেনা। সেই ঘোরের মধ্যেই ফিরে এল লীনা। তার মুখোমুখি বসে বলল, 'দাদাকে খুঁজছেন কেন ?'

সুব্রত তার দিকে তাকাল, দৃষ্টি স্থির। পরে বলল, 'প্রয়োজনটা ব্যক্তিগত। শুনতে চান ?'

'না, থাক। লীনা বলল, আপনার বিডিও সাহেবের খবর কি বলুন ?'

'বিডিও সাহেব তো সপ্তাখানেক আগে বদলি হয়ে গেছেন।'

'সেকি, এক বছরও হয়নি, এর মধ্যে বদলি ?'

'ডিপার্টমেণ্ট থেকে করেনি। উনি ধরা-করা করে অর্ডারটা বের করেছেন।'

'কেন, ভাল লাগছিল না এখানে ?'

প্রশ্নটা শোনা মাত্র সুব্রত হেসে ফেলল। লীনা জিজ্ঞাসা করল, হাসির কি হল ?'

'দেখুন, আপনার নারী-আন্দোলনে অনেকে ভীতসন্ত্রস্থ। বি ডি ও সাহেবের অবস্থা হয়েছিল ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি-র মত। বয়স চুয়াল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। নিঃসন্তান। স্ত্রী রাগী, জেদি। এর উপর যদি আপনার আন্দোলনের হাওয়া তার স্ত্রীর গায়ে লাগে তা'হলে…এই তাহলে-র ভূত তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। বদলি হয়ে বেঁচেছেন।'

শুনতে শুনতে লীনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা শব্দ, 'আশ্চর্য !'

'আশ্চর্য মানে ?'

'বুদ্ধিজীবীরও এই অবস্থা !'

'এ ব্যাপারে শ্রমজীবী আর বুদ্ধিজীবীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। স্ত্রীকে নিয়ে একটা ভীতি সব পুরুষের মনে থাকে। পরিস্থিতি সেটাকে ভয়াল করে।'

এই সময় দু' কাপ চা দিয়ে গেল মানদা। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আচমকা লীনা বলল, 'আপনিও নিশ্চয়ই ?'

প্রশ্ন, না জিজ্ঞাসা, ধরতে না পেরে লীনার চোখের দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্ত বোধ করল সুব্রত। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাবল, সে বিবাহিত কিনা হয়ত সেটা জানতে

একটু ঘুরিয়ে এ প্রশ্ন করেছে লীনা। তার মানে কি এরকমও হয় যে, তাকে লীনার ভাল লেগেছে? নাকি দাম্পত্য জীবনে পুরুষের ভূমিকা নিয়ে বিদ্রূপ করল শুধু! এভাবে ভাবতে ভাবতে সে বলল, 'কি করে বলব বলুন? এখনও তো বিয়েটাই করা হয়নি।'

লীনা হেসে বলল, 'তাহলে দুম করে একটা বিয়ে করে ফেলুন।'

'বিয়েটিয়ের মধ্যে আমি নেই।' লীনার মনোভাব স্পষ্ট জানতে যেন সহজভাবে ঘাড় নেড়ে কথা কটা উচ্চারণ করল সুব্রত।

লীনা হাসল, 'সেকি অমৃতে অরুচি?'

'ম্যারেজ ইজ আ পার্মানেণ্ট সিলি গেম। আমার একেবারেই পছন্দ নয়।'

লীনা কৌতুক করে সহজ গলায় বলল, 'ব্রহ্মচারী হবেন? নাঃ, মুক্ত জীবের কোন লক্ষণ দেখছি না আপনার মধ্যে।'

'বদ্ধজীবের লক্ষণ দেখছেন কি?' সুব্রতের গলায় পরিহাসের সুর!

'হ্যাঁ, প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রিপুর উদ্‌ভ্রান্ত চলাচল আপনার মুখের হাসিতে, চোখের চাউনিতে।

সুব্রত হা হা করে হেসে লীনার চোখে চোখ রাখতেই জানলার বাইরে তাকাল সে। চেনা জগৎ, নতুন কিছুই দেখল না। তখন দৃষ্টিটা আবার ফিরিয়ে আনল সুব্রতের মুখে, প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'আচ্ছা, আপনি কি কলকাতার ছেলে?' মানে কলকাতায় জন্মেছেন?

'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'আপনার উচ্চারণে কলকাতার আদি বাসিন্দাদের উচ্চারণরীতির বৈশিষ্ট্য। বড় একটা শুনি না এমন উচ্চারণ। ভারী মিষ্টি।

সুব্রত হেসে ফেলল, বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের পৈতৃক বাড়ি বাগবাজার; আমি ওখানেই জন্মেছি।'

'বাগবাজারে আমাদেরও বাড়ি আছে। দাদা সেই বাড়িতেই থাকে।'

'আমি জানি।'

সুব্রত ঘড়ি দেখল। বিকেল পাঁচটা। সে উঠে দাঁড়াল।

'অর্কবাবু তো এখনও এলেন না। কিন্তু আমি আর দেরি করতে পারছি না। আমাকে আবার অফিসে যেতে হবে।'

লীনা বলল, 'ব্যস্ত যখন বাধা দেব না।'

ওরা দুজনে বারান্দায় এল। এই সময় গেট দিয়ে ঢুকল অর্ক। সুব্রত প্রথমে দেখতে পেল, অর্কের অন্যমনস্ক মুখ। সে টেনে ধরল নিঃশ্বাসের রাশ এক মুহূর্ত। তারপর ফের ছেড়ে দিল তাকে। তখনই শুনল লীনা বলছে, 'ঐ তো দাদা এসেছে।'

ততক্ষণে অর্ক বারান্দায় উঠে তাদের দিকে তাকিয়েছে। লীনা কিছু বলার আগেই সুব্রত বলল, 'আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। একটু নিরিবিলিতে বলতে চাই।'

'আপনি ?' অর্কের চোখ স্থির হল সুব্রতের মুখে।

লীনা বলল, 'ইনি হাসনাবাদ ব্লকের জয়েণ্ট বিডিও।'

তার সঙ্গে সঙ্গেই সুব্রত বলল, 'আমার নাম সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। নন্দিতা চট্টোপাধ্যায় আমার মা।'

অর্ক একটু চমকে উঠল যেন, অস্ফুট গলায় বলল, 'ও, এবার বুঝেছি। আসুন।'

॥ সাত ॥

অর্কের ঘরে বসে সুব্রতের দ্বিতীয়বার মনে হল এই অর্ক তার মায়ের সেই ভদ্র যুবক যে তাদের বাড়িতে ঘর নিয়েছে। প্রথমবার মনে হয়েছিল একটু আগে, প্রথম দর্শনে, যদিও সে জানে এই অর্ক পারমিতার স্বামী। ব্যাঙ্কের বড় অফিসার। এখন বাগবাজারের মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে অতি পরিচিত, অবশ্য কদর্থে।

মায়ের চিঠি পেয়ে তার কেমন ধন্দ লাগে, পারমিতার স্বামী কি ঘরভাড়া নিয়েছে? মেসে থাকত, হঠাৎ মেসটা উঠে যাওয়ায় বিপদে পড়ে তাঁর দ্বারস্থ এই সব কত কি মাকে বলেছে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, অথচ সেই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে খোঁজখবর নিতে এসেছে সে।

অর্ক এখনও বসেনি। সুব্রতকে বসতে বলে নিচে গিয়েছিল হাতমুখ ধুতে। সবে ফিরেছে। সে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সুব্রতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সিগারেট ?'

সুব্রত অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়ল, 'নো, থ্যাংকস্।'

অর্ক তার মুখোমুখি চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল, 'কতক্ষণ এসেছেন ?'

ঝপ করে লোডশেডিং হল। ফ্যান শক্তি হারিয়ে গতিহীন হচ্ছে ক্রমশ, এক পলক দেখে সুব্রত বলল, 'প্রায় এক ঘণ্টা।'

সিগারেটের ধোঁয়ায় এক মুহূর্ত ঢাকা পড়েছিল তার মুখ। হাত দিয়ে ধোঁয়া তাড়িয়ে সে ভাবল, সুব্রত কি এতক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করছে? যদি তা-ই হয়, তাহলে সুব্রতের মা তার সম্পর্কে নিশ্চয়ই লোকের মুখরোচক আলোচনা শুনেছেন। আর হয়ত তার সত্যমিথ্যা যাচাই করতে সুব্রতকে পাঠিয়েছেন। সে কি মিথ্যেবাদী হয়ে গেল? কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হল, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ তো রয়েছেই। আর তখনই সে বলল, 'বলুন, কি দরকার ?'

সুব্রত প্রথমেই প্রশ্ন করে বসল, 'আপনি কি 'নন্দিতা ভিলা'য় ঘর ভাড়া নিয়েছেন ?'

'নন্দিতা ভিলা' তাদের বাড়ির নাম। অর্ক ইতস্তত করল না, বলল, 'হ্যাঁ।'

'আমার মায়ের সঙ্গে মিথ্যে কথা বলেছেন কেন ?'

'মানুষের কলকাতায় মানুষের মত সত্যি কথা বললে কি ঘর পেতাম ?'

সুব্রত একটু ভেবে বলল, 'হুঁ, এখন বুঝতে পারছি আর্জেণ্ট নিড্ ছিল। কি ব্যাপার? আপনাদের তো বাগবাজারে বাড়ি আছে!'

একমুহূর্ত ভাবল অর্ক। ব্যাপারটা ব্যক্তিগত হলেও এখন আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেই। নিজের সম্মান, আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে পারিবারিক কাসুন্দি ঘাঁটতে হবে কিছুটা। সে বলল, 'এক ছাদের তলায় থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না।'

সুব্রত গলার স্বরে দ্বিধা লুকোবার কোনরকম চেষ্টা না করেই বলল, 'তাহলে লোকে যা বলছে তা সত্যি?'

সিগারেটের অবশিষ্ট জ্বলন্ত টুকরোটুকু অ্যাসট্রেতে গুঁজে মৃদু অস্বস্তির স্বরে অর্ক বলল, 'জানি না। পারমিতা আউট অব কণ্ট্রোল। কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না। বরং অর্থপূর্ণ হাসিতে নিঃশ্বাসহীন করে দেয় বুক।'

সুব্রত বিরক্ত হল, 'আশ্চর্য, প্রশ্নের জবাব না দিলেই কি কেউ আউট অব কণ্ট্রোল হয়ে যায়। উনি উচ্চশিক্ষিতা। আত্মসচেতন। দেখুন, হয়ত আপনার প্রশ্নের ধরনে আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে।'

'আত্মসম্মান! সেটা কি ওর আছে? থাকলে এমন লোক হাসাহাসির কাজ করতে পারত?'

সুব্রত দরজা দিয়ে দূরের আকাশ পানে তাকাল। এক চিলতে দৃশ্যমান আকাশে এক খণ্ড ধূসর মেঘ যেন ফসফরাস খচিত শ্বেতশুভ্র ফেনিল মুকুট পরেছে শিরে। সেই দৃশ্য উপভোগ করতে করতেই বলল, 'আমার মনে হয় উনি মিসগাইডেড।'

'মানে?'

সুব্রত অর্কের চোখে তাকাল, 'এক ধরনের নারীবাদী ভাবেন, ক্ষেত্রজ সন্তানের টাইমবোমা দিয়ে স্বামীর বংশক্রমকে ব্যাহত করে পুরুষশাসিত সমাজের কংক্রিট ভিতে ফাটল ধরান যায়। কিংবা লিভিং টুগেদারে পুরনো রীতিনীতি ভেঙে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটান যায়। এ সব ভুল ভাবনা। এই ভাবনায় বোধহয় উনি পরিচালিত হয়েছেন।'

চোখে যেন জল এল অর্কের। পারমিতা ভুল করেছে কিনা সে জানে না। তবে সে যে ভুল করেছে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। নারীবাদের যে মন্ত্রে পারমিতা দীক্ষিত সেই মন্ত্রকে ঘোর সংসারীর কানে গুরুর ব্রহ্মজ্ঞান ভেবে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিল। শনির দশা ছাড়া কেউ একথা ভাবে। হায়রে ভাগ্য!

সে খানিকক্ষণ মুখ নিচু করে রইল। তারপর মুখ তুলল। তার মাথার ভিতর ভীমরুলের মত বোঁ বোঁ করে ঘুরে বেড়ানো কষ্টের বিন্দুমাত্র প্রতিফলন নেই চোখে। সব কষ্ট এক লহমায় যেন কমিয়ে দিয়েছে আত্মসমালোচনার মোক্ষম দাওয়াই।

'নারী আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা সবাই নূতন। অভিজ্ঞতা কম। সামান্য ভুলভ্রান্তি তো হবেই।'

অর্ক নিরুত্তর।

'ছ'হাজার বছর ধরে নারীকে বশে রাখতে পুরুষ বংশক্রমের যে মায়াজাল পেতেছে সেই জালে বোধহয় সে এবার মাকড়সার মত আটকে পড়ছে।'

এই কথা শুনে অর্কের ভুরু কুঁচকে গেল। তার ট্রাডিশনাল বাঙালি মূল্যবোধ খোঁচা খেয়েছে। সে বলল, 'কি বলছেন আপনি?'

'এই সমাজে পুত্র বংশ রক্ষা করতে পারে, কন্যা পারে না। সন্তান না থাকা আর কেবল কন্যাসন্তান থাকা এক কথা। এ এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মধ্যে কন্যাসন্তানের পিতৃকুল ফসিল হয়ে যাচ্ছে। ঘুম ভাঙলে মেয়েরা এই বৈষম্য মেনে নেবে? বিদ্রোহ করবে না? চারদিকে তাকান, দেখুন, মেয়েদের অবস্থা। যে পুরুষকে বিশ্বাস করছে, অবলম্বন করে বাঁচতে চাইছে, সেই মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। কোন দেশে সামাজিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা তা দেখার যদি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা থাকত তাহলে ভারত নিশ্চয়ই অভিযুক্ত হত। বেঁচে গেছে পোড়া দেশটা। উঃ, কি অত্যাচার। সতীসাধ্বী সীতাকে দু-দুবার অগ্নিশুদ্ধি করে ছেড়েছে রাম।'

অর্ক শুনছে আর চমকে চমকে উঠছে। কে বলবে এই পুরুষসিংহ, প্যান্টকোট আর শক্তপোক্ত চওড়া বুকের আড়ালে নারীদরদী রামমোহন ঘাপটি মেরে আছেন। সুব্রত নির্ঘাৎ নারীবাদের সমর্থক।

অর্ক হাসি চেপে বলল, 'এবার রামচন্দ্রকে নিয়ে পড়বেন নাকি?'

সুব্রত বুঝি অর্কের ভিন্ন সুর টের পেল। তার চোখের আয়না মরা মাছের মত ঘোলাটে হল একমুহূর্ত। তারপর বলল, 'যে ধর্মের ভগবান স্ত্রীকে শ্রদ্ধা বা সমীহ করে না, সেই ধর্মের মানুষ করবে কেন? বাল্মীকির রামায়ণে আছে, রাবণ বধের পর সীতা রামচন্দ্রের কাছে এলে তিনি সকলের সামনে সীতাকে বলেছিলেন, 'তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হইয়াছে, নেত্ররোগীর সম্মুখে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ কষ্টকর। তুমি রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হইয়াছ। সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখিয়াছে। এখন যদি আমি তোমাকে পুনর্গ্রহণ করি, তবে কী করিয়া নিজের মহৎ বংশের পরিচয় দিব?' রাম আরও বলেছিলেন, 'তুমি জানিও এই রণপরিশ্রম—সুহৃদগণের বাহুবলে যাহা হইতে মুক্ত হইয়াছি—ইহা তোমার জন্য করা হয় নাই। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করিবার জন্যই এই কার্য করিয়াছি।' এভাবে রাম শুধু সীতাকে অপমান করেননি, অপমান করেছেন সমগ্র নারীজাতিকে।

'রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম।' এভাবে তাকে জাস্টিফাই করা যায় না।'

সুব্রত খিলখিল করে হাসল, 'পুরুষোত্তম। তা পুরুষোত্তম কি জানতেন না যে সীতা নিষ্পাপ?'

'পুরুষোত্তম সর্বজ্ঞ। নিশ্চয়ই জানতেন। কিন্তু প্রজারা বিশ্বাস করবে কেন?'

'কৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বোঝাতে 'গীতা' সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি কোন দার্শনিক গ্রন্থ রামচন্দ্র প্রজাদের বোঝাতে তো সৃষ্টি করতে পারতেন। আসলে সীতা নারী। অধিকার-বোধের উৎস যেখানে ভালবাসা, সেখানে নারী পুরুষের কাছ থেকে কিছুটা সামাজিক সম্মান পায়। কিন্তু সেই উৎস যেখানে সামাজিক অনুশাসন, সেখানে পুরুষ নারীকে সম্মান দেখাতে যাবে কোন দুঃখে!'

অর্ক এই কথার প্রেক্ষাপটে পারমিতার ভাঁজটানা মুখ আর বিচিত্র হাসিভরা চোখ দেখতে পেল। শুনতে পেল শুভ্রের আধো আধো বোলে 'বাবা' ডাক আর আদুরে কাঁদুনি। বিকেলে দেয়ালার মধ্যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শুভ্রের। জানলা গলে মিয়নো রোদ তার মুখে এক অলৌকিক আলোকবৃত্ত রচনা করেছিল। কি অপূর্ব। যেন স্বর্গীয় দৃশ্য। সে মুগ্ধ, বিমোহিত। তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে গিয়েই থমকে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে তার মনকে পীড়া দিয়েছিল স্ক্যান্ডাল মংগারের উড়ো কণ্ঠস্বর, অর্কবাবু ইমপোটেন্ট। যেন মস্তবড় এক থাপ্পড়। লাল হয়ে উঠেছিল গাল। ফের শুইয়ে দিয়ে গুম হয়ে বসেছিল কিছুক্ষণ। তারপর পারমিতা ঘরে ঢুকতেই বলেছিল, লোকে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। যখনই জিজ্ঞাসা করি, চুপ করে থাক। সত্যি করে বল তো শুভ্র কি আমার ছেলে?'

পারমিতা অর্কের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর আলনা থেকে একটা আটপৌরে শাড়ি নিয়ে, বেরিয়ে যাবার সময় সে কথার জবাবে না গিয়ে নিজের মনেই বলে গেল, 'কান পাতাপাতিই বা কেন? একটু উদাসীন থাকলে তো হয়।'

অর্কের মনের ভাঁজে এই জবাব এড়িয়ে যাবার ব্যাপারটা একটা হারানো কথাকে টেনে আনল। মনে পড়ে গেল তার এক সহকর্মী অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে অন্য এক সহকর্মীকে বলেছিল, অর্কবাবুর ছেলে কিন্তু অর্কবাবুর মত দেখতে হয়নি। সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল স্কটল্যান্ডের একটা প্রচলিত কথা। বাবার সঙ্গে ছেলের চেহারার মিল না থাকলে লোকে রসিকতা করে বলে, 'Hey! What's the matter? You don't look like your father. Ask your mother.' মনে হলেও সে বিচলিত হয়নি। কেননা সে জানে বাবার সঙ্গে সব ছেলের চেহারার মিল থাকে না।

যে-অর্ক ছেলে পেয়ে খুশির বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল এই সব দিন-রাত্রির নিষ্কণ্টক পথ বেয়ে এক রঙিন স্বপ্নলোকে তারই মনের আকাশ লোকের অবিরত গা-জ্বালানো কথা আর মিচকে হাসিতে ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল। ঝড় উঠেছিল। সেই ঝড়ে বিধ্বস্ত হতে হতে বারকয়েক একই প্রশ্নবাণ ছুঁড়েছিল পারমিতার দিকে, কখনও হালকা চালে, কখনওবা বুকচাপা যন্ত্রণার অনুভূতি নিয়ে। পারমিতা তাকিয়েছিল। মুখ অনেকটা ছাইচাপা আগুনের মত। হঠাৎ পারমিতার মুখের চেহারা বদলে গিয়েছিল। ফুটে উঠেছিল হাসি। বিচিত্র হাসি।

নারীবাদী সান্নিধ্যের উষ্ণতায় গা পুড়ে যায় এ কথা না-জানা সুব্রত নারী-আন্দোলন কথাটার আড়াল নিয়ে বিরাট একটা উদার মনের পরিচয় দিল—এই আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে চায়, তুলুক। কিন্তু, অর্ক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছে না। স্ত্রী স্বাধীনতার অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধে তার গা গুলিয়ে উঠছে। যেহেতু সে সনাতন মূল্যবোধের ধারক ও বাহক, নারী-স্বাধীনতা নিয়ে তার কোন নস্টালজিয়া নেই।

অর্কের ভিতরে পৌরুষের নীরব অহংকার। সে কি ভাবে নারীই তাকে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে, গভীর মমতায় আগলে রেখে পুরুষ হতে সাহায্য করেছে?

মায়ের জাত হলেও স্ত্রী সম্পর্কে ছোট, স্বামীর কাছে সমীহ পায় না। বরং পায়

তিরস্কার, অবজ্ঞা। এমন কি, চড়চাপড়। এই আত্মাভিমান হিমোফিলিয়া রোগের মত বংশগত হয়ে যায়। এভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নারী হচ্ছে সেবাদাসী। সৃষ্টি হয়েছে এক জটিল সমস্যা। নারী যত্র-তত্র, যখন-তখন ধর্ষিতা হচ্ছে।

হচ্ছে, হোক। জগৎসংসার তো ঠিকই আছে, চলছে। একজন মেয়ের যাই হোক না কেন, বহু মেয়ের তাতে কিছু যায় আসে না। এই উদাসীনতার সুযোগ নিয়েছে পুরুষ। মেয়েরা এখন রীতিমত কোণঠাসা।

অর্ক চুপচাপ, অন্যমনস্ক। মুখ সামনে একটু ঝুঁকে পড়েছে। সুব্রত বলল, 'কি হল? কি ভাবছেন?'

অর্ক সুব্রতের মুখের দিকে তাকাল। বলল, 'অনুশাসন আছে বলেই এখনও বিবাহবন্ধন টিকে আছে। অনুশাসন ছাড়া কোন ভাব, কোন ক্রিয়া স্থায়ী হয় না। মুক্ত বিবাহের অনুশাসন মানিনি বলে তো আমার এই দশা।'

'মুক্ত বিবাহ সম্পর্কে আমি খুব কমই জানি। শুনেছি নারীবাদীরা 'এক দম্পতি এক সন্তান' নীতি গ্রহণ করতে মেয়েদের যেমন উৎসাহ দিচ্ছে, তেমনি এ বিয়েতেও। এই বিয়ের ভিতর দিয়ে নাকি সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক নারীমুক্তি সম্ভব।'

'নারীমুক্তি মানে তো পুরুষের মরণ। হ্যাঁ, তা সম্ভব।' এই অর্কের গলায় অন্য এক অর্ক যেন কথা বলল।

এতক্ষণে সুব্রত যেন অর্কের ভিতরটা দেখতে পেল। কি দেখল সে?

সে দেখল, তার ভিতরে মানুষের প্রতি অবিশ্বাসের হিমবাহ গড়িয়ে চলেছে। সেই ঘর্ষণে বিশ্বাসের শক্ত মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

হতাশার অন্ধকারে বিশ্বাস হারিয়ে গেলে জীবনের চার্ম থাকে না, অর্থহীন হয়ে যায় জীবন। এই অবস্থায় মানুষ কখনও-সখনও আত্মহত্যা করে। অবশ্য এই বিশ্বাস ফিরে আসে সময়ের হাত ধরে, নিজের অজান্তেই।

কেন যেন সুব্রতের ভিতরটা এতে নড়ে উঠল একটু। সে বলল, 'আপনার কিসের ভয়? আপনি আমাদের বাড়ি আছেন, থাকবেন। হোটেলে না খেয়ে বাড়িতে খাবেন, যদ্দিন এ ধারণা না বদলায়, তদ্দিন।'

অর্ক যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। সে বিস্মিত দৃষ্টি ফেলল সুব্রতের মুখে। সুব্রত হাসছে।

॥ আট ॥

অর্কের চোখে তখনও বিস্ময়ের আলো—সামান্য। তেমনই বসে আছে সে। ইতিমধ্যে কখন যেন ঝপ করে ফ্যান চলতে শুরু করেছে। অন্ধকার কালো ডানা মেলেছে ঘরের ভিতর। এবার সে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। আলো জ্বলে উঠতেই তার মনে হল এভাবে সুব্রত হঠাৎই আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, একেবারে, তার অন্ধকার মনের

কোণে। অর্কের জীবনে এই ঘটনা নতুন, কেউ কখনও এভাবে আলো জ্বালিয়ে দেয়নি। সে নিচে নেমে এল।

লীনাকে বলল, সবটা নয়, নারীবাদী সুব্রতর কাহিনী। শুনে ঠোঁটে একটু হাসি ফুটল। কিছু বলল না।

বলল পঞ্চায়েত অফিসে, পরদিন, কল্পনাকে।

'জানো তো, সুব্রতবাবু নারীবাদী ?'

কোন পুরুষ নারীবাদী শুনলে কল্পনা আগে অবাক হত, এখন আর হয় না। তার মনে হয় পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি সরল। পুরুষ যত তাড়াতাড়ি বোঝে নারী তত তাড়াতাড়ি অবুঝ হয়। ফলে নারী-আন্দোলন এক-পা এগোচ্ছে তো দু-পা পিছোচ্ছে।

এখন অফিসে চৌকিদার-দফাদার নেই। সচিব মুখ হেঁট করে কাজে ব্যস্ত। কিন্তু অরিতের চোখ দুটো এক আশ্চর্য রহস্যে মগ্ন হয়ে আছে লীনার মুখে। সেখানে বুঝি কিছু প্রেমও চলছে। সে জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল, অরিতের এই অবস্থা দেখে মুখ টিপে হাসল, একটু হেঁট হল লীনার দিকে। তারপর প্রায় গুনগুনানির সুরে বলল, 'দিদি, উপপ্রধান যে মরেছে, একেবারে, তোমার রূপসাগরে ডুবে।'

এই কথা শনে লীনা অরিতের দিকে তাকাল। তার চোখে যৌবনের বুনো আহ্বান। লীনার বুকে অস্বস্তির খচখচানি। এ কি রে বাবা, তার সঙ্গে হৃদয়ঘটিত কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, অথচ, কি ঝাঁঝালো, দ্বিধাহীন আর প্রত্যক্ষ চাউনি। একি অরিতের নিছক পাগলামি, না অন্য কিছু ?

লীনার এই তাকানোয় ভালো লাগা থাক কি মন্দ লাগা থাক, অরিতের মনে হল সে চাউনিতে হৃদয়ের উষ্ণতা রয়েছে। সে গভীর চোখে তাকিয়ে থাকল। বিব্রতভাব কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই লীনার মনে হল এখন অরিতের চোখে একজন সখের প্রেমিক ভর করেছে। এই অরিতের সঙ্গে অন্যদিনের অরিতের কোন মিল নেই। অথচ দুটো অরিতই সত্য। তাহলে পুরুষমাত্র কি অরিত ?

এই কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সুব্রতের মুখখানা। গত রাতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে যেতেই সে স্বপ্নে দেখেছিল, ছায়াপথের মত একটা চন্দনজোছনা পথে সে সুব্রতের হাত ধরে, পাশাপাশি, একই তালে, একই ছন্দে, এগিয়ে চলেছে এক উজ্জ্বল প্রভাতের দিশায়—যেখানে ভ্রান্ত চেতনার ধূম্রজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে নারী-পুরুষ, গড়ে তুলেছে এক সুস্থ সবল সুন্দর সমাজ।

সে মনে মনে লজ্জিত হল। দূর, সে এ সব কি ভাবছে ! মানুষ কি কখনও স্বভাবে এক হয় না হতে পারে ! সে মুখ ঘুরাল। এই সময় দেখল, একজন লোক তার সামনে, টেবিলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে।

'কিছু বলবেন ?'

লোকটা অভিযোগ করে বলল, 'লোনের ফর্ম নেবার জন্যি সেই কখন থেকে বসে আচি। সচিববাবু বসতি বলে চা খাতি গেলেন। বলি আমাদের কি সময়ের দাম নেই ?'

তিনজন লোককে পাশের ঘরে যেতে দেখেছিল লীনা। সে তো প্রায় আধঘণ্টা হল। পাঁচ মিনিটের কাজ। অথচ, এখনও লোকগুলোকে অকারণ বসিয়ে রাখা হয়েছে। শুধু এই কারণে সরকারী অফিসগুলোর কাজকর্মে লোকে বিরক্ত। পঞ্চায়েত তো গ্রামীণ লোকের মা-বাপ। সেই পঞ্চায়েতে যদি কাজকর্মের এই হাল হয় তাহলে মানুষ যাবে কোথায়! ঈষৎ অসন্তোষ নিয়ে সে ফর্ম দিতে উঠে যাচ্ছিল, কল্পনা বাধা দিল, 'ফর্ম দিতে যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ, দিয়ে আসি। ওঁরা অনেকক্ষণ বসে আসেন।'

'তুমি যাবে কেন? আমি যাচ্ছি। কল্পনা লোকটাকে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

লীনার রূপের সাগরে অনেকক্ষণ ডুবে থেকে হাঁসফাস করছে অরিত। সামান্য প্রাণ-বায়ু পাচ্ছে না যেন। হঠাৎ মাথা তুলে একবুক বাতাস টেনে নিল সে। এখন তার চোখের ফাঁদে টলটল করে উঠল বিরক্তির ছায়া।

'চৌকিদার-দফাদার হয়েছে যেমন, তেমনি সচিব। পাঁজিপুঁথি দেখে কাজ করে। একটু কড়কে দিন।'

অরিতের কথা শুনে লীনা বুঝল সখের প্রেমিক আপাতত মরেছে। যাক, বাঁচা গেল। একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে মনে মনে বলল সে। পরমুহূর্তে অবশ্য ভিতরে ভিতরে গুটিয়ে গেল। পুরুষ মানুষ। একে নারীর সৌন্দর্য দেখার অবাধ সামাজিক অধিকার, তায় লজ্জার চাষবাস নেই। রসাপ্লুত হলে আবার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাবে।'

পুরুষ চরিত্রের গণ্ডূষজলে সবরীর মত চলতে চলতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল লীনা। আর তখনই ঘরে ঢুকল জবা। এক নিশ্বাসে বলল, 'দিদি, আজ আমার ক্যারাটে শিক্ষণ কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি উৎসব। আপনাকে সভানেত্রী করব বলে মনস্থ করেছি।'

লীনা তাকাল ওর দিকে। জবা বলল, 'বেশি সময় আটকে রাখব না। উদ্বোধন করেই চলে আসবেন। কি, ব্যস্ত আছেন?'

লীনা হাসল, 'ব্যস্ত হবার আর চান্স দিচ্ছ কই ভাই?'

'তাহলে চটপট উঠে পড়ুন।'

জবার এই অলক্ষ্মী চাঞ্চল্য কৌতুকের চোখে কল্পনা দেখছে। অরিত দেখছে তার চোখ, নাক, ঠোঁট, চিবুক, গলা—গলা থেকে বুক—বুক থেকে নাভিমূল—যতটুকু দেখা যায় চোখে। বাকিটুকু কল্পনায়। সে ভাবছে, মেয়েটার পুরুষালী চেহারা, কিন্তু বাঁধুনি নিরেট। যে কোন পুরুষকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারে। এই ভাবনার মধ্যেই লীনার সঙ্গে জবার সৌন্দর্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণও করে ফেলল। লীনা ফর্সা। সুন্দরী। মুখে এমন একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য যা চোখকে আরাম দেয়। জবা কালো। সুন্দরী। মুখে এমন একটা চটকদার আকর্ষণ যা ভিতরে উত্তেজনা জাগায়।

বেরিয়ে যাবার সময় জবা একবার তাকাল অরিতের দিকে। চোখাচোখি হল। ভাগ্যিস অরিতের মনের ভাষা পড়তে পারেনি জবা, তাই রক্ষে।

অরিতের এই কলির কেষ্টমার্কা চাউনি লীনা দেখেছে কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু কল্পনা যে দেখেছে, কোন এক মুহূর্তে, সেটা তার কথায় স্পষ্ট হল।

'মেয়ে দেখলেই দামড়া হয়ে যান। জোয়াল কাঁধে নিয়ে চাষ করতে ইচ্ছে করে, জো থাক বা না থাক। স্বভাব বদলান। নইলে বিপদে পড়বেন।'

'হোয়াট !' বাজপাখির গলায় চেঁচিয়ে উঠল অরিত, রক্ত ঠিকরে বেরুল গনগনে চোখে। চৌকিদার কোথায় ছিল কে জানে। সে ছুটে এল। কেমন ভড়কে গিয়ে অরিতের দিকে তাকাল, তারপর কল্পনার দিকে। দুজনের মুখের চেহারা একই। কতকটা অপরাহ্নের আলোর মত ছায়াময়। দু' মুহূর্ত পরে অরিতকেই জিজ্ঞাসা করল, 'অত জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন কেন ? কি হয়েচে ?'

কল্পনা এক পলক চৌকিদারের দিকে তাকাল। তারপর ব্যাগ গুছিয়ে বেরোবার জন্যে তৈরি হল।

'কিছু হয়নি, তুমি যাও।' অরিতের কণ্ঠস্বরে হুকুমের কাঠিন্য।

চৌকিদার মনে মনে বলল, 'শালা, ঝাল ঝাড়তিচে।'

সে ঝড়াক করে বেরিয়ে গেল। চলে যাবার সময় কল্পনা বিচিত্র সুরে বলল, 'এ একটা ব্যামো। টাইমলি বিয়ে করলে হয়। মেয়েগুলো এক একটা অপদার্থ। ভালবেসে আপনার বউ হতেও পারে না।'

অরিত গুম মেরে গেল। তার ভাগ্যটাই খারাপ। সে না হয় একটু মেয়ে পাগল, তাই বলে এই হেনস্তা ! নাঃ, আর কোন কথা নয়। দুনিয়া গোল্লায় যায় যাক, তার চরিত্র বজায় থাক।

লীনাদের বাড়ির রাস্তার উপরে মোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ের উল্টোদিকের গলির ভিতর একটা বাঁক পেরোলে ডানদিকে নূতন বাড়ি। একতলা। জবাদেরই। তবে বসতবাড়ি নয়। তার প্রশস্ত ঘরে সে ক্যারাটে শেখায়। এখানে অনুষ্ঠান হচ্ছে। লীনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করল। এরপর বিবাহিতা মহিলাদের একটা ডিসপ্লে দেখে যখন সে বেরিয়ে এল, বেলা খানিক টাল খেয়েছে আকাশে। রোদের তাত চিড়বিড়ে নয়, মৃদুমন্দ বাতাসে কেমন নরম। আপাতত তার দৃষ্টি সামনে, কিন্তু মনটা পড়ে আছে মার্শাল আর্টের অদ্ভুত ক্রিয়াকৌশলের মধ্যে। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে।

একটু দূরেই আমলানী মোড়। কোন মানুষজন চোখে পড়ছে না। দোকানগুলো খোলা কি বন্ধ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। তিনখানা ভ্যানরিক্সা উদোম গায়ে যে রোদ মাখছে সেটা স্পষ্ট।

আরও মিনিটখানেক পেরিয়েছে, পিছন দিক থেকে একটা ভ্যানরিক্সা প'ক করে একবার বায়ুহর্ন বাজিয়ে তার পাশে থেমে পড়ল। লীনা তাকাল। গাড়িতে একজন চেনা মানুষ। রামসুন্দর।

রামসুন্দরের হাঁটাচলা হাবভাব দেখলে লীনার ভুরু কুঁচকে যায়। সে রামসুন্দরের

সঙ্গে অকারণে কথা বলে না। একটু থমকে দাঁড়ালেও এবার সে হাঁটতে শুরু করল।

'ও দিদিভাই, কি হল? চলে যাচ্ছ কেন?'

লীনা আবার দাঁড়াল। এবং রামসুন্দরের কাছে এল।

'কিছু বলবেন?'

'বলার আর চান্স দিচ্ছ কই?'

'বলুন। একটু তাড়াতাড়ি। আমাকে অফিসে যেতে হবে।'

'ব্যস্ত হলে তো হবে না ভাই। তোমাকে যে যেতে হবে আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'হাসনাবাদ।'

'কেন?'

'তোমাকে একজন দেখতে চেয়েছেন।'

লীনা অবাক, 'আমাকে দেখতে চেয়েছেন। কে?'

'আরে বাবা, এসোই না। গেলে দেখতে পাবে।'

হাসনাবাদ কাছেই। মাঝে মধ্যে যেতে হয় লীনাকে। কখনও মার্কেটিং-এ, কখনও বা অন্য কাজে। সেখানে যাওয়া বাথরুমে যাওয়ার মত কোন ব্যাপারই নয়। চিন্তা রামসুন্দরকে নিয়ে। যা একখানা চিজ। এখনও অক্ষম যৌবনকে সক্ষম করতে চান।

সে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। অবশ্য তা আপাতত চেপে, যতটা সম্ভব সহজ হওয়া যায়, হয়ে; সে ভ্যানরিক্সায় উঠে বসল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ভ্যানরিক্সা একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। পুরনো। একতলা। সদ্য কলি ফেরান হয়েছে।

দরজা খোলা। রামসুন্দর আগে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

লীনা বারান্দায় ওঠার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। এই ঝকঝকে আলোর মধ্যেও তার মনে হল কি যেন এক গভীর, রহস্যময় অন্ধকার ঘরের মধ্যে ওত পেতে আছে। সঙ্গে সঙ্গেই তার পা দুটো ভারী হয়ে উঠল।

ভিতর থেকে রামসুন্দর ডাক দিলেন, 'কই ভিতরে এস।'

ভয়ে এক পা এক পা করে ভিতরে ঢুকল লীনা। খাটের উপর শুয়ে আছেন গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা একজন বৃদ্ধা। চুল কাশফুল সাদা। চোখদুটো খোঁদলে, বোজা। মুখ কেমন ফ্যাকাসে, রক্তহীন।

হঠাৎ লীনার কি যেন হল। মনটা কেমন আপনিই বিষণ্ণ হয়ে গেল। অত্যন্ত শান্ত গলায়, কতকটা নিজের মনেই প্রশ্ন করল, 'ইনি, কি আমাকে দেখতে চেয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' রামসুন্দর একখানা বেতের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসো।'

লীনা বসার পর রামসুন্দর খাটের কোণে বসে ডাক দিলেন, 'বিজলী!'

পিছনের বারান্দা থেকে ভিতরে এল বিজলী।

'কি বলছ?'

'দিদাকে দুপুরের ওষুধটা দিয়েছ ?'

'হ্যাঁ। আজ কি যেন হয়েছে দিদার। খায়নি। প্রায় সবটাই কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে।'

'এত বড় মেয়ে, এখনও কিভাবে রোগীকে ওষুধ খাওয়াতে হয় তাও জান না।'

'আহা, সব জান কেবল তুমি।' পাকা গিন্নীর মত অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে পাশের ঘরে চলে গেল বিজলী।

বিজলীর এতক্ষণের সুরেলা আওয়াজ এবার যথার্থই বেসুরো বাজল লীনার কানে। এই বেসুরের পিছনে জীবনের কোন বুনো সুর বেজে চলেছে কিনা তা ভাবতে খুব অস্বস্তিবোধ করল। সে তাকাল বৃদ্ধার মুখের দিকে। কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর তার কেন যেন মনে হল এই গোল-ছাঁদের মুখখানা কোথাও দেখেছে। হয়ত এই বৃদ্ধাই তার চোখে পড়েছে পথেঘাটে কোথাও। কিংবা কারও মুখের আড়ায়ও দেখে থাকতে পারে। কে এই বৃদ্ধা ? কেনই বা তাকে দেখতে চেয়েছেন ?

মগজে চক্কর দিয়ে ওঠা এ প্রশ্ন সে এখন, এই মুহূর্তে, রামসুন্দরকে করবে কি করবে না এমন যখন ভাবছে, মনে পড়ে গেল কল্পনার কথা। জানো, রামসুন্দরের একজন রক্ষিতা আছে। তখন ওঁর বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশ। হঠাৎ কি যেন হয়ে বউটা মরে গিয়েছিল। ছেলেমেয়ে নেই। অনায়াসে বিয়ে করতে পারত। কেন যেন করল না। মেয়েমানুষের বুকের ঘ্রাণ একবার যে পুরুষ পেয়েছে সে কি এই বয়েসে বেশিদিন উপোসী থাকতে পারে! একদিন এক সুন্দরী কুলত্যাগিনীর সঙ্গে লটকে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত সে মনের এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল। বলল, 'ইনি কে ? আপনার রক্ষিতা ?'

রামসুন্দর যেন কুমারীর সন্তান হওয়ার মত কোন ঘটনা শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জিভ কাটলেন, 'ছি ছি, এ কথা শোনাও পাপ। ইনি জমিদার দীননাথ চৌধুরীর স্ত্রী। অলকেন্দুর মা। ঈশ্বরই ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এই এত বছর ধরে ওঁকে আমি শুধু প্রেম দিয়েছি। স্বামীজি বলেছেন না জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

এই কথা শুনে অর্কের কথা মনে পড়ল লীনার। এই ভয়টাই সে করেছিল। নিভাননীর জীবনের কতটুকুই বা জানে সে। দিল্লীতে সরকারী কোয়ার্টারে এক অলস দুপুরে উল বুনতে বুনতে সরমা যতটুকু বলেছিলেন, ততটুকুই। রামসুন্দরই অলকেন্দুকে ঘটনাটা বলেছিলেন। শুনে, অলকেন্দু বাড়ি এসেছিলেন, বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মা কোথায় ? দীননাথ জলদগম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, 'আর কখনও মাকে নিয়ে কোন প্রশ্ন করবে না। শোন, তোমার মা যা করেছেন তা অন্যায়, অপরাধ। আনপারডনেবল।

সরমা বলেছিলেন, নিছক গল্পচ্ছলে নয়, দাম্পত্যজীবনের একটা কঠিন সমস্যা তুলে ধরবার জন্যে। এই সমাজে স্ত্রীকে সর্বদাই কাজের কৈফিয়ত দিতে হয়। কেননা না জেনেশুনে, অকারণ খারাপ বলার কিংবা সন্দেহ করার স্বামীর সংখ্যাটা অনেক বেশি।

অলকেন্দু কিছুই বললেননি। সব কিছু কি বলতে হয়! মায়ের স্মৃতির কষ্ট এখনও যে তাকে ছোবল মারে, নারী-স্বাধীনতা নিয়ে কথাবার্তার মধ্যেই, তা ভাষাহীন এক হা-হুতাশ নিয়ে গুমরে উঠেছে। ব্যথার হিম ক্রমে পরিণত হয়েছে জিদের উদ্ধত ভঙ্গিতে।

লীনা অবিশ্বাসের ঘোলাটে চোখে রামসুন্দরের দিকে তাকাল। সেই যুগে কোন বউয়ের স্বেচ্ছায় পরপুরুষের কণ্ঠলগ্না হওয়া সত্যিই অসম্ভব। নিশ্চয়ই তাঁর রক্ষিতা হওয়ার পিছনে আর এক করুণ অধ্যায় লুকানো আছে।

সে বলল, 'স্বামীজির কথা থাক। সত্যি করে একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো, ইনি কিভাবে আপনার খপ্পরে পড়েছিলেন?'

ফের ভড়ংবাজি করতে গিয়ে উৎসাহ পেলেন না। বরং আসুক সেই আলো। উদ্ঘাটিত হোক সত্য। সেই সত্যটুকু আড়াল করলে নিষ্ঠুর বাস্তব তাঁকে ভেংচি কাটবে।

তিনি বললেন, 'একদিন ঝড়জলের রাতে প্রধান আলায় যখন আমি একা, সদ্য বাবুর বোতল থেকে খানিক নির্জলা হুইস্কি ঢেলেছি গলায়, বিধুমুখখানা চোখের সামনে স্পষ্ট হল। বললেন, আমাকে এখুনি হাসনাবাদ বাস টার্মিনাসে পৌঁছে দিতে হবে। জমিদারগিন্নী অন্দরমহলের বাসিন্দা। সে যুগে বাহিরমহল ছিল তাঁর কাছে স্বর্গের উদ্যানের নিষিদ্ধ ফলের মত। সংসার আর সময়কে পাহারা দেবার জন্যে মেয়েদের জন্ম একথা তিনি মানতে পারেননি। বিধিবদ্ধ প্রথা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন একমাত্র ছেলেকে কলকাতার কলেজে ভর্তি করে দেবেন বলে। এবং সেদিন আমাকে বলেছিলেন স্টেশনে পৌঁছে দিতে। সেই প্রথম দেখেছিলাম মধ্যতিরিশের যুবতী। তন্বী দেহের নিরেট বাঁধুনিতে অষ্টাদশীর অনাঘ্রাত যৌবনের উপস্থিতি। মনে হয়েছিল উচ্ছ্বাসহীন স্নিগ্ধ। এই দ্বিতীয়বার দেখা। এবার দেখেই স্ত্রীর স্পর্শজনিত গা-শিরশিরে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। উঃ, সে কি অপ্রতিরোধ্য কামজ্বর।'

একটু থেমে রামসুন্দর বললেন, 'মিথ্যে বলব না, তাৎক্ষণিক ভয় কিংবা বিবেকের দংশনে সেই অনুভূতি যেমন দ্রুত এসেছিল তেমনি দ্রুত মরেও গিয়েছিল। তারপর ওঁকে নিয়ে এসেছিলাম টার্মিনাসে। বিধির লিখন খণ্ডায় কার সাধ্যি। তখন শেষ বাস চলে গেছে। এমন কি, শেষ ট্রেনও তাঁকে ফাঁকি দিয়েছে। সত্যি বলতে কি, সেই মুহূর্তে উদ্ভূত পরিস্থিতির বাস্তবতা দলা পাকিয়ে গিয়েছিল ওঁর গলায়। উনি বিহ্বল, বিমূঢ়। আমার অবস্থাও তথৈবচ। যতটুকু মনে পড়ে, ওঁর অসহায় নিষ্প্রভ চোখের দিকে তাকিয়ে, শেষমেশ বলেছিলাম, আমার এখানে বাড়ি আছে, যাবেন? কি আশ্চর্য, একটু ভেবেই উনি রাজি হয়েছিলেন।'

'পরিস্থিতি মানুষকে কিনা করায়। হয়ত উনিও পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু পরদিন চলে গিয়েছিলেন কি? না কি সেই রাতে ওঁকে রক্ষিতা হতে বাধ্য করেছিলেন?'

এই কথা শুনে রামসুন্দর নিভাননীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকালেন। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে ঠোঁটে আঙুল রেখে লীনাকে ইশারা করলেন, 'এই আস্তে।'

লীনা বিষণ্ণ হেসে বলল, 'উনি তো সবই জানেন। লুকোবার কি আছে!'

এবার রামসুন্দরের স্বরে আর মুখভঙ্গিতে কাতরতা ফুটে উঠল, 'প্লিজ, ও'কে অসম্মান করো না। যে প্রতিবাদ উনি সেদিন একা করেছিলেন আজ সেই প্রতিবাদ নারী-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অসংখ্য নারী করছেন। ও'র কাছে তুমি এক বিস্মিত আবিষ্কার। তোমার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন ও'র সেই বিদ্রোহী চরিত্র। হয়ত সেই কারণে তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।'

সেই মুহূর্তে রোগ-ক্লান্তিতে ছোট হয়ে যাওয়া নিভাননীর মুখখানা তাকে কেমন বিহ্বল করে দিল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

এই সময় তার কানে ভেসে এল, 'সেকালে কোন বউ সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করবার সাহস দেখালে তাকে সমাজচ্যুত হয়ে বাঁচতে হত। পরদিন প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে যাবার পর, হয়ত উনি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। তা না হলে হঠাৎ শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে নেবেন কেন? 'কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞাসা করতেই মাথা নেড়ে বলেছিলেন 'কোথাও যাব না'। এই এত কাছে, এখানেই থাকব। একটা কথা। আমি যে এখানে আছি এ কথা কাউকে বলবে না।'

'অলকেন্দু যদি খোঁজ করতে বলে?' 'করবে। তবে শুনে রাখ, আমার কাছে অলকেন্দুর বাবা আর অলকেন্দু একই। পুরুষ।' বলেছিলেন না তো, যেন ঘৃণা আর ক্ষোভের কাদা ছুঁড়েছিলেন। এরপর সত্যি অলকেন্দু আমাকে বারবার বলেছে তার মায়ের খোঁজ করতে। করেছি। বলেছি, 'যে হারাতে না চায় তাকে হয়ত পাওয়া যায়। কিন্তু যে হারিয়ে যেতে চায় তাকে পাওয়া যায় না।'

পরিস্থিতির হাঁড়িকাঠে বলি হয়ে যাওয়া নিভাননীর জন্যে মর্মাহত হল না লীনা, গর্বিত হল। চোখমুখে একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। নিভাননীর পাশে বসে মুখের সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে গভীর গলায় ডাকল, 'দিদু! ও দিদু! আমি লীনা। কই, তাকান।'

শব্দ নেই। নড়াচড়া নেই। রামসুন্দরের বুকের ভেতরটা অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠল। তিনি অপলকে নিভাননীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। মনে হল তাঁর দেহে সামান্যতম স্পন্দন নেই। আর তখনই কেমন সন্দেহ হল। তাঁর কপালে, গলার কাছে ব্যস্ত সতর্ক হাত দিয়েই টের পেলেন মৃত্যুহিম। কখন যেন নিঃশব্দ পায়ে মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

রামসুন্দর মুখ তুললেন। লীনা তার দিকে উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে রয়েছে। তিনি ডাক্তারের ভঙ্গিতে ছায়াচ্ছন্ন মুখ নিচু করে বললেন, সরি।

অজান্তেই লীনার চেখের কোল ভিজে উঠল। মানুষ এই পৃথিবীতে মানুষের জন্যে জন্মে নিশ্চয়। নইলে এক অপরিচিত বৃদ্ধা, যাঁর নামটা সে শুনেছে, যাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই, হৃদয়ের সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি, তাঁর উপর কিসের টান যে বুকের দুর্বলতম স্পর্শকাতর স্থানটা নড়ে উঠবে!

ঠিক সেই সময় বিজলী দুধের গেলাস নিয়ে রামসুন্দরের কাছে এল।

'নাও, এটা খাইয়ে দাও।'

রামসুন্দরের স্বাভাবিক সহনশীলতার পাথরে চাপা বুক হঠাৎ হু হু করে উঠল। অল্প কাঁপা গলায় বললেন, 'ও দুধ কে খাবে আর। নিয়ে যাও। তোমার দিদা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।'

রামসুন্দরের কথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম হওয়ামাত্র বিজলীর ভিতরটা কেঁপে উঠল। হাত থেকে পড়ে গেল গেলাস। সে ছুটে খাটের উপরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। ডুকরে কেঁদে উঠল।

কান্না ছোঁয়াছে। সংক্রামিত হল। লীনার বুক ঠেলে উঠতে চাইল। সে কোনও রকম সামলে নিয়ে বিজলীর মাথায় সান্ত্বনামাখা হাত রাখল।

॥ নয় ॥

এই সমাজে চুকলিখোর বাঙালির সংখ্যাই বেশি। এদের হাত থেকে মরেও রেহাই পাওয়া যায় না। নিভাননীকে নিয়ে আগামী দিনে এরা যে অযাচিত নোংরা পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে তা ভেবেই লীনার দমবন্ধ অবস্থা। সে বাতাসের সমুদ্রের অতলে, কিন্তু বাতাস পাচ্ছে না। সব বাতাস মুহূর্তে কে যেন শুষে নিয়েছে।

তার বুকের ভিতরে তীব্র দাম্পত্য কলহের পরবর্তী ক্রিয়ায় ঢেঁকির পাড়ের শব্দ। এই উত্তেজনা অলকেন্দুর কথা ভেবে। সে জানে, পুরুষের দুটো ট্রাডিশনাল অহংকার আছে। পৌরুষ আর আভিজাত্য। নিভাননীর নিজ-জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক অলকেন্দুর সেই অহংকারে আঘাত হানতে পারে। যদি এমনটা ঘটে, তিনি হয়ত তা সহ্য করতে পারবেন না।

একসময় মাকে অলকেন্দু অনেক খুঁজেছেন। মায়ের কথা মনে পড়তেই চড় খাওয়া শিশুর মত ভ্যাক করে কেঁদেছেন। এখন তাঁর কাছে এ-আগমন সুখের না হতেও পারে। কেননা সময় শুধু দেহে বসে না, মনেও বসে।

একবার রামসুন্দরের মুখ, একবার চিরনিদ্রায় নিদ্রিত নিভাননীর দিকে চেয়ে দ্বিধায় ছটফট করল লীনা। এই মুহূর্তে রামসুন্দর মনমরা। এতদিনের সম্পর্কের তারটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেলে এমন হয়। কষ্ট কতক্ষণ? স্ত্রীর স্মৃতি মুছে যায় জীবননদীর একটা বড় ঢেউয়ে, আর ইনি তো রক্ষিতা। অলকেন্দুর বংশের মানসম্ভ্রম, মর্যাদা একটা পলকা সুতোয় দুলতে থাকবে এখন। তার এক প্রান্ত রামসুন্দরের হাতে, টান দিলেই ধুলোয় লুটোবে। মনে হচ্ছে, যে ঘটনার জন্যে অলকেন্দুর একটুও দোষ নেই। তার দায় কেন বইতে হবে তাকে কিংবা অর্ককে?

পরিস্থিতির অনিবার্য চাপে একসময় সব মানুষই যেমন দ্বিধা কাটিয়ে ওঠে, লীনা তেমনি উঠল। বুকের মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস সাহস সব ফিরে এল। আধঘণ্টার মধ্যে নিভাননীর মৃতদেহ ম্যাটাডোরে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল।

আমলানীর মোড়ে পৌঁছবার আগেই ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে লীনা দেখতে পেল বিডিও-র জিপ মোড়ে দাঁড়িয়ে। একমুহূর্ত ভেবে লীনা ড্রাইভারকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল, মোড়ে।

জিপ স্টার্ট খাচ্ছে। অফিসে লীনাকে না পেয়ে সুব্রত এইমাত্র গাড়িতে উঠে বসেছে। লীনাকে দেখে সে হাসল, 'কোথায় গিয়েছিলেন ?'

লীনা জিপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'হাসনাবাদ। কেন, দরকার আছে ?'

'না, এমন কিছু নয়। সুনীলবাবু বলছিলেন, ওঁর ভাই পাট্টা পেয়ে গেছেন।'

'যৌথপাট্টা ?'

'না। উনি অবিবাহিত। বেঁচে গেছেন জে. এল. আর. ও.। প্রায় তিরিশ বছর চাকরি করছেন। এই ধরনের যৌথপাট্টার কথা শোনেননি কখনও। দেওয়া যায় কিনা জানেনও না। পঞ্চায়েতের সুপারিশ দেখেই প্রেসার বেড়ে গিয়েছিল, বুকের ভিতরটা কেমন ধড়ফড় করছিল। এই বুঝি রিটায়ারের মুখে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন, এই বুঝি সার্ভিস রেকর্ডে লেখা হয়ে গেল ইনএফিসিয়েণ্ট !'

নিজে বলে নিজেই হাহা করে হাসল সুব্রত। লীনা হাসল। বিষণ্ন, প্রাণহীন হাসি। বলল, 'একটু ব্যস্ত আছি। আর কিছু বলবেন ?'

মুখে না বলতে গিয়েই লীনার মুখের পরিবর্তনে তার চোখ পড়ল। আর তখনই ম্যাটাডোরের দিকে তাকাল। একটু আগে এই ম্যাটাডোর তাকে ভাবায়নি। এখন, এই মুহূর্তে, লীনার ম্যাটাডোরে আসাটা কেমন রহস্যময় মনে হল তার। সে বলল, কি হয়েছে আপনার ?'

লীনা চমকে উঠল। পিছন ফিরে তাকাল ম্যাটাডোরের দিকে। দেখল ড্রাইভারের চোখদুটো তার দিকে স্থির হয়ে আছে। তাকিয়ে আছে যেন অর্জুনের লক্ষ্যভেদ-করা চোখ।

সে অপ্রস্তুত হল। সুব্রতের দিকে ফিরে তাড়াতাড়ি শিশুর গাল ভাসানো সহজ হাসিতে মুখ ভাসাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার বদলে তার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। সে বলে উঠল, 'এখন বলা যাবে না। আমাদের বাড়ি আসুন।'

সুব্রতের বুক ধক্ করে উঠল। তবে কি সত্যি কোন বিপদে পড়েছে লীনা ? মনে মনে তৈরি হয়ে নিল সুব্রত। যাই হোক না কেন, দ্বিধাহীনভাবে সে লীনার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

লীনার ম্যাটাডোরের পিছনে পিছনে সুব্রতের জিপ তাদের বাড়ির গেটের সামনে এসে থামল।

সুব্রতকে নিজের ঘরে বসিয়ে লীনা অলকেন্দুর ঘরে এল। অলকেন্দু ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবছিলেন। লীনার পায়ের শব্দে তাঁর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ল না। লীনা ডাকল, কাকু !

অলকেন্দু চোখ খুললেন। তারপর ভুরু তুলে তাকালেন লীনার চোখের দিকে। বললেন, 'কিরে, কিছু বলবি ?'

লীনা সোফায় তার মুখোমুখি বসল। তারপর ভূমিকা না করেই ঘটনাটা সংক্ষিপ্ত করে বলল।

অলকেন্দু এর ভালমন্দ কোন জবাব দিলো না। কেমন এক ধরনের শোকস্তব্ধ নীরবতা। লীনা কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। যে সংশয়ের মেঘ তাঁকে কেন্দ্র করে বুকে জমে উঠেছিল তা কেটে গেল। সে বলল, 'শ্মশানে যেতে হবে। প্রস্তুত হয়ে নাও।' বলেই সে উঠে দাঁড়াল।

অলকেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, 'মৃতদেহ কি নামানো হয়েছে?'

'না কাকু। কোথায় কোন কৌতূহলী চোখ উঁকি দিচ্ছে কে জানে! অসতর্ক মুহূর্ত সৃষ্টি করতে চাই না।'

'তাহলে কি সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

অলকেন্দুর ছোটবেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। সে সব দিনের সুর, ছন্দ ছিল ভিন্ন। কেমন হালকা, আলগা। মজার। মা ছিল কত কাছের, কত আপন। খুনসুটি হত, আদরও মিলত। আজ, এই মুহূর্তে, মনে হল সেই জীবন আর এই জীবনের মাঝে এক বিরাট ফাঁক তৈরি হয়েছে ধীরে ধীরে, অনিবার্যভাবে। ফিরে দাঁড়ালেও ভরাট হবে না। বরং এতগুলো বছরের অতীত অন্ধকারে যেমন আছে, তেমনি থাক। তিনি বললেন, 'কোন্ শ্মশানে নিয়ে যাব? টাকি?'

'না। জানাজানি হতে পারে। কলকাতায় নিমতলা কিংবা কাশী মিত্তিরের ঘাটে নিয়ে যাও।'

'ডেথ সার্টিফিকেট নিয়েছিস?'

'ইস্, একবারও মনে হয়নি একথা। কলকাতা থেকে যোগাড় করতে পারবে না?'

'সে হবে'খন', অলকেন্দু নিচু গলায় বললেন, 'অর্ককে কিছু বলেছিস?'

'না, দাদার সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। ও বোধহয় এখনও মেছোঘেরি থেকে ফেরেনি।'

'ওকে কিছু বলিস না।'

লীনাকে ভারমুক্ত করে দিলেন অলকেন্দু। আসার সময় ড্রাইভারের পাশে বসে একটা চিন্তার মধ্যে সে বেশি সময় পাক খেয়েছিল। ঘটনাটা নিয়ে অর্কের সঙ্গে অহেতুক কথার দ্বন্দ্বে যেতে হতে পারে। যা অবুঝ মন, হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারে। যদি দিনের আলো নিভাননী রহস্য তার কাছে উন্মোচিত না করে, তাহলে রহস্যটা রহস্যই রয়ে যাবে। অবশ্য এই সময় অলকেন্দুর আধিপত্যের কথা একবারও মনে হয়নি তার।

একটু ভেবে লীনা বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু একা তুমি কি করবে? সুব্রতবাবু এসেছেন। ওঁকে বলে দেখি। যদি রাজি হন, তোমার সুবিধেই হবে।'

লীনা তার ঘরের দিকে যেতে যেতে সুব্রতের কথা এক প্রস্থ ভেবে নিল। সুব্রত অমায়িক, ভদ্র। ইতিমধ্যে লীনা তার সহজাত ক্ষমতা দিয়ে বুঝে নিয়েছে তাকে

ভালবাসে সে। সুতরাং নিজের চোখদুটোর মত তাকে বিশ্বাস করা যায়। আপাতত এই ভাবনা নিয়ে সে সুব্রতের সামনে এল।

'এক্সকিউজ মি। একটু দেরি হয়ে গেছে।'

সুব্রত ছটফটিয়ে উঠল, 'না, না, ঠিক আছে। এ আর এমন কি দেরি! বলুন, কি ব্যাপার?'

লীনা বলল, 'আপনাকে বন্ধুর মত একটা কাজ করতে হবে।'

'কি কাজ?'

'শ্মশানে যেতে হবে।'

'শ্মশানে! কাকে নিয়ে?'

'কাকুর মা।'

ম্যাটাডোরকে ঘিরে যে রহস্যকুয়াশা জমে উঠেছিল সুব্রতের মনে, এইমাত্র তীব্র আলোর ফুৎকারে তা উবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর এক রহস্যকুয়াশা ছড়িয়ে পড়ল। বাড়িতে কেউ মারা গেলে শোকস্তব্ধ ভারী বাতাস এখানে ওখানে থমকে থাকে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কিন্তু সেরকম তো মনে হচ্ছে না। সহজেই নিশ্বাস নিতে পারছে। তবে কি এ বাড়িতে অলকেন্দুর মা মারা যাননি? কে জানে!

সে বলল, 'কখন মারা গেছেন?'

'এই তো, একঘণ্টাটাক।'

'পড়শি কিংবা আত্মীয়স্বজনকে জানাননি?'

'না।'

কেন প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সুব্রতের বুকচাপা কৌতূহল বাইরে বেরুতে যাচ্ছিল। কোনমতে সে সামলে নিল। কত পরিবারের কত কি কাহিনী প্রস্তরীভূত হয়ে যায় কালের কঠিন বুকে, পুরাতত্ত্ববিদের মত তা খুঁজতে গেলে সত্য অজগরের মত মাথা তুলবেই। কি জানি ছোবল দিয়ে বসে কিনা।

একটু থমকে দাঁড়ালেও একেবারে থামল না সে। সঙ্গে সঙ্গেই সে অন্য প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'আর কে যাচ্ছেন শ্মশানে?'

'কাকু।'

'অর্কবাবু?'

এই প্রশ্নে হঠাৎ লীনার চোখমুখের রং বদলে গেল। একটু গম্ভীর গলায় বলল, 'এত প্রশ্ন করছেন কেন? আপনি কি গররাজি?'

'আরে, রাগ হয়ে গেল! যাকগে, আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না। বলুন কোথায় যেতে হবে?'

'কলকাতা।'

'এখুনি?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। আমি প্রস্তুত।' সে উঠে দাঁড়াল, 'তাহলে ড্রাইভারকে চলে যেতে বলি?'

'আপনি বসুন। আমি বলে আসছি।'

লীনা বেরিয়ে যেতেই কি যেন ভেবে সুব্রত তাকে অনুসরণ করল। যখন লীনা প্রায় গেটের কাছে। সে গলা তুলে বলল, 'লীনা, প্লিজ ওয়েট আ বিট।'

লীনা থমকে দাঁড়াল। ততক্ষণে সুব্রত মেছো বকের মত লম্বা লম্বা পা ফেলে তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।'

জিপের কাছে গিয়ে সুব্রতই বলল, 'দীপক, তুমি চলে যাও।'

'স্যার, আপনি ?' একটু ইতস্তত করে বলল দীপক।

'আমাকে এখন কলকাতায় যেতে হচ্ছে।'

হঠাৎ দীপকের কেন যেন মনে হল সাহেব আর লীনার মধ্যে একটা সমঝোতা হয়েছে। দুজনেই অবিবাহিত। হয়ত এখন তার রিহার্সাল চলছে। এই সময় তার বুকের মধ্যে অজানা গুরুগুরু শব্দ হল। মনে হল বউয়ের মুখখানা। অবাক হয়ে দেখল দীপক, বউয়ের মুখে কর্কশ কাঠিন্যের মধ্যে শুধু হিংস্রতা আর লীনার মুখে এক আশ্চর্য স্নিগ্ধতা।

চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল দীপকের। ব্যস, স্টার্ট দিল গাড়ি। এবং মুহূর্তে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

একমুহূর্ত চুপচাপ, তারপরই আফসোস, 'এইরে, লাগল তো।'

লীনার গালে রক্ত জমল। সুব্রত ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েই তার হাত, লীনার বুকে লেগেছে। সে মুখ নিচু করে কথা ঘোরাল, আসুন। বলেই ঘুরে দাঁড়াল।

সুব্রত বলল, 'আচ্ছা, দূরত্বটা একটু কমানো যায় না, মানে আপনি না বলে তুমি ?'

অনেকেরই মনের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কোন এক মুহূর্তে তারা আন্দোলন-রত নেতার নিয়ন্ত্রণ হারানো সমর্থকের মত বেপরোয়া হয়ে ওঠে। লীনা যে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র তা নয়, তবে নিজের মনকে কিছুটা বোঝে। কিছুদিন থেকে এই দূরত্ব কেমন যেন নিরর্থক মনে হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে, সে বোধহয় নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে চাইছে। সুব্রতকে ভালবাসে এই কথাটা অবদমিত রেখে ভাবের ঘরে চুরি করতে চাইছে। এবার সে সহজ হল। অনুযোগের সুরে বলল, কি যে কর না! কোথায় মৃতদেহকে শ্রদ্ধা জানাবে, অশ্রুসজল চোখে মৌনব্রত পালন করবে! তা নয়, আবেগ—প্রেম—তুমি না একটা...'

'যাচ্ছেতাই !'

'প্লিজ, এখন ইয়ার্কি করো না।' চাপা গলায় লীনা বলল, 'ম্যাটাডোরে ড্রাইভার আছেন। এসো।

॥ দশ ॥

অর্ক কখনও ভাবেনি সেই প্রাক্ সন্ধ্যা মুহূর্তে মেছোঘেরিতে দেখা বৃদ্ধা জমিদার দীননাথ চৌধুরীর স্ত্রী নিভাননী চৌধুরী তার ঠাকুমা। সে কল্পনাও করেনি তার ঠাকুমা রক্ষিতা। এখনও বেঁচে আছেন।

সে ঠাকুমার মৃতদেহ দেখতে পায়নি। কিংবা তাকে দেখতে দেওয়া হয়নি। এজন্য তার কোন দুঃখ নেই। তার দুঃখ একটাই, ঠাকুমা বৃত্তান্ত তার অগোচরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল।

লীনা বলেনি। এমন কি অলকেন্দুও এ সম্পর্কে আশ্চর্য নীরব ছিলেন। সে-ই অলকেন্দুকে মরণাশৌচের শাস্ত্রসম্মত বিধি পালন করতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বাবা, কে মারা গেছেন?'

অলকেন্দুর সামনে অর্ক। তার পিছনে স্নানসিক্ত গাছগাছালির জল টোপানো একটা পড়ন্ত বিকেল। বাতাসের বুকে বর্ষার গান। এমনই সময়ে, মায়ের মৃত্যুশোকে ক্লান্ত দেহমন চেয়ারে সামান্য টানটান করে তার দিকে তাকিয়েছিলেন অলকেন্দু, 'আমার মা।'

অর্ক চোখ বড় বড় করে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল। তারপর কতকটা নিজের মনেই বলেছিল, 'ঠাকুমা এত দিন বেঁচে ছিলেন!'

অশৌচ তো তারও, কিন্তু তাকে বলা হয়নি কেন? বলতে যাচ্ছিল অর্ক, ঠিক তখনই তার মনে হল আর কথা বলা অনর্থক। হয়ত আর কোন কথার জবাব দেবেন না তিনি। বিয়ের পর থেকে তার সঙ্গে অলকেন্দু একরকম কথাই বলেন না।

অগত্যা লীনা অভিযান। সে সিধা প্রশ্ন করেছিল, 'লীনা, ঠাকুমা এতদিন কোথায় ছিলেন? দেখেছিস ঠাকুমাকে?'

লীনা এই প্রশ্ন শুনে তখনই বুঝেছিল এই রহস্য আর আড়াল করা যাবে না এবং ভেবে নিয়েছিল আড়াল করতে গেলেই জটিলতা বাড়বে। তাতে তার ক্ষতি না হোক পিতা-পুত্রের হিমকঠিন সম্পর্ক রোজকার সূর্য ওঠা-ডোবার মত স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা দূরে সরে যেতে পারে।

লীনা একটুও ভাবে না যে সে এই পরিবারে না এলেও এ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত। সে ভাবে, তাকে নিয়ে দুজনের মাঝখানে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে উঠেছে। আর এই প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হবে তাকেই।

লীনা জবাব দিয়েছিল, 'হ্যাঁ।'

এর পরই শুনিয়েছিল নিভাননী বৃত্তান্ত। শেষ হলে সে অর্কের চোখে দেখতে পেয়েছিল এই বিকেলে ধুধু মরুভূমি। আলগা বুকখানা থেকে ঝাঁঝাঁ তাপ একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বিকিরিত হচ্ছে।

কি হল? তার মনে ভয় ও সংশয়। সে বিছানায় বসেছিল। হঠাৎ মনে এই সব দুঃখ শোক ছাপিয়ে তার ভিতরে আগুন জ্বলে ওঠার কারণ জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। 'তোমার চোখে আগুন কেন?'

'আমার কাছে কর্তব্যের চেয়ে বংশমর্যাদা বড়। ঠাকুমা চৌধুরী বংশের বধূ হলেও কুলত্যাগিনী। রক্ষিতা। তার মুখাগ্নি করে বাবা বংশের মর্যাদা নষ্ট করেছেন।'

তীব্র নিঃশ্বাসে লীনা প্রতিবাদ করেছিল এ কথার। 'বংশমর্যাদা! মানুষকে নিয়েই তো বংশ। সেই মানুষকে অপরাধ করতে প্রবৃত্ত করছে এ সমাজ। সব কিছুর জন্যে দায়ী এই অবক্ষয়ী সমাজ। হ্যাঁ, এই সমাজ ব্যবস্থাই দিদুকে রক্ষিতা হতে বাধ্য করেছে। যদিও এই সমাজে স্ত্রী আর রক্ষিতার মধ্যে নামগত ছাড়া আর কোন পার্থক্য আমার চোখে পড়ে না। স্ত্রী চিরকালের দাসত্বে দেহকে বিক্রি করে, রক্ষিতাও এক পুরুষের নজরবন্দী হয়ে সারা জীবন দাসীবৃত্তি করে। ভীষণ, ভীষণ কষ্ট হয় আমার, যখন দেখি এই দেহসর্বস্ব অচেনা সমাজে নিঃশব্দে মেয়েদের নিয়ে খেলা চলছে। গান্ধারী চোখ বেঁধে অন্ধ হয়েছিলেন। মেয়েরা চোখ না বেঁধেই অন্ধ। এই খেলা কিছুতেই দেখতে পাচ্ছে না।'

লীনার এই কথা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি অর্কের সনাতন বিশ্বাস। সারা রাত এক অদৃশ্য যন্ত্রণায় ছটপট করেছিল। ঘুমলাগা চোখের ভারি পাতাও এক করতে পারেনি। ভোর হতেই সে কলকাতায় যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল।

অর্ক আর আসেনি, কিন্তু শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গিয়েছিল নির্বিঘ্নে। এ নিয়ে আর পাঁচজন যে প্রশ্ন করেনি এমন নয়, অলকেন্দু গা বাঁচিয়ে যথাসম্ভব উত্তর দিয়েছিলেন।

অলকেন্দুর পিছনে এখন মেছোঘেরির রোদ টলটলে জলের ছলছলাত। সামনে শায়িত যে ধূসর কাদার ধু ধু চর তার পিছন থেকে একটা নদী, দিনরাত কলকল শব্দে একটা মধুর সুর রচনা করে, এখন এক অবসন্ন কুলুকুলু বিলাপ করে চলেছে। তার মধ্যে একটা বিষাদের সুর বাজছে—যেমন বেজে চলেছে অলকেন্দুর প্রাণে। অলকেন্দু জানতেন রামসুন্দরের রক্ষিতার কথা। রক্ষিতা বেশ্যার ভদ্র সংস্করণ। পুরুষের মেয়েমানুষ থেকে মেয়েমানুষান্তরে ভ্রমণবিলাস কোন দোষের নয়। রক্ষিতায় দোষ কিসের? অবশ্য মাঝে মধ্যে তার সততা নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে মনে। কিন্তু সেটাকে কখনও আমল দেননি। হাজার হোক, বাবার আমলের মানুষ। বাবার মত। অলকেন্দুর এই সরলতা আর রামসুন্দরের নিরেট কপাল, মিলেমিশে একাকার হয়েছিল বলেই রামসুন্দর আজ মেছোঘেরিতে কর্মজীবনের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে। আজ জানলেন সেই রক্ষিতা তার মা। সেদিনের সেই হারিয়ে যাওয়া ব্যথার মুহূর্তগুলো আজ একটা মাত্র সমুদ্র।

হঠাৎ অলকেন্দু মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, অদূরে, ভেড়ির উপর ঘেরির টলটলে জলের দিকে তাকিয়ে আছেন রামসুন্দর, একা। পরণে ধুতি-পাঞ্জাবি। বয়সের ভারে দেহ সামান্য নুব্জ। ঝিরিঝিরি হাওয়ার মধ্যেই পাঞ্জাবী ঘামে ভিজে বাঁ-হাতের উপর

লেপটে আছে। মুখের সবটা স্পষ্ট দৃশ্যমান নয়। তবু তাঁর মনে হচ্ছে, কি এক পার্থিব চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন।

অলকেন্দু ডাকলেন, 'রামসুন্দর !'

রামসুন্দর চমকে উঠে বাঁ-হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। তারপর তাঁর কাছে এলেন। অলকেন্দুর মাথায় এখন কথার ভিড়। কিভাবে শুরু করবেন তা বুঝে উঠতে পারলেন না।

রামসুন্দর অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তাঁর ছায়া পিছলানো চোখের দিকে। তারপর বললেন, 'আমাকে কিছু বলবে ?'

এবার অলকেন্দু স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'শুনুন, আপনার বিষয়বুদ্ধি আছে, আপনি হিসেবী মানুষ, আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝবেন। আপনার অনেক বয়স হয়েছে। এই বয়েসে এত কষ্টের কাজ আর না করাই ভালো।'

হঠাৎ বুকে ফিক ব্যথায় যে কষ্ট হয়, সেইভাবে রামসুন্দর বললেন, 'তুমি কি অন্য লোক নিয়োগের কথা ভাবছ ?'

অলকেন্দু বিরক্ত হলেন। 'আমি কি ভাবছি না ভাবছি তা কি আপনাকে বলতে হবে ?'

কথাটা শুনে সেই কষ্টের ঢেউ দ্বিগুণ বেগে বয়ে গেল রামসুন্দরের মাথায়। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল সেই কষ্ট, যন্ত্রণা। ব্যাপার-স্যাপার খুব সুবিধের নয়। অতীতকে মোচড়ালে যে বর্তমানকে পাওয়া যায় তা পঙ্গু, তার মধ্যেই এখন অলকেন্দু। হয়ত বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত দেহ-মন। ঘর ছাড়ার অনিবার্যতায় অবশ্য নিভাননী যে রক্ষিতা হয়ে পড়েছিলেন তা যুক্তি দিয়ে বোঝার মত মন নেই।

প্রতিটা মুহূর্ত রামসুন্দরের পাথর সময় মনে হচ্ছে। রাগ হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তে অলকেন্দুর মুখের উপর সপাটে জানিয়ে দেন যে অন্যায়ভাবে তাঁকে ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও দ্বিধা। অলকেন্দুর সুদীর্ঘ চাকরী জীবনের বছর-গুলোতে, বাড়ি আর মেছোঘেরির কেয়ারটেকার যখন ছিলেন, তখন আশাতীত পাওয়ার কৃতজ্ঞতাটুকু এখনও ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না।

ভিতরের কষ্ট চেপে রেখে হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

অলকেন্দুর উঠে পড়তে ইচ্ছে হল। প্রথমে পারলেন না। শুধু এক ভয়। প্রতি-হিংসার আগুন জ্বলে না ওঠে রামসুন্দরের মনে। পরে অবশ্য উঠে দাঁড়ালেন। এই ভেবে যে, এখন রামসুন্দরের মনটন খারাপ। যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনটাকে ভালো করতে চান ক্ষতি কি ! ক্ষতি নেই। বরং ভালোই। ভালোই তো।

অলকেন্দুর বাড়ির গেটের উপর বোগেনভিলিয়ার ঝাড়। লাল আর সাদা রঙের ফুল থোকায় থোকায় ফুটেছে। গেটের উপর থেকে সতেজ বেল ফুলের গাছে নেমে গেছে ফুলের দল। ভিতরে, গেটের দু' পাশে দুটো বেল ফুলের গাছে ফুটে থাকা অজস্র সাদা ফুল যেন প্রাণের কোন গভীর অনন্দে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

সেই হাসি অলকেন্দু দেখতে পেলেন না। দেখতে পাবার কথাও নয়। অন্যমনস্কতার

মধ্যে মুখ তুলতেই তার চোখে অবশ্য পড়ল দু-একটা দল। তিনি গেট খুললেন। ভিতরে পা রাখতে না রাখতেই তাঁকে ঐ দিকের রাস্তার আলো-আঁধারি বাঁক থেকে কেউ ডাকল, 'দাদা, দাঁড়ান।'

অলকেন্দুর পা থমকে গেল। মুখ তুলতেই দেখতে পেলেন ছন্দাকে। দ্রুত পায়ে এদিকে হেঁটে আসছে।

'দিদি বাড়ি আছেন?' একইভাবে তাঁর দিকে এগোতে এগোতে ছন্দা জিজ্ঞাসা করল।

'বলতে পারছি না তো। তুমি বরং এসো।' বলেই অলকেন্দু লম্বা এক ফালি রোদ চকচকে পথ মাড়িয়ে গিয়ে বারান্দায় উঠে বললেন, 'বসো।'

ছন্দা বসেই বলল, 'দিদিকে একটু ডেকে দিন না—' ছন্দার কণ্ঠস্বরে বোবা কান্নার সুর। অলকেন্দু চমকে উঠলেন। এই স্বর তার পরিচিত। শঙ্কিত কিংবা অসহায় বুক বিদীর্ণ করে উঠে আসে সশব্দে। অমোঘ লক্ষ্যে। তিনি বুঝতে পারছেন না কেন এমনতর সুর! ধরতে পারছেন না এই সুরের অন্তর্লীন বাণীগুলো তার জীবন থেকে উঠে এসেছে কিনা। এই বুঝতে বা ধরতে না পারার ব্যর্থতার একটা ফোঁড়া টনটন অস্বস্তি নিয়ে তিনি বললেন, 'ডেকে না হয় দিচ্ছি। কিন্তু তোমার কি হয়েছে বল তো?'

ছন্দার বুকের মধ্যে যে তীব্র কষ্ট, এই কথা শুনে, তার মধ্যেই একটা অদ্ভুত অসহায়তা ছড়িয়ে পড়ল। আজকাল প্রায়ই পড়ে। প্রায় সকল সময়। মনে হয় সুখের জীবন শেষ হয়ে হয়ে গেল। শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুনীল কিছুতেই, কোনভাবেই বুঝতে চায় না তাকে।

'কি হল? বল—'

ছন্দা করুণচোখে তাকাল। 'সংসারে খুব অশান্তি। রোজ ঝগড়াঝাটি হচ্ছে। আমি যদি একটা কথা বলি, সুনীল পাঁচটা কথা শুনিয়ে দেয়। যেমন উগ্র মেজাজ, তেমনি অভদ্র আচরণ।'

অলকেন্দু তার সামনে বসে বললে, সংসারে এরকম হয়েই থাকে। মানিয়ে নাও।'

'তাহলে তো সমিতিতে যাওয়া বন্ধ করতে হয়!'

'কেন, ওকি তাই বলছে?'

'হ্যাঁ। ভয়ও দেখাচ্ছে, এ সব আন্দোলন টান্দোলন ওর পছন্দ নয়, এর পর ওর কথা অমান্য করে আন্দোলনে যোগ দিলে বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হবে।'

'হোয়াট! সুনীলের এত অধঃপতন। হঠাৎ খোলা গলায় বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন অলকেন্দু।

লীনা রান্নাঘরে কুটনো কুটছিল। অলকেন্দুর চিৎকার দরজা উপচে তার কর্ণকুহরে আছড়ে পড়তেই অবাক হল। সে সটান উঠে দাঁড়াল। বুকের আঁচল খসে পড়ল মাটিতে। কাপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে সে পাশের ডাইনিং রুমে ঢুকল। তারপর সরু প্যাসেজ ধরে ডানদিকে খানিক এগিয়ে সদর দরজা খুলে বারান্দায় এল।

মানদার কাছেও এই চিৎকার বিস্ময়ের। বোধহয় এই প্রথম। লীনা বেরিয়ে যাবার পর সে গ্যাস চুল্লিতে অতি দ্রুত ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দিল।

তারপর লীনার ঘরে গিয়ে দরজা খুলে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল। এখান থেকে বারান্দার সব কিছু দেখা যায়।

ততক্ষণে ছন্দার থতমত চোখের দিকে তাকিয়ে লীনা বলেছে, 'আরে, আপনি! কি ব্যাপার?'

তারপরই অলকেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এইমাত্র কে চিৎকার করল, তুমি?'

'হ্যাঁ। কেন করব না? সুনীল, যাকে আমি বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ বলে জানতাম, সে কিনা ছন্দার উপর অত্যাচার করে!'

লীনা ছন্দার চোখে চোখ রাখল। 'সত্যি?'

ছন্দা গম্ভীরমুখে মাথা নাড়ল। তারপর সংকোচে মুখ নিচু করল। মুহূর্তে লীনার মুখের ছড়ানো রেখা গুটিয়ে গিয়ে সেখানে কাঠিন্য ফুটে উঠল। সে বলল, 'কেন?'

সে মুখ তুলে কঠিন অথচ বিষণ্ণ চোখে লীনার দিকে তাকাল।

'অনেক কারণ।'

'যেমন?'

'আমাদের একটা মেয়ে আছে। এখুনি আমি আর সন্তান চাই না। কিন্তু উনি চান। ছেলে। ছেলে না হলে বংশ রক্ষা হবে না।'

লীনা হেসে অলকেন্দুর পাশের চেয়ারে বসল। বলল, 'সুনীলবাবুর এই ভাবনার পিছনে রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বাস আর মূল্যবোধের প্রভাব। রয়েছে, থাকবে। আপনি ভাই একটু সমঝে চলুন। ওকে বোঝান। দেশের অবস্থা, দশের অবস্থা। শিক্ষিত সচেতন মানুষ নিশ্চয়ই বুঝবেন।'

'দিদি, আপনি ওঁকে চেনেন না। ওর কাছে স্ত্রী দিনেরবেলা শ্রম দান করার যন্ত্র আর রাতেরবেলা সম্ভোগের বস্তু।'

অলকেন্দুর কেন জানি মনে হল সুনীলের সঙ্গে তার একটা ভারী মিল রয়েছে। দুজনেরই বিশ্বাস, স্ত্রী পুরুষের ভোগ্যবস্তু। তাদের সোহাগ বা প্রেম এই ভোগেরই আঙ্গিক।

লীনা বলল, 'সুনীলবাবু কেন, সব বাবুর কাছে স্ত্রী একই। অবশ্য অজান্তে। হঠাৎ এই উপলব্ধি হল কেন?'

'এখন নিজের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করছি, তাই।' ছন্দা বলল।

লীনা বলল, 'শুনুন ছন্দা, এখন, এই বিবাহিত জীবনে, আপনার দেহে আপনারই কোন অধিকার নেই। এই দেহ একান্তই আপনার স্বামীর। আপনার মন বলে কিছু আছে, একথাও স্বীকার করে না এই ধর্ম। বৃহদারণ্যক উপনিষদে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, 'স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে কিনবার চেষ্টা করবে। তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে

মেরে তাকে নিজের বশে আনবে।' জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিরোধ করা চলে না। আপস করুন।'

ছন্দা অবাক, 'আপস করব। কেন, কিসের ভয়? যে ধর্ম নারীকে মানুষের সম্মান দেয় না, যে ধর্মে নারী পুরুষের সম্ভোগের উপকরণ, সে ধর্ম পূর্ণ নয়, মলিন, তার ভিতরটাই নড়বড়ে। এই ধর্মকে করব ভয়। না দিদি, আমি সাবলম্বী, শিক্ষিকা। আমি যদি সংস্কার গুঁড়িয়ে দিয়ে, বিতর্কের ঘূর্ণিঝড় তুলে, অজস্র বাধাবিপত্তি পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে না পারি, তাহলে কে পারবে?'

অলকেন্দুর কাছে ছন্দার এই চেতনা, এই ভিতর থেকে উঠে আসা অনুভূতি এক বিস্মিত আবিষ্কার। হয়ত এই আবিষ্কারের আশায় তিনি দিন গুনছিলেন। তাঁর চোখ মুখে বাইরের প্রকৃতিছেঁচা আলো উপচে পড়ল। তিনি উচ্ছ্বসিত হলেন, 'ব্রেভো। কনগ্রাচুলেশন। তুমিই পারবে পুরুষের স্বার্থভিত্তিক ভোগকেন্দ্রিক জীবনদর্শনে আঘাত হেনে ক্ষতবিক্ষত করতে।'

হঠাৎ অলকেন্দুর নির্ভেজাল উচ্ছ্বাসে লীনা বিব্রত হল। সে বলল, 'প্লিজ কাকু, এভাবে আমার সুচিন্তিত কাজে বাধা দিও না। পুরুষ হয়েও এই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছ তা কিন্তু ব্যর্থ হবে।'

কথাগুলো যতই জটিলভাবে আর রুক্ষ গলায় বলুক লীনা, অলকেন্দুর চোখমুখের আলো নিভে গেল না বা নিষ্প্রভ হল না। বরং অন্য উৎস থেকে বিস্ময়ের বাড়তি আলো পেয়ে উজ্জ্বলতর হল। অর্ক অলকেন্দুর যে হৃদয়ের খোঁজ পায়নি, কি আশ্চর্য, সেই হৃদয়ের স্পন্দন গভীরভাবে অনুভব করেছে লীনা। তাই বুঝি এই সতর্কতা—যা নিছক অনর্থক নয়, রঙ ফলানো বুলি নয়, অন্তঃসারশূন্য নয়। তিনি বললেন, 'সরি, ভুল হয়ে গেছে। আর কখনও এমন কথা বলব না। কি, খুশি তো?'

'না, কাকু, এতেও খুশি হতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি কিছু মহিলার স্বাবলম্বী হবার ব্যবস্থা করে দাও, তাহলে সত্যিই খুশি হব।'

অলকেন্দু এক মুহূর্ত থমকে গেলেন। লীনা তাঁর কাছে এই ধাঁচের প্রস্তাব কখনও দেয়নি। যখন তিনি প্রধান ছিলেন, তখন মাঝে মধ্যে মনে হত একমাত্র অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এই সমাজে মেয়েদের সমানাধিকার দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত এই ভাবনা কখন যে মনের অচিনলোকে আত্মহত্যা করেছিল তা তিনি নিজেই জানেন না। তিনি জানতে চাইলেন, 'কি ব্যবস্থা?'

'তুমি হরিপুরের তাঁতঘর দেখেছ?'

অলকেন্দু মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, ওটা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল।'

'ওই ধরনের, ঠিক কারখানার মত তিনটে শেড তৈরী করে দেবে। সেখানে মেয়েদের জন্যে সেলাই কেন্দ্র গড়ে তুলব।'

অলকেন্দু সামান্য চুপ করে থাকলেন। তারপর চিন্তিত মুখে বললেন, 'হুঁ বুঝেছি। কিন্তু মেশিন কেনার টাকা কোথায় পাবি? পঞ্চায়েত দেবে?'

'টাকার যোগাড় হয়ে যাবে। তুমি রাজি তো?'

অলকেন্দুর চোখে মুখে খুশির আলো ঝিলিক মারল, 'তুই যখন বলছিস। রাজি না হয়ে উপায় আছে। সত্যি তোর উদ্যম প্রশংসনীয়। তবে প্রশংসার মূল্যে এই চিন্তা ভাবনাকে পরিমাপ করলে তোকে ছোট করা হবে। শুধু বলি, চরৈবেতি। এগিয়ে যা।'

অলকেন্দুর কথা ছন্দাকে চমৎকৃত করল। এখনও পৃথিবীতে মানুষ আছে। আছে বলেই শয়তানের ভাণ্ডারে সঞ্চিত বিধ্বংসী পারমানবিক অস্ত্রের মৃত্যুযন্ত্রণা উঠেছে। তার মনে পড়ল সুনীলের কথা। গত রোববারের ক্লান্ত বিকেল। এক ঘুম ঘুমিয়ে সদ্য বিছানায় উঠে বসেছিল সুনীল। দরজার পর্দা সরিয়ে এক গাদা রোদ-খাওয়া কাপড় নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল ছন্দা। আলনার দিকে যেতে যেতে ঠোঁটে একফালি হাসি ফুটিয়ে বলেছিল, 'কি মশাই, ঘুম ভাঙল—'

সেই মরমর বিকেলে সুনীলের চোখে রাতের ঘোর।

'অ্যাই, শোন—'

কাপড়গুলো আলনার উপর ডাঁই করে তার মধ্যে থেকে একটা কাপড় টেনে আঙুল ঘুরিয়ে কোঁচাতে কোঁচাতে তার কাছে গিয়েছিল। এবং মুখে চোখ রাখতে না রাখতেই আঙুল ঘোরান থমকে গিয়েছিল, 'কি, বলো!'

খপ করে ছন্দার হাত চেপে ধরেছিল সুনীল। 'প্লিজ ছন্দা—'

সুনীলের টানে শাড়িটাড়ি নিয়ে বিছানার উপর ঝুঁকে পড়েছিল সে। কোনমতে সামলে নিয়েছিল নিজেকে।'

'আঃ ছাড়!'

'প্লিজ—'

'কি যে কর না। কেউ দেখে ফেলবে। ছাড়—' বলেই নিজেকে মরিয়ার মত ছাড়িয়ে নিয়েছিল ছন্দা।

সেই মুহূর্তে সুনীলের আবেগটা আছাড় খেয়েছিল। রেগেমেগে চিৎকার করে উঠেছিল, ছন্দা—

এক মুহূর্ত থমকে গিয়েছিল ছন্দা। পরক্ষণে বলেছিল, 'আমার এই দেহটা তোমারই। ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পার। কিন্তু আমার একটা মন আছে, মানসিক প্রস্তুতি আছে। সেই মনটার কথা ভাববে না?'

'তাই নাকি? সে মনটা এখন কোথায়? যৌন-স্বাধীনতার কথা ভেবে ভেবে কি ক্লান্ত?'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'এত বোঝ, এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারছ না?'

'পারছি। ছন্দা এতক্ষণ চাপা গলায় কথা বলছিল, হঠাৎ নিজেকে আর ঠিক রাখতে না পেরে অসহিষ্ণু হল, 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। তুমি ইতর, অভদ্র, নীচ।'

সুনীল এবার তীব্র শ্লেষ নিক্ষেপ করেছিল ছন্দার উপর, 'তোমরা, যারা স্বাধীন যৌনতায় লালায়িত, তাদের চেয়ে?'

কেন যেন ছন্দা আর হামলে পড়েনি তার সামনে বসা সুনীলের উপর। কাপড়টা

আনলায় রেখে সে মাকড়সার মত অসামান্য শৈলিতে যুক্তির জাল বুনেছিল, 'স্বাধীন যৌনতা নারী স্বাধীনতার একটা অঙ্গ। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতার মত যৌন-স্বাধীনতা ছাড়া নারী-স্বাধীনতার কথা একটা নির্বোধ অপযুক্তির কচকচি। যৌন-স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছ তোমরা। যেদিকে তাকাই, দেখতে পাই তোমাদের বিকৃতরুচির আব্রুহীন অন্ধকার। বেশ্যালয়। নারী যৌন-স্বাধীনতা পেলে এক ঢিলে দুই পাখি মরবে। স্ত্রী তার স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারে এই ভয়ে অন্তরের জোরে বাঁধন টিকিয়ে রাখতে ব্যস্ত হবে পুরুষ। আর তখনই বেশ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।' এক সময় অনিবার্যভাবেই বেশ্যালয় উঠে যাবে। এবং নারী-পুরুষের অধিকারের ভারসাম্য থাকায় একটা সুস্থ, পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এই সমাজে।'

সুনীল হো হো করে হেসে উঠেছিল। 'যৌন-স্বাধীনতা! বাঘকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু তোমাদের? এই সমাজে যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক আছে, তেমনি থাকবে। স্বপ্ন দেখতে চাও, দেখ। 'কেন না স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। তবে তুমি যদি স্বপ্ন দেখতে চাও, বাড়ি বসে দেখবে। বুঝেছ?'

'হুকুম?'

'হ্যাঁ। অমান্য করলে ফল ভালো হবে না।'

'কি করবে? বাড়ি থেকে বের করে দেবে?'

'হ্যাঁ। ফর এভার।'

ছন্দার বুকের ভিতরে উঠে এসেছিল গোধূলির আলোয় মাখামাখি অদূরের ওই বিষণ্ণ চরাচর। তার মনে হয়েছিল, এ তো আপামর পুরুষের কথা। সে ওই কথার জবাবে যায়নি আর।

এখন, এই মুহূর্তে, ছন্দার মুখে বিস্ময় ছাড়াও বাড়তি একটা বিশ্বাস। সেই মুখেই সে বলে উঠল, 'দাদা, চারপাশের মানুষকে দেখে আমার প্রায়ই মনে হত একটা উর্দু শের—'আদম্ নহী হ্যায়, সুরৎ-এ আদম্ বহুৎ হ্যায় ইহাঁ।' ও ধারণা যে কত ভুল তা এখন বুঝতে পারছি। মানুষ ছিল বলেই নারী এগিয়ে চলেছে। মানুষ আছে, তাই নারী মুক্তি পাবে।'

অলকেন্দু হাসলেন, 'এ কথাটা সুনীলকে বলবে, কেমন?'

ছন্দা নিশ্বাস ফেলল। সেটা দেখে লীনা হাসল, 'ছন্দা, সব পুরুষই নারীর জীবনের সব নিংড়ে নেয়। তবু নারী পুরুষকে বিশ্বাস করে। ভীষণ, ভীষণভাবে। বিশ্বাস হারালে জীবনের কি থাকে আর! সুনীলবাবুকে বিশ্বাস করুন। আজ না হোক, কাল উনি নিশ্চয়ই আপনাকে বুঝবেন।'

ছন্দা স্মৃতির রাজ্যে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। না, কোন আনন্দজনক উজ্জ্বল ব্যাপার খুঁজে পেল না যার দিকে পিছন ফিরে তাকান যায়। সে উঠে দাঁড়াল। মনে মনে বলল,— অসম্ভব।

॥ এগার ॥

অলকেন্দ্দু চলে যাবার পর রামসুন্দর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। চুপচাপ। তার মনের অন্ধকার বিবরে কিলবিল করে বেড়াল অসংখ্য সাপের ক্রূরতা। কপালের ভাঁজে ভাঁজে এবং মুখের রেখায় তা অভিব্যক্ত হল, অশান্তভাবে।

রামসুন্দরের মনের এই অস্থিরতা প্রধান আলায় ঢুকে স্থির হল। এবং বলাবাহুল্য তাঁর যে সব জামা-কাপড় অথবা অন্যান্য জিনিসপত্র ছিল সেগুলো নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর লম্বা পায়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে ঠিক করলেন আর মোটেই দেরী করা যুক্তিযুক্ত হবে না। অলকেন্দ্দুকে বুঝিয়ে দিতে হবে সাপের গায়ে পা দিলে ছোবল খেতে হয়। যদি মানদাকে বাগে আনা যায় তাহলে আর ভাবনা নেই। কিন্তু এই চিন্তা ছাপিয়ে রামসুন্দরের মাথায় আর একটা দুর্ভাবনার কাঁটা খচখচ করল। ইতিমধ্যে তিনি বিজলীকে হাসনাবাদ থেকে মোহনপুরের বাড়ি এনেছেন। কাজের লোক হলেও বিজলীকে নিয়ে কানাকানি করছে লোকে। অবশ্য এ নিয়ে অরিত ছাড়া কেউ তাঁকে কোন প্রশ্ন করেনি। কিন্তু প্রপৌত্রের বয়েসী ছেলেছোকরা রাস্তাঘাটে তাঁকে দেখলেই টুইটুই সিটি দেয়, মুখ টিপে হাসে। একথা যদি লীনা শুনে থাকে? যদি পঞ্চায়েতে তাঁকে ডেকে পাঠায়, বলে, এ সব কেলোর কীর্তি এখানে চলবে না। তাহলে? তাহলে কি হবে? রামসুন্দর রাতে বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুমোতে পারলেন না। সারাদিনের ভাবনার ফলে হয়ত স্নায়ুগুলো অশান্ত। কেবল মনে হতে লাগল ওই বিজলীই তাঁকে বিপদে ফেলেছে।

মানদা একই গ্রামের হলেও খানিক দূরে বাড়ি। সে রোজ রামসুন্দরের বাড়ির সামনের সরু গলি দিয়ে অলকেন্দ্দুদের বাড়ি যাতায়াত করে। যেদিন রামসুন্দর গ্রীল ঘেরা বারান্দার চৌখুপিতে সকালে এসে বসেন সেদিন তাকে দেখতে পান। আজ মোটামুটি কাকভোরের সামান্য পরে এসে বসলেন বারান্দায়। সাত পাঁচ ভাবনার মধ্যে তিনি হঠাৎ দেখলেন যে মানদা অলকেন্দ্দুদের বাড়ির দিকে হেঁটে চলেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ডাক দিলেন, 'এই যে মানদা?'

মানদা থমকে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকাল। তারপর তাঁর কাছে এল।

রামসুন্দর বললেন, 'কাজে যাচ্ছ বুঝি?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। একান্তে। এখানে আসা যাবে?'

রামসুন্দরের কথা শুনে, কি রকম সন্দিগ্ধ মুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে, কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল মানদা। তার সব সময়ের সরল চাউনি কেমন যেন জটিল।

মানদার হঠাৎ মনে পড়ে গেল লোকমুখে শোনা বিজলী সম্পর্কে ধোঁয়াটে কথা—যা

সে বিশ্বাস করতে পারেনি। এই বুঝি সেই সুযোগ। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল 'বিজলী কোথায় ?'

রামসুন্দর এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'ভিতরে।'

সে শুনেছে বিজলী আর তার বয়েস প্রায় একই। কুড়ি-একুশ। হঠাৎ একটা সন্দেহ তাকে পেয়ে বসল। বারান্দায় উঠে সে রামসুন্দরের চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'তুমি কি বিজলীকে বে করেচ ?'

রামসুন্দর রহস্যজনক হাসিতে মানদার সন্দিগ্ধ চোখের স্থির তারা নাড়িয়ে দিলেন 'রান্না করলে, ঘর গোছালে বা সাজালে, অবসরে পাশে বসে দুটো কথা বললে, একটু গা হাত-পা টিপে দিলে যদি বউ হয়ে যায়, তাহলে অবশ্য বিয়ে করেছি।'

'অ্যাঁ, বলতেচ কি ! বিজলী এ সব কিছুই করে ?'

'করে।' বিচালি গাদার আবডালে চেয়ারটা দেখিয়ে রামসুন্দর বললেন, 'করতে হয় যাক গে, ওসব কথা। তুমি বসো।'

মানদা বসতে বসতেই বলল, 'কাজে যাতি দেরি হয়ে যাবে। যা বলবা তাড়াতাড়ি বল।'

রামসুন্দর তাঁর চেয়ারটা টেনে মানদার সামনে নিয়ে এলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'তুমি কি জান অলকেন্দুর মা আমার রক্ষিতা ছিলেন ?'

রামসুন্দরের কথা শেষ হওয়া মাত্র ঘরের ভেতর থেকে কে যেন মেয়েলি অথচ গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'অলকেন্দুবাবুর মা কি এজন্যে দায়ী ? দায়ী তুমি আর তোমার এই সমাজ।'

রামসুন্দর চমকে ঘাড় ফেরালেন। তাকাল মানদা। বিজলী দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের জানলায়। তার পটলচেরা চোখে চাপা বিদ্যুৎ।

রামসুন্দর অভিমানী গলায় বললেন, 'তুমি এই কথা বললে ! বলিহারি তোমার বুদ্ধি ! ঘরের কথা কেউ পরকে বলে ?'

বিজলী খিলখিল করে হেসে আর একবার চমকে দিল রামসুন্দরকে, ঘরের কথা ! হ্যাঁ, মেয়েদের তো ঘর দেয় পুরুষই।'

হঠাৎ যেমন ধূমকেতুর মত উদয় হয়েছিল বিজলী, তেমনি হঠাৎই অন্তর্হিত হল।

রামসুন্দর বললেন, 'ওর কথা ছেড়ে দাও। শোন, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

মানদা যেন এতক্ষণ মাঘের কুয়াশার মধ্যে ছিল। তার ভিতর থেকে সে বলল, 'কি কাজ ?'

রামসুন্দর টিকটিকির মত সতর্ক চোখে তাকালেন চারদিকে। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'লীনা মেয়েটা মোটেই ভালো নয়। অর্কের বউ-ছেলে আছে। অথচ তারই সঙ্গে কি নিটিপিটি প্রেম সেদিন ! বিকেলে। প্রধান আলার মধ্যে। ভাগ্যিস চোখে পড়েছিল, তাই রক্ষে। নইলে প্রেমের জল কত দূর গড়াত কে জানে।'

কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না মানদা। সন্দেহের গলায় বলল, 'ধুত্ত ! প্রেম করবে কি ? ওঁরা তো ভাইবোন।'

রামসুন্দর হা-হা করে হেসে উঠেই ব্রেক কষলেন, 'তুমি কিছু জান না। লীনা অর্কের বোন নয়। ওকে অলকেন্দু মানুষ করেছে।'

'হতি পারে। কিন্তু অর্ক দাদাবাবু ক' দিনই বা ছিল। প্রেম করতি সময় লাগে না—' এক মুহূর্ত থেমে জিজ্ঞাসা করল সে, 'তা কাজটা কি ?'

'এ কথাটা অলকেন্দুকে বলতে হবে।'

মানদা জোরে মাথা নাড়ল, 'না, না, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না।'

রামসুন্দর জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝেছেন যে গরীবের কৃতজ্ঞতাবোধ ধনীর চেয়ে অনেক বেশি। একথা মানদা বলবেই। তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন। ঝট করে পকেট থেকে একখানা একশ টাকার নোট বের করে এগিয়ে ধরলেন তার দিকে, 'নাও। কথাটা অলকেন্দুকে বললে আরও পাবে।'

'টাকা ?' সরল মনের প্রভাব কিনা কে জানে, ভীষণ ভয় পেল মানদা। চোখজোড়া চারধারে ঘুরল একবার। পরক্ষণে আনন্দ অথবা লোভ চকচক করে উঠল। একশ টাকা! সে কখনও একসঙ্গে এত টাকা হাতে পায়নি। কিছুক্ষণ দ্বিধা বোধ করল। নেবে? যদি জানাজানি হয়। বাতাস বড় বেইমান। যা থাকে বরাতে। সে খপ্ করে টাকাটা নিল। কিন্তু দাদু—'

কি যে বলতে যাচ্ছিল মানদা। ঠিক সেই সময় অরিত বারান্দায় পা দিল। অরিতকে দেখে ভীষণ অপ্রস্তুত হল। টুক্ করে কথাগুলো গিলে ফেলে মাথা হেঁট করে বেরিয়ে গেল।

উল্টোদিক থেকে অলকেন্দুদের বাড়িমুখো রাস্তায় উঠতে না উঠতেই জিপের ইলেকট্রিক হর্ণ একটু বেশি জোরে সতর্কতা ঘোষণা করল। সে থমকে দাঁড়াতেই তার কানে এল, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

মানদা মুখ তুলে দেখল বিডিও-র জিপ তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। জিপে ড্রাইভার একা। সে বলল, 'কাজে।'

'প্রধানের বাড়ি ?'

'হ্যাঁ।'

'দিদিকে একটা খবর পৌঁছে দেবেন ?'

'কেন দোব না ? কি খবর ?'

'আজ বিকেলে ওঁকে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। বাসায়।'

ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় হোক ড্রাইভার বাসায় শব্দটার উপর জোর দিল। মানদার সন্দিগ্ধ মনে সেই জোর আরও সন্দেহ ছড়িয়ে দিল। আর তখনই রামসুন্দরের কথা তার বুকে গড়াল, অথচ তারই সঙ্গে কি নিটিপিটি প্রেম সেদিন। সে বলল, 'বাসায় ?'

মানদার প্রশ্নই যেন সাহস যোগাল। ড্রাইভার হেসে বলল, 'আমার সাহেব আর প্রধান যে মিলেমিশে এক হতে চাইছেন।'

'মানে ?'

'প্রেম। বিয়ে। সন্তান।'

এই সময় সাধারণত এ রাস্তা দিয়ে খুব কম লোক চলাচল করে। তবু মানদার অস্বস্তি হল। অথচ কি এক দুর্নিবার আকর্ষণ সে অনুভব করছে যে কিছুতেই চলে যেতে পারছে না। এমন কি, বারবার চোখ চলে যাচ্ছে ড্রাইভারের মুখে।

ড্রাইভারের চোখে বিস্ময়। সে যেন ভাবতেই পারছে না তার স্ত্রীর মুখের ছায়া মানদার মুখে ফুটে উঠতে পারে। কেননা এ মাতৃত্বের অভাবজাত কষ্টের ছায়া।

তাদের কোন সন্তান নেই। সে প্রায়ই তার স্ত্রীর মুখে এ ধরনের ছায়া দেখে। স্ত্রী কারও সন্তান দেখলেই তাকে কোলে নিয়ে আদর করে। আর তখনই চোখের কোল ভিজে ওঠে। যদি সে কাছে থাকে, করুণ চোখে তাকায় তার দিকে! যেন বলতে চায়, সে লাঙলের ফলা আরও গভীরে পৌঁছে দিতে পারছে না বলে তার দেহ-জমিতে ফসল ফলছে না। হায়রে নারী! পুরুষের দেওয়া মাতৃত্বের ছোট্ট ঠুলি পরে এই বিরাট পৃথিবীকে দেখা যায় না। সেই জন্যে, সেই জন্যেই এত কষ্ট।

এই নিরিবিলি সকালে, আসলে মানদার দুরন্ত যৌবনসুধা পান করতে করতে ড্রাইভার এত নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে মানদার মুখে তার স্ত্রীর মুখটাই দেখছে শুধু। মানদার কথায় তার ঘোর কাটল, 'এরই নাম নারী-স্বাধীনতা। ছি!'

ড্রাইভার অবাক হয়ে বলল, 'নারী-স্বাধীনতা! কি বলছেন আপনি? এর সঙ্গে নারী-স্বাধীনতার সম্পর্ক কি।'

মানদা দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল চারধারে। তারপর চাপা গলায় বলল, 'অর্কদাদাবাবুর সঙ্গে দিদি পেরেম করেচে। এখন আপনার সাহেবের সঙ্গে করতেচে। মেয়েমানুষ স্বাধীন হলি এমনই হয়। ভাগ্যিস বে হয়নি। তাই রক্ষে। তা না হলি কি হত বলেন তো। অথচ বে হবা বউদের নিজের মত করতি উঠি পড়ি লেগেচে। কি বেশরম!'

বলে ভড়কে-যাওয়া মুখে ফের চারধারে তাকাল। তারপর দ্রুত পায়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে বলল, 'দেরি হয়ে গেচে। চলি।'

তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ড্রাইভার মুখ নামিয়ে ভ্যাবলার মত হাসল। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ঢোলটুকারীর বাঁক থেকে কিছুটা দূরে যখন জিপ, অন্যমনস্কের মত হাঁটতে থাকা সুনীল জিপের শব্দে মুখ তুলল। অকারণ গায়ে পড়ে আলাপ করতে প্রবৃত্ত হল সে। 'এই যে ড্রাইভার সাহেব, কোথায় গিয়েছিলেন?'

ঠিক সময়ে নক্ করেছিল সুনীল। কিন্তু জিপটা জোরে যাচ্ছিল। তার পাশ কাটিয়ে অল্প দূরে গিয়ে চাকা ঘষটে দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভার তার দিকে তাকাল। 'প্রধানের বাড়ি। আপনি?'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'মোহনপুর।'

'প্রধানের বাড়ি?'

'না। অন্যত্র। একটু কাজ আছে।' একটু থেমে সুনীল জিজ্ঞাসা করল, 'এত সকালে? বিডিও পাঠিয়েছিলেন?'

মাঝে মাঝেই সুনীল আলতুফালতু ইস্যু নিয়ে কথার বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেয় বিডিও-কে। তুখোড় পলিটিসিয়ান। যদি বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়। বলা তো যায় না। তা নিয়ে রাজনীতি করবেই। সে বলল, 'না। আমার নিজের কাজেই গিয়েছিলাম।'

সুনীল ভুরু কুঁচকে সরু চোখে তার দিকে তাকাল। সে ঘাবড়ে গেল। কি জানি এখুনি পুলিশি ইনটারোগেশন শুরু করে কিনা! সুতরাং যঃ পলায়তি স জীবতি। তার জিপ সুনীলকে চমক দিয়ে হুশ্ করে বেরিয়ে গেল।

সুনীল ডিঙি মেরে উন্নত মস্তকে ক' মুহূর্ত অপসৃয়মান জিপটাকে দেখল। তারপর নিজের মনেই নীরবে এক দফা হেসে একটা সিগারেট ধরাল।

পথ চলতে চলতে সুনীলের হঠাৎ মনে হল সে পরাজিত। বিধ্বস্ত। দুটো রণাঙ্গণে। সংসার আর রাজনীতি। যদি প্রথমেই স্ত্রীর বিষদাঁত না ভাঙা হয় সেই বিষে এক সময় নীল হয় দেহ। এ কথা জেনেও সে ছন্দার বিষদাঁত ভাঙেনি। নারীমুক্তির রঙচঙে ফানুস উড়িয়ে লীনা সমাজের শান্ত বাতাসে ঝড়ের ভীষণতা এনে লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাইছে এই সুন্দর সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা। একথা মাঠে ময়দানে বলেও সে খুব বেশি ফায়দা তুলতে পারেনি।

বাড়ি থেকে বের হবার আগে সুনীল তার পরিকল্পনা আর একবার মনে মনে ছকে নিয়েছিল। তার সামর্থ্যের শীর্ণ চেহারা রামসুন্দরের অভিজ্ঞতার খাদ্যরসে পরিবর্তন করতে পারলেই নারী-আন্দোলনের উপর একটা বিরাট আঘাত হানবে। এখন, এই মুহূর্তে, সেই মানসিক দৃঢ়তা নেই তার। কি এক আবেশে তার পা মাটিতে আটকে যাচ্ছে। সে কি পিছনে হাঁটছে? ছন্দা তার স্ত্রী। কিন্তু তার দেহটা একটা রক্তমাংসের খোল ছাড়া আর কিছু নয়। সেই খোলটা নিরাপদে রাখতে সে কি তার চেতনাকে সনাতন বিশ্বাসের কাছে বিক্রি করতে যাচ্ছে? ইতিহাস বলে, স্বাধীনতা আর অগ্রগতিকে টেনে রাখার চেষ্টা করলে শিকল একদিন ছিঁড়বেই। অবশ্য এই মানসিক চাঞ্চল্য কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর হল। মনকে বোঝাল যে মানুষ ভূতের উপদ্রবে ন্যায়নীতি এখন পঞ্চভূতে লীন। এখন নীতিহীনতাই নীতি।

সে দ্রুত পায়ে চলে এল রামসুন্দরের বাড়ি। অরিতই প্রথমে দেখল তাকে। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে, কাপটা মেঝেতে রেখে, সে বলল, 'আরে, সুনীলবাবু! কি ব্যাপার? আসুন।'

সে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে দেখল রামসুন্দর আর অরিত পাশাপাশি চেয়ারে বসে। সে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বারান্দায় উঠে একমাত্র খালি চেয়ারটা টেনে নিয়ে রামসুন্দরের সামনে বসে পড়ল।

এবার রামসুন্দর বললেন, 'এ পথ তো প্রায় ভুলেই গেছ। হঠাৎ কি মনে করে?'

সুনীল প্রথমে কিছু সময় চুপ করে থাকল। অরিতকে দেখল। মুখের চেহারা একটু আগে সামান্য পাল্টে গিয়েছিল, এখন স্বাভাবিক। যে কথা সে বলতে এসেছে সে কথা অরিতের সামনে বলবে কি বলবে না এই চিন্তার পাশাপাশি আর একটা চিন্তা এল।

অরিত যুবক। অবিবাহিত। তার সামনে স্ত্রী, সোনালি স্বপ্ন। সে কি চাইবে, স্বাধীন যৌনতা মেনে নিয়ে, সেই স্বপ্ন অনভ্রান্ত জীবনের অনিবার্য নিষ্পেষণে মেরে, জীবনের সকল মাধুর্যের দুয়ার রুদ্ধ করতে? এ কি কোন পুরুষ চায়? অরিত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়ই সামাজিক সহযোগী। সে আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি প্রাচীন। অভিজ্ঞ। এই সমাজের প্রতিভূ। মেয়েরা আন্দোলনে মেতে উঠেছে। সমাজটা যে উচ্ছন্নে যায়। কিছু করবে না?'

রামসুন্দর বললেন, 'আমার তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। এখন সেই সচ্চিদানন্দের সঙ্গে মিলিত হবার অপেক্ষায় আছি। এ সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তোমাদের, নিজেদের স্বার্থেই।'

অরিত জোরে হেসে উঠল, 'সচ্চিদানন্দ। যাঃ বাবা, এ যে দেখছি ভূতের মুখে রাম নাম। গুরু, মেয়েমানুষের চিন্তা ছেড়ে এখন কি অপার্থিব চিন্তা করছ।'

সুনীল অমনি মুখ টিপে হাসল। কিন্তু রামসুন্দর তা লক্ষ্য করলেন না। ইতিমধ্যে তিনি চেয়ারেই যোগাসীনের মত বসে চোখ বুজেছেন।

সুনীল থ'। অরিত হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সুনীল চোখ টিপে অরিতের কাছে জানতে চাইল, কি ব্যাপার!

সে নিজেই বুঝতে পারছে না কিছু। কি জবাব দেবে। নিচু গলাতেই সে রামসুন্দরকে বলল, 'গুরু, কি হল?'

রামসুন্দর নির্বিকার। ওরা কেউই আর কোন কথা বলতে সাহস করছে না যেন। এই সময় ওদের বিস্মিত চোখের সামনে চা ভর্তি কাপ তুলে ধরে বিজলী বলল, 'আপনাদের চা।'

সুনীল বিনম্র গলায় বলল, 'আবার চা কেন?'

অরিত বলল, 'এই তো চা খেলাম।'

সুনীলের কথায় কান দিল না বিজলী। মুখে চুটকি হাসি ফুটিয়ে অরিতকে বলল, 'আর একটু খান।'

বলে চোখ সরাতেই রামসুন্দরের উপর চোখ পড়ল। ফিক করে হেসে অরিতের দিকে ফের তাকিয়ে বলল, 'অরিতদা, কি হয়েছে?'

অরিত অসহায়ভাবে তাকাল ওর দিকে। ভাবটা এই, বিজলীর মত সেও অন্ধকারে।

বিজলী এবার রামসুন্দরের মুখটা খুঁটিয়ে দেখল। তারপর মুখ ভেংচে প্রায় ধমকের সুরে বলল, 'বুড়ো বয়েসে ভীমরতি ধরেছে। দেখলে গা জ্বলে। চোখ খোল। ভেবেছ চোখ বুজে অন্য মেয়েমানুষের কথা ভাবলে আমি বুঝতে পারব না?'

ছেলেমানুষী কথার মোড়কে পুরে সংশয়টা তুলে ধরলেও বিজলী কিন্তু জানতে পারল না এই সামান্য কথা অরিতের কাছে কি গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে গেছে। এখানে বসেই যে কাহিনী রামসুন্দরের কাছে শুনেছিল এবং অবিশ্বাসের শক্ত মাটিতে চাপা দিয়েছিল তা পোস্টমর্টেমের জন্যে তুলে আনতে হয়েছে। নিভাননী নেই। বাড়িটা কেমন নিষ্প্রাণ, ফাঁকা-ফাঁকা। বুকটা কেমন খালি-খালি। সেই শূন্যতা পূরণ করতেই

একদিন বিকেলে হঠাৎ তিনি নাতনীর বয়েসী বিজলীকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। স্পর্শ সুখেই কেঁপে উঠেছিলেন। অমনি মনে হয়েছিল তাঁর জীবনটা এখনও ফুরিয়ে যায়নি। বিড়ির শেষ টানের মত এখনও উপভোগ করা যায়। তিনি আবেগরুদ্ধ গলায় বলেছিলেন, 'বিজলী, আমার সংসার কে দেখবে? তুমি বরং আমার সঙ্গে চল। যে কটা দিন বেঁচে থাকি একটু সেবাটেবা করবে। অবশ্য এর বিনিময়ে তুমি অনেক কিছুই পাবে। এই ধর, দু'খানা বাড়ি, দশ বিঘে জমি আর কিছু ব্যাঙ্ক ব্যালান্স।'

বিজলী নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে সতীপনা দেখায়নি। বরং তাঁর বুকে মাথা রেখে বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে থাকতে আমারও ইচ্ছে করে। কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস নেই। আগে সব কিছু আমার নামে লিখে দাও, তারপর যাব।'

রামসুন্দর বিজলীর দেহে অনাঘ্রাত যৌবনের কি এক গন্ধ পেয়েছিলেন। কত বছর পেরিয়ে গেছে, ফুলশয্যার রাতে বউয়ের স্তনসন্ধিতে মুখ রেখে পেয়েছিলেন, আর এই। সেই গন্ধ স্মৃতিতে নেই। এই গন্ধে ভোমরার মত মাতোয়ারা হয়েছিলেন। এবং একটুও না ভেবে সব কিছু লিখে দিয়েছিলেন।

এবার বিশ্বাসের সহজ বাতাসে বুক ভরে উঠতেই অরিত বিজলীকে খুঁটিয়ে দেখল। আগেও দেখেছে। এই দেখার সঙ্গে সেই দেখার বিস্তর ফারাক। বিজলী ঝরনা কিংবা কবিতা নয়, দীঘল কালো দিঘি। বর্ণ বিচার না করলে অনাবিল সুখানুভূতিতে ডুব দেওয়া যায়।

অরিত কিছু বলছে না। সুনীলের কলেজ আছে। দেরি হয়ে যাবে। কিছুটা ব্যস্ততা, কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে সে বিজলীকে বলল, 'মা, তুমি ভিতরে যাও। আমরা দেখছি।'

বিজলী সুনীলের দিকে তাকাল। তারপর কি ভাবল কে জানে! মাথা নিচু করে চলে গেল।

বিজলী যখন সুনীলের দিকে তাকিয়েছিল তখন এক চোখ সামান্য খুলে রামসুন্দর দেখেছিলেন তাকে। সে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই তিনি সুনীলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহাহা কি সহজেই না মা বলে ডাকলে! আমি আবার যাকে তাকে মা.বলে ডাকতে পারি না।'

অরিত বলল, 'পারবে কেন? রত্নাকর দস্যুর মত তোমার পাপ যে গলা পর্যন্ত উঠেছে।'

অরিতের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন তিনি। তারপর হঠাৎ গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, 'রত্নাকর দস্যু বা আমি কে! সব তো তিনিই করাচ্ছেন।' বলেই গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন,

সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

দু' ছত্র গেয়েই রামসুন্দর বললেন, 'সেই সচ্চিদানন্দের মায়াতে আমি সাধারণ মানুষ। সংসারী। মানুষের মনের বাস সপ্তভূমি। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, কপাল বা

ভুরু এবং সহস্রার। কিন্তু সংসারী মানুষের মন লিঙ্গ, গুহ্য আর নাভিতে। আসক্তি কামিনী-কাঞ্চনে। তাহলে কিসের পাপ ?'

সুনীলের খারাপ লাগছে। ভীষণ একটা অস্বস্তি। ঠাকুর দেবতা নিয়ে কেউ মস্করা করলে, ভিতরে ভিতরে ভীষণ কুঁকড়ে যায়। তার ভগবদ্ভক্তি প্রবল। সে মনে করে, সংসারে মনের বাজে খরচ হয়, ক্ষতি হয়। সেই ক্ষতির খানিকটা পূরণ হয় যদি ঈশ্বরের পথে থাকা যায়। তার সেই বিশ্বাসে কেউ আঘাত করবে কেন ? রামসুন্দরের চরিত্র একবারও মনে হল না, ছিছি, চলে এল। মাথা নিচু করে, সুযোগ পেলেই উঠে পড়বে এই চিন্তা নিয়ে বসে থাকল।

কিন্তু অরিত যাত্রার ঢঙে হা হা করে হেসে উঠল। বলল, 'গুরু, সত্যিই তুমি গুরু। তুলনাহীন। একটু পদধূলি দাও।'

অরিত পায়ের ধুলো নিয়ে সোজা হয়ে বসতেই রামসুন্দর বললেন, 'ঠাট্টা করছ ?'

অরিতের গলায় এবার ভিন্ন সুর। 'ছি ছি, কি যে বল না—আমি তো জানি অর্বাচীনের যুক্তির অভাব হয় না।'

'অর্বাচীন।' রামসুন্দর হেঁ হেঁ করে হাসলেন, 'জান এতক্ষণ চোখ বুজে কি ভাবছিলাম ?'

কড়া স্বরে অরিত বলল, 'কেন জানব না ? তোমার তো ভাবনা একটাই, মেয়েমানুষ।'

ভুরু কুঁচকে সময় নিয়ে ঝানু রাজনীতিকের মত রামসুন্দর বললেন, 'রাইট। কে জান সেই মেয়েমানুষ ? তোমাদের প্রধান। লীনা।'

সুনীলের আনত চোখজোড়া এবার রামসুন্দরের মুখে থমকাল। অরিতের চোখে কৌতূহল আর বিস্ময় মিলেমিশে একাকার। সে বলল, 'কি ব্যাপার গুরু ? কেমন রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি ?'

রামসুন্দর বিচিত্র হেসে বললেন, 'তুমি লীনার পাশে গুনগুন করে মরছ। ওদিকে গোপনে মধু খাচ্ছে যে অর্ক।'

চড়াৎ করে বাজ পড়ল। আচমকা। ভিতরে ভিতরে বিপর্যস্ত হয়ে সে অসহায়ের মত চিৎকার করে উঠল, 'গুরু, কি বলছ এসব।'

সুনীল এমন উদ্ভট কথা শুনে, রামসুন্দরকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলে উঠল, 'ওরা তো জেঠতুতো না খুড়তুতো ভাইবোন।'

এ ধরনের প্রশ্নের সামনে পড়ে একটু আগে বিহ্বল হয়নি রামসুন্দর। কিন্তু এখন থমকে গেলেন। সম্ভবত সুরমার কথা মনে পড়তেই এই ইতস্তত ভাব। হঠাৎ ঘেরির জলে পানকৌড়ির জলকেলি দেখে চমৎকৃত লীনার ডাকে, রামসুন্দরের সঙ্গে কথা থামিয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলেন সুরমা। তার ছেলেমানুষী উচ্ছ্বলতার বিনিময়ে এক টুকরো মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে চোখ ফেরাতেই রামসুন্দর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মেয়েটা কে বৌমা ?'

সুরমা বলেছিলেন, 'আমার পালিতা কন্যা। কিন্তু ও আমার বুক জুড়ে আছে। নিজের মেয়ে হলেও বোধহয় এতটা ভালবাসতে পারতাম না।'

পরক্ষণেই বলেছিলেন, ও খুব অভিমানী। কষ্ট পাবে বলে আমি সবার কাছে বলেছি, ও অর্কের খুড়তুতো বোন। আপনিও সবার কাছে এই কথা বলবেন, কেমন?'

রামসুন্দর অনুগত ভৃত্যের মত মাথা নেড়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে অবশ্য হেঁয়ালি করে বললেন, 'চাচা আপন চাচী পর, চাচীর মেয়ে বিয়ে কর। সুতরাং ওরা প্রেম করতে পারে। তা করুক। কিন্তু আমার শিষ্যকে খেলাচ্ছে লীনা। ওকে কিছুতেই ছাড়তে পারি না।'

সুনীলের ড্যাবডেবে চোখে খুশি ঝিলিক মারল, 'কি করবেন?'

রামসুন্দর হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন, 'সত্যিই শুনতে চাও।'

সুনীল জোরে জোরে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। অরিত উৎকর্ণ হল। রামসুন্দর দরজার দিকে এক পলক তাকালেন। বোধহয় বিজলী থেকে সাবধান হতে। তারপর বললেন, 'প্রথমে অরিতকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেব ওকে। রাজি হলে বহুত আচ্ছা। না হলে—'

রামসুন্দর কথা শেষ না করেই চুপ করে গেলেন। এই ভাষাহীন নীরবতার মধ্যে নিজেদের ছড়িয়ে অরিত আর সুনীল আচমকাই যেন উপলব্ধি করল তাদের সঙ্গে রামসুন্দরের নাড়ির যোগ অবিচ্ছেদ্য। তাই, তাদের হৃদয়ের স্পন্দনই তার রক্তধারার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার জন্যে অশান্ত।

॥ বার ॥

টাকি রোড থেকে সামান্য ভিতরে একটা ছোট্ট একতলা বাড়ির তিনটে ঘর নিয়ে থাকে সুব্রত। মাঝে মাঝেই এ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে লীনা। উদাসীন চোখে দেখেছে। জরিপ করেনি।

ফাল্গুনের আকাশে অপরাহ্ণের আলো লেগে রয়েছে। প্রাণজুড়ান হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। প্রায় আধঘণ্টার হাঁটাপথ হলেও কি যেন ভেবে গাড়িতে চড়ল না। হাঁটতে হাঁটতেই চলে এল।

দরজা খোলা দেখেও হুট করে ভিতরে গেল না। থমকে দাঁড়াল, দরজার সামনেই। ভাবল, সুব্রত যদি এখনও অফিস থেকে না ফিরে থাকে। অথবা নিতান্ত অপরিচিতের মত কারও সওয়াল জবাব টানতে হয়। এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব হয়ত আরও কিছু সময় খেয়ে ফেলত যদি না সুব্রত তাকে দেখতে পেয়ে ব্যস্তভাবে বলত, 'আরে, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এসো।'

লীনা চমকে উঠেই হেসে ফেলল। এই দ্বিধা তো অকারণ। তাকে আসতে বলে বাসায় থাকবে না সুব্রত, একি হয়! দেখল তাকে। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। একে রাশিয়ান রঙ, তায় দুধসাদা পোশাক। দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে।

সে ঘরে ঢুকল। বৈঠকীঘর। ছিমছাম, রুচিসম্মত আসবাবে সাজানো-গোছানো। সে সোফাতে বসতেই টেলিফোন বেজে উঠল পাশের ঘরে।

'এক মিনিট।' বলে পর্দা সরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে গেল সুব্রত।

লীনার ভারী কৌতূহল হল, পাশের ঘরটা দেখে আসে। পরক্ষণে অবশ্য নিজেকে সংযত করল। মনে হল, এভাবে কর্মে ও চিন্তায় মেয়েরা সেন্ট পার্সেন্ট কনভেনশানাল হয়ে সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। এখন হতে হবে আনকনভেনশানাল। আগে কেরিয়ার, পরে বিয়ে। বিয়ে কোনমতেই অবশ্য করণীয় কাজ হওয়া উচিত নয়।

এক মিনিট নয়, চার মিনিট পরে ফিরে এল সুব্রত। বলল, 'চা খাবে?'

লীনা তার মুখের দিকে তাকাল। 'কে করবে চা? তুমি না কাজের লোক আছে?'

'কাজের লোক এখনও আসেনি। আমিই করব।'

'থাক। সোনার বরন কালি হয়ে যাবে। তুমি বসো। বলো কি জন্যে ডেকেছ?'

সুব্রত তার সামনে, হাত তিনেক দূরত্বে, গদিমোড়া চেয়ারে বসে বলল, 'এখুনি শুনতে চাও? কেন, ব্যস্ত?'

'না না, তেমন তাড়া নেই।'

'তাহলে বসো—আড্ডা মারি খানিকক্ষণ।'

লীনা একটু অবাক হয়ে বলল, 'আড্ডা মারব?'

'হোয়াই নট? পৃথিবী বদলাচ্ছে, আমরা বদলাব না?'

লীনা হেসে ফেলল। 'একটু বেহিসেবী হতে চাও?'

'আপত্তি আছে?'

'আছে বৈকি। তুমি জীবনটাকে নিয়ে খেলা করতে পার। সে অধিকার সমাজ তোমায় দিয়েছে। কিন্তু আমাকে কি দিয়েছে? মেয়েদের জীবন শুধু সমাজের আঘাত প্রতিহত করার নীরব দেয়াল, যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায় না।'

'প্লিজ, নারীবাদীর চশমাটা এখন, এই মুহূর্তে, চোখ থেকে খুলে ফেল।'

'সুব্রত, আমাকে দুর্বল করে দিও না। দুর্বলতা জলের মত, একবার ফাঁক পেলে মনের বাঁধ ভেঙে দেবে।'

লীনার ব্যক্তিত্বের মুখোশপরা চেহারাটা দেখেছে সুব্রত। আজ, এখন, দেখছে যেন এক চিরন্তন ভারতীয় নারী যার একমাত্র রক্ষামন্ত্র কান্না। কি যে গভীর আনন্দ, কি যে গভীর ভালবাসা এই দেখার গভীরে। কি বলবে! ইচ্ছে হল, বলিষ্ঠ দু'খানা হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—

O woman! Lovely woman! Nature made thee
To temper man: We had been brutes without you.

শেষ পর্যন্ত পারল না সে। নিষ্ফল আবেগে কিছুক্ষণ ছটফট করল, হাত কামড়াল। তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'লীনা, আই লাভ ইউ।'

লীনার চোখে মুখে একটা তিরতিরে হাসির অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। বলল, 'থেমে গেলে কেন? এর পরের কথাটা বলো, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

'চাই-ই তো! বিয়ে করতে চাওয়াটা কি অন্যায়?'

থমকে গেল লীনা। সত্যিই তো, বিয়ে-ই তো সব। যেমন পূর্ণতা তেমনি শূন্যতা। যাই হোক সুব্রত লোভনীয় পাত্র। যে সব মা-বাবা এখনও বোঝেননি যে মেয়েদের সম্পর্কে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে, মেয়েরা কোনমতেই বোঝা নয়, ছেলেদের মতই সম্পদ, তাঁরা পেলে বর্তে যাবেন। সে অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'কি যে বল না! কিসের অন্যায়? সত্যিই তো তোমার একটা বউ দরকার।'

এ কথায় সুব্রত একটু খুশি হয়ে বলে উঠল, 'আমার চেয়ে মায়ের দরকার বেশি। বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। হঠাৎ অসহায়ের মত তোমার কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, তোমায় আমি ভালবাসি। ব্যস, সেই যে লেগেছেন ছিনে জোঁকের মত, এখনও ছাড়েননি। এখুনি তো ফোন করেছিলেন। জানতে চাইলেন দিনক্ষণ স্থির করেছি কিনা?'

'দিনক্ষণ! কিসের দিনক্ষণ?'

'তোমাকে দেখতে চান। তাইতো তোমাকে ডেকেছি। বলো, কবে নিয়ে আসব মাকে?'

'অ্যাঁ! সত্যিই তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও?' লীনা আশ্চর্য হবার ভান করে বলল।

'ইয়ার্কি কর না। প্লিজ, বি সিরিয়াস।'

লীনা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল। এতক্ষণ যে সহজ ছিল, প্রায় মনের মানুষের মত কথা বলছিল, সে এখন বিষণ্ন, গম্ভীর। সুব্রত বলল, 'রাগ করলে?'

লীনা এবার সটান সুব্রতের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন হাসল। বলতে চাইল, সে বেরিয়া সম্প্রদায়ের আদিবাসী মেয়ে। এই সমাজের চোখে তার মা বেশ্যা। তার সঙ্গে সুব্রতের বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু কেন যেন বলতে পারল না। বলল, 'রাগটাগ নয়। ভাবছি হঠাৎ এ সিদ্ধান্ত নিলে কেন?'

'তোমাকে পছন্দ হয়েছে, তাই।'

'তুমি আমার সম্পর্কে কতটুকু জান?' লীনা কেমন যেন অন্যমনস্ক স্বরে বলে উঠল।

সুব্রত একটু ঢিমে গলায় বলল, 'তোমার যদি কোন করুণ অতীত থাকে, থাকুক। তা জানতে চাই না। তোমার বর্তমানই যথেষ্ট। এখন তারিখটা বল দেখি।'

এই নাছোড় মনোভাবে লীনা স্তম্ভিত হয়ে সুব্রতের মুখের দিকে তাকাল। লীনার চোখে বিস্ময় দেখে সুব্রত বলল, 'অবাক হচ্ছ কেন? আমার কথার সঙ্গে তোমার ধারণা খাপ খাচ্ছে না বুঝি?'

'একথা সব পুরুষই প্রথমে বলে। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে সেই অতীত উঠে আসে কথায় কথায়। যাকগে, তা সম্বন্ধ-করা বিয়ে কেন? জান এই বিয়েতে মেয়েদের ব্যক্তিত্বের অবমূল্যায়ন হয়, আত্মমর্যাদার কিছুই আর থাকে না?'

'এটা সম্বন্ধ করে বিয়ে হল কিভাবে! আমি তোমাকে ভালবাসি। ধর, এটা ভালবাসা-বিয়ে।'

'সুব্রত, আমাদের সমাজে অষ্টবিধ বিবাহ প্রচলিত আছে। কোন বিয়েই কিন্তু কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। সব বিয়ের পরই ভালবাসা জীবনের এক দরজা দিয়ে ঢোকে, অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তুমি এক কাজ কর। কয়েকটা বিষয়ে তোমার মত আমাকে জানাও। ইন ব্লাক এণ্ড হোয়াইট। যদি তোমার মতের সঙ্গে আমার মত মোটামুটি একই হয়, তাহলে একটা তারিখের কথা ভেবে দেখব।'

'তুমি কি মুক্ত বিয়ের কথা বলছ?'

লীনা মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, ভাবতে ভাবতে। কিন্তু জবাব দিল না কথার। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল পরবর্তী সংলাপের অপেক্ষায়।

'আমি তো এ বিয়ে সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। পরিষ্কার করে বল তো বিষয়গুলো কি কি?'

লীনা বলল, ''এই ধর, ছোট পরিবার বলতে তুমি কি বোঝ? পণ দেওয়া-নেওয়া উচিত কিনা? সংসারে শাশুড়ির ভূমিকা কি হওয়া উচিত? শ্বশুরেরই বা কি? স্বামী-স্ত্রীর স্বাধীন যৌনতা থাকা উচিত কিনা! সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী কি ছোট বড়? ব্যক্তিগত সেবাবৃত্তি ছেড়ে সামাজিক উৎপাদনের কাজে মেয়েদের সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ করা ঠিক কিনা! সংসার শুধু মেয়ের নয়, পুরুষেরও। তাই গৃহকর্মে পুরুষের কতটা ভূমিকা থাকা উচিত? দেখা যায়, বিশ-ত্রিশ বছর সংসার করার পরে প্রায় সব স্ত্রীর জীবনে অপূর্ণতার ক্ষোভ প্রবল। এর জন্যে কে দায়ী? বিয়ের পর স্বামীর সম্পত্তির উপর স্ত্রীর অধিকার জন্মায় না, অথচ স্ত্রীর আয়ের উপর স্বামীর পূর্ণ অধিকার। এ ধরনের সামাজিক অসাম্য থাকা উচিত কি না? তুমি কি চাও তোমার স্ত্রী সিগারেট কিংবা মদ খায়? তুমি কি বিশ্বাস কর, প্রচলিত ও আধুনিক ধর্মই নারীমুক্তির প্রধান অন্তরায়?'

প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু দু-এক কথায় দিতে হবে। নইলে তোমার-আমার মতের মিল আছে কিনা বুঝতে অসুবিধে হবে।'

'একটা কথা বলব।' সুব্রত বলল।

'বলো না, বলো।'

'কিছু মনে করবে না তো?'

'না না। বলো।'

'কোন বিষয়ে দুজনের মতের মিল হওয়া কি এতই সহজ। রুচি আর সংস্কৃতির একীভূত ধারণার ফলে মতের মিল গড়ে ওঠে। যে সব নারী-পুরুষের হৃদয় আবেগসম-উচ্চতায় পৌঁছায়, তাদেরই কেবল রুচি আর সংস্কৃতি এক, অভিন্ন। আমরা যদি সে ধরনের নারী-পুরুষ না হই? তুমি কি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছ?'

লীনা অবাক হয়ে তাকাল। 'সুব্রত, তুমি কি সেবাদাসী চাও?'

অপ্রস্তুত হল সুব্রত। 'না না। সেবাদাসী চাই না। আমি চাই স্ত্রী।'

লীনা বুঝতে পারল সুব্রত অন্তর্বাস্তর মধ্যে পড়ে সেবাদাসী আর স্ত্রী যে এই সমাজে সমার্থক তা বুঝে উঠতে পারেনি। কিংবা বুঝেও না বোঝার ভান করেছে।

সে মিটিমিটি হাসতে বলল, 'সেই স্ত্রী হিসেবে তো আমাকেই চাও? কিন্তু পারবে তো আমাকে যৌন-স্বাধীনতা দিতে?'

সুব্রত ভীষণ চমকে উঠে লীনার দিকে তাকাল সন্দিগ্ধ চোখে। একি অদ্ভুত কথা! এই সমাজে স্বাধীন যৌনতা! নাকি এটাও এড়িয়ে যাবার এক মোক্ষম চাল।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠল, 'কোন স্বামী তার স্ত্রীকে যৌন-স্বাধীনতা দিতে চায়?'

'আমি জানি, কেউ চায় না। মুক্ত বিয়ে শাস্ত্রধর্মহীন রুচি আর সংস্কৃতির চূড়ান্ত হৃদয়বাদী বিয়ে। এ বিয়েতে স্বামী-স্ত্রী হবার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ যদি পরস্পর পরস্পরকে রুচি সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু একজন অন্যজনকে নিজের সম্পত্তি না ভাবে, তাহলে দুজনেই প্রকৃত যৌন-স্বাধীনতা ভোগ করে। মার্ক্স বলেছেন, নারী-পুরুষের আবেগতরঙ্গের সাম্যের উপর নির্ভর করে ভালবাসার সঙ্গীত। হৃদয়ের আবেগে সাম্য না থাকলে ভালবাসাবাসি উচিত নয়। এমনকি বিয়েও। হৃদয়াবেগ আমরা সম-উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারি না। পারি না মতের মিলের স্বরতান ছুঁয়ে ছুঁয়ে মনের মিলে পৌঁছতে?'

সুব্রতের মনে হল এ উদ্ভট পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়। এতে সাড়া দেওয়া অনুচিত। কিন্তু না। পরক্ষণে তার মনে হল, ভালবাসার জন্যে কিছু ছাড়তে হয়। নইলে ভালবাসা ভালবাসা হয়ে ওঠে না। দেখা যাক না, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

'হয়ত পারি! হয়ত পারি না! তা, সে যাই হোক, চেষ্টা করে দেখব।'

'প্রোমিস।' সুব্রতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল লীনা।

'প্রোমিস!' একটু ভেবে সুব্রত লীনার হাতের উপর হাত রাখল।

॥ তের ॥

অরিতকে কখনও এমন গম্ভীর মুখে বসে থাকতে দেখেনি লীনা। অরিত বরাবরই বাচাল স্বভাবের, হুটহাট চলে আসে তার টেবিলের ওপারে চেয়ারে, স-হাসি মুখে দরকারী অ-দরকারী কত কি কথা।

যখন কেউ থাকে না, শুধু তারা দুজন, তখন এই বাচালতা দেখা যায় না। যৌবন-রোগে ধরে, বেহায়া দৃষ্টিতে লীনার দিকে তাকিয়ে থাকে। সমানে। প্রথম প্রথম লীনা একটু নাক সিঁটকে জবাব দিয়েছিল এই বেহায়াপনার। কাজ হয়নি। ভেবেছিল দুকথা শুনিয়ে দেবে। তা হয়নি। পঞ্চায়েতের কাজকর্মে অনভিজ্ঞ লীনাকে অভিজ্ঞ অরিতের পরামর্শ নিতে তার কাছে যেতে হয়েছে বারবার। প্রয়োজনে দূরত্ব কমেছে। কখন যেন আপনি থেকে তুমি-তে চলে এসেছে তারা। কি আর করা, এখন লীনা

এই দৃষ্টির মোকাবিলা করে কখনও ঔদাসীন্য দেখিয়ে, কখনও দেঁতো হাসি উপহার দিয়ে।

আজ সেই অরিতের মুখটা কেমন হাঁড়ি হাঁড়ি। কি হয়েছে অরিতের? কোন অশান্তি? স্থির চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকল। অরিত একটু তেরচা হয়ে বসে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। লীনা দেখতে পাচ্ছে শুধু তার প্রোফাইল। তাই-ই দেখছে। কিছু একটা বের করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না।

পাশের ঘরে সুহাস বিশ্বাস। পঞ্চায়েত-সচিব। তিনি কাজে ব্যস্ত। এ-ঘরে তারা দুজন। আপাতত কারও মুখে রা নেই। এই নৈঃশব্দের মুখে আদিম নির্জনতা ভাসে। হঠাৎ ফোঁস করে একটা ভারি নিশ্বাস পতনের শব্দ হল। এটা যে অরিতের বুক-ফাটা লম্বা শ্বাস, তা ধরতে পেরেই সে অরিতের টেবিলের উল্টোদিকে চেয়ারে বসে বলল, 'অরিত এনি প্রব্লেম?'

অরিত তার দিকে তাকাল, কিন্তু চুপ। মনে মনে ভেবে নিচ্ছে যেন, কিছু একটা।

হঠাৎ বলল, 'আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি। এবং তোমাকেই। তুমি রাজি তো?'

লীনা হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকল একটু। এই হাসির মধ্য দিয়ে সে যেন নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চাইল।

গায়ে-পড়া অরিত যে এ প্রস্তাব দেবে একদিন, তা সে জানত। শুধু যা জানত না তা হল সে দিনটা কত দূরে। সে নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিল। এই মুহূর্তে সে সুহাসের দিকে তাকাল, বোধহয় তিনি শুনতে পেয়েছেন কিনা বুঝতে চেষ্টা করল। তিনি তেমনি ব্যস্ত। কি যেন লিখছেন।

সে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'প্লিজ, একথা এখন থাক। যখন আমরা দুজন থাকব, তখন—'

ততক্ষণে অরিতের বুকের ভিতর রামসুন্দরের যে কথা একটু আগে তাথৈ তাথৈ নৃত্য শুরু করেছিল তার লয় বিলম্বিত থেকে দ্রুত হয়েছে। সেই তাণ্ডবে লীনাকে বিয়ে করার সোনালী স্বপ্ন ভেঙে যায় আর কি! উঃ, কি সাংঘাতিক মেয়ে! চুমু খাচ্ছে অর্কের মুখে। খেলাচ্ছে তাকে। এই মুহূর্তে তার মনে একটাই চিন্তা, যেভাবেই হোক কথা কাড়িয়ে নিতেই হবে।

সে বেআক্কেলের মত লীনার কথা চিৎকার করেই থামিয়ে দিল, 'না এখনই বলতে হবে।'

সেই চিৎকারে চমকে মুখ তুললেন সুহাস। লীনা অপ্রস্তুত চোখে সুহাসের দিকে তাকাল। চোখাচোখি। লীনা চোখ নামিয়ে নিতেই সুহাস চশমা খুলে যেন দূরের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবলেন। তারপর চশমা পরে অলস মন্থর পায়ে তার কাছে এলেন, 'আমাকে কিছু বলছ মা?'

অফিসে যখন থাকেন সুহাস, দেখেটেখে যা বুঝেছে লীনা—বেশ দার্শনিক গোছের মানুষ। কি আর মাইনে পান! কেউ সাহায্যের আবেদন নিয়ে এলে নিজে তো দান করেনই, লীনাকেও বলেন, ওকে একটা সার্টিফিকেট লিখে দাও মা। উনি দুঃস্থ,

অসহায়। আজকাল আর কেউ সাহায্য করতে চায় না। ভাবে অপব্যয়। আসলে সত্যিকারের মানুষ যেন হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষের জন্যে যে মানুষের জন্ম এ কথা কেউ ভাবে না। তোমার সার্টিফিকেটটা দেখালে যদি দু-পয়সা পায়! কাজে যা একটু গাফিলতি তা আসলে অন্যমনস্কতার কারণে। এমন মানুষকে কার না ভাল লাগে! কিন্তু সেই ভাল-লাগা মন্দ-লাগা হয়ে যায়, যখন মনে হয় একপাল ছেলেপুলের বাপ এই লোকটা।

একদিন সে সোজাসুজি বলেছিল, 'বউকে একটু কম ভালবাসতে পারেন না?'

'কি কথা যে বল মা! বউকে আর ভালবাসতে পারলাম কই। যা মাইনে পাই তার দান-ধ্যান আর গুষ্টির পেট ভরাতে চলে যায়। বউকে ভালবেসে যে একখানা গয়না গড়িয়ে দেব কিংবা একখানা শাড়ি কিনে দেব তা আর হয় না।'

'আমি এই ভালবাসার কথা বলিনি। বলছি রাতের ভালবাসাটা একটু কমান। তাহলে আপনার কষ্টও কম হবে।'

'আমার কষ্ট কমাতে গিয়ে ওকে কষ্ট দেব! না না, এ হয় না। যা একটু ভালবাসি তা তো রাতে।'

'কিন্তু আপনার ভালবাসার জুলুমে উনি যে মরতে বসেছেন। কিছু আছে ওঁর শরীরে?'

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়েছিল। কুঁকড়ে গিয়ে অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট গলায় বলেছিলেন, 'কি করব বল! সাতটা মেয়ের পরেও অষ্টম গর্ভের চিন্তা। রাতে কি ভালবাসা! এবার নিশ্চয়ই ছেলে হবে। কতবার বলেছি, দরকার নেই ছেলের। কে শোনে কার কথা!

রাগে গা রিরি করে উঠেছিল লীনার। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। হাজার হোক, বাবার বয়সী। সহজ গলায় বলেছিল, 'আর নিজের ভালবাসাটার কথাও বলুন।'

লীনা ঠিক বুঝতে পারে না, দিন কাটে তো রাত কাটে না, তবু এই ভালবাসা আসে কি করে। অদ্ভুত এই সুহাস বিশ্বাস। কিংবা হয়ত ঠিক অদ্ভুত নয়।

সুহাসের কথা শুনে লীনা মনে মনে খুব হেসে বলল, 'আঃ, বাঁচা গেল। তারপর সুহাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুটো চা বলে দেবেন দোকানে?'

'নিশ্চয়ই দেব।'

ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে অরিতের ভিতরটা। সে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। সুহাসের অনুপস্থিতিতে কিছুক্ষণ যে নিরিবিলি কথা বলা যাবে তা তার মনে এল না। সে বাগড়া দিতে চাইল। সুহাস পা বাড়াতে না বাড়াতেই বলল, 'আমি কিন্তু চা খাব না।'

সুহাস কি করবেন বুঝতে পারলেন না। লীনার দিকে তাকালেন। দেখলেন লীনার মুখেও অপ্রস্তুত ছায়া থমকে রয়েছে।

পরক্ষণে অবশ্য সুহাস সপ্রতিভ হলেন, 'খাবেন না? থাক তাহলে। একটাই বলি।'

সুহাস একবার লীনার দিকে তাকালেন। তারপর দরজা পর্যন্ত গিয়ে আর একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে ভাবলেশহীন মুখে বেরিয়ে গেলেন।

লীনা সেই আগের মত স্বরেই বলল, 'তুমি এক কাজ করো। কাকুকে বলো। কাকু মত করলে—'

'উনি যদি মত না করেন ?'

লীনা এক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর বলব কি বলব না এমন মুখে বলে উঠল, 'তাহলে আমি নিরুপায়।'

'নিরুপায় মানে ?'

'নিরুপায় মানে নিরুপায়! কাকুর অমতে বিয়ে করার সাহস আমার নেই।'

'ও. কে.। আমিও তোমাকে—'

'চুপ করলে কেন ?'

ঠিক তখনই বাইরে থেকে কে যেন বাঁশফাড়া স্বরে বলে উঠল, 'বেশি পাঁয়তারা কষলে মেরে খাল খিঁচে দেবানে।'

অরিত উৎকর্ণ হল। আপাতত বিব্রত লীনা রেহাই পাবার জন্যে এমনই একটা সুযোগ খুঁজছিল। সে যেন লাফিয়ে উঠল। দরজার কাছে গিয়ে দেখল চৌকিদার একটা লোককে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। পায়ে পা দিয়ে হাঁটছে জাফর। পিছনে অতি উৎসাহী কিছু লোক।

লীনা নিজের চেয়ারে গিয়ে বসতেই সুহাস ঢুকলেন। হাতে চা।

লীনা দেখেই বলল, 'আপনি আনলেন কেন? ওদের ছেলে নেই।'

'আছে। তার আনতে দেরি হত। নাও।' চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে সুহাস বললেন, 'তালাকের কেস। চৌকিদার নিয়ে আসছে লোকটাকে। দেখ, যুক্তির ছেনি-হাতুড়িতে কুঁদে কুঁদে মানুষ করতে পার কিনা।'

চায়ের কাপ নিতে নিতে লীনা বলল, 'তালাকের কেস। কি করে বুঝলেন ?'

'বাঃ এই তো লোকটা বলল, মাগীর চরিত্তির খারাপ। ওকে আর ঘরে তুলব না।'

এইসময় লোকটাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল চৌকিদার আর জাফর। দুজনেই একসঙ্গে বলল, 'দিদি, এই মোনাজাত ভাই না—'

'আমি শুনেছি', বলে ওদের থামিয়ে দিয়ে মোনাজাতের দিকে সটান তাকাল সে। মোনাজাতও লীনার সামনে মুহূর্তে কেমন ম্যাদামারা হয়ে গেল। যেমন করে অভিযুক্ত ছাত্র শিক্ষকের সামনে চোখ নিচু করে থাকে তেমনি করে মোনাজাত দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে মোনাজাতকে চেনা চেনা লাগছিল, তারপর সমস্তই মনে পড়ল। এই মোনাজাত জবার মেয়েলি হাতের পুরুষালী প্যাঁচে কাবু হয়েছিল।

লীনা চৌকিদারকে বলল, 'ওঁকে পাশের ঘরে নিয়ে বসান।'

এখনও চৌকিদারের শক্ত মুঠো জাঁতিকলের মত চেপে বসে আছে মোনাজাতের হাতে। চৌকিদার একবার টান দিয়ে বলল, 'এসো।'

এখানে আসার সময় মোনাজাত ইঁদুরের মত খানিক ছটফট করে সেই পাঁচ-আঙুল-

জাঁতিকল থেকে বেরিয়ে যাবার নিষ্ফল চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখন সে শান্তভাবে চৌকিদারের সঙ্গে গেল।

হঠাৎ লীনার গলার স্বর বদলে গেল, 'জাফর, মোনাজাতকে একটু ভয় দেখাবে। যে ধরনের ভয়ে উনি কাবু হন। বউকে আবার ঘরে নেন।'

'কিন্তু দিদি, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ঘরে নিতে গেলে তো ইদ্দতের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'করতে হয়, করবে।'

এইসময় হঠাৎই, দুজনকে চমকে দিয়েই, একদম আচমকা অরিত চিৎকার করে উঠল, 'স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করার কাজ পঞ্চায়েতের নয়। এ কথাটা মনে রাখলে খুশি হব।'

ঠোঁটের ট্রিগার টিপে কথার যে বুলেট ছুঁড়ল অরিত তা শুধু লীনা নয়, জাফরকেও বিদ্ধ করল। শক্ত চোখ, কটমটে দৃষ্টি, মনে হল যেন কণ্ঠছেঁড়া বিদ্যুৎ ঝলসে দেবে অরিতকে কিন্তু কিছুই বলল না। লীনাও আশ্চর্য শান্ত। সে এক চিলতে বুঝদার হাসি ঠোঁটে মেখে নিয়ে ক'পলক তাকিয়ে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়াল। আর তখনি লক্ষ্য পড়ল চায়ের কাপে। 'ইস, চা বোধহয় জল হয়ে গেছে। যাকগে।' লীনা যথাসম্ভব গলা খাদে রেখে বলল, 'ভেব না। অরিতবাবুর রাগও এমনিভাবেই জল হয়ে যাবে। এসো আমার সঙ্গে।'

এই কথায় জাফরের ঠোঁটে একটু হাসি ফুটল। সে লীনার পিছু পিছু পাশের ঘরে ঢুকল।

চেয়ারে বসেই পঞ্চায়েতি মেজাজে লীনা বলল, 'বউ কি করেছিল? তালাক দিলেন কেন?'

মোনাজাত টপ ফর্মে ফিরে এল। 'আমি সোয়ামী, তায় পুরুষমানুষ। আমাকে বলে কিনা মদ খাবা না। খালি, আমিও খাব। মাগির বাড়ি যাবা না। গেলি, আমিও মিনসে খুঁজে নেব। কি ছিনাল বলুন তো। তালাক আর এমন কি! ভাগ্যি ভাল এখনও খুন করিনি মাগীকে।'

লীনা গম্ভীর গলায় বলল, 'খিস্তি মারবেন না। এটা অফিস।'

মোনাজাত ঘাড় গোঁজ করল। ঠোঁটে একটা শব্দও ফুটল না।

সুহাস লীনার পিছনে নিজের চেয়ারে বসে কাজে ব্যস্ত। কান পেতে আছেন কিনা বুঝবার জো নেই। চৌকিদার আর জাফর তাকিয়ে আছে মোনাজাতের দিকে। লীনাও। হসা, লীনা বলে উঠল, 'আপনার বউ এখন কোথায়?'

'অনেক ভাতার তো। কোন ভাতারের বাড়ি জানিনে।' লীনার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ঠোঁট উল্টে বলল মোনাজাত।

মোনাজাতের এমন ধারা কথায় চোখ নামিয়ে নিল লীনা। একটু লজ্জার হাসি হেসেও ফেলল নিঃশব্দে। কিন্তু গর্জন করল চৌকিদার, 'চোপ্ শুয়োরের বাচ্চা।'

জাফরের বুকের ভিতরে এতক্ষণ যে ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার জানলা খোলা ছিল এখন তা মোনাজাতের কথার দাপটে বন্ধ হয়ে গেল। তার মত ভদ্র ছেলে অভদ্র গলায়

চেঁচিয়ে উঠল, দেখছেন দিদি, দেখছেন! অসভ্য ইতর লোকটার কথা শুনছেন! হু দিন, মেরে ওর থোবড়া চটকে দিই।'

'জাফর!' লীনা ঘাড় ঘুরিয়ে মৃদু ধমকের সুরে বলেই মোনাজাতের দিকে তাকাল আর তখনই মনে পড়ল সুন্দরীর কথা। সুন্দরীই মোনাজাতের স্ত্রী। সে ধারাল গলায় বলল, 'মোনাজাতভাই, আবোল-তাবোল না বকে, যদি সুন্দরী বাপের বাড়ি গিয়ে থাকে, নিয়ে আসুন।'

লীনার মুখে তীব্র দৃষ্টি ফেলেই দাড়ি-গোঁফের আড়ালে-থাকা মুসলমানি হাসি হাসল মোনাজাত। 'কি বলতেছেন দিদি। রীতিমত তিন তালাক দিলি কি আর তাকে নিয়ে ঘর করা যায়।'

জাফর চাপা ভর্ৎসনার গলায় বলল, 'আর ন্যাকা সাজতে হবে না। যায়। এবা তোমাকে করতেও হবে।'

ভেংচি কাটল মোনাজাত, 'কেন, তোমার হুকুম নাকি?'

জাফর খুব চটে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। অমান্য করলে এমন ব্যবস্থা করব যে ছিটেফোঁটা মদও কেউ তোমার কাছে বিক্রি করবে না।'

চৌকিদার অমনি দোহারকি দিল। 'এমন কি, পঞ্চায়েতের কলের পানিও পাবে না। হয় গলা শুকিয়ে, না হয় পুকুরের পানি খেয়ে আমাশার কামড়ে মরবে।'

মোনাজাত খিকখিক করে হাসল, 'কি কথাই না বললে চৌকিদার। আমি লেখাপড় জানি, সবই বুঝি। সে দিনকাল কি আর আছে যে একঘরে করবা? এখন জলও খাব মালও পাব।'

লীনার রাগ হল। সে কঠিন গলায় বলল, 'কিছুই পাবেন না। আপনি যাতে বাড়ি থেকে না বেরতে পারেন সেই ব্যবস্থাই করব।'

সে আঁতকে উঠল, 'দোহাই দিদি, ওডা করবেন না। মদ না পেলি মরি যাব।'

মোনাজাতের এই কথা শুনে দুঃখ বা আনন্দানুভূতিতে টনটনিয়ে উঠল না লীনার বুক। সে স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'মদ না খেলে কি কষ্ট হয় আপনার?'

সে বলল, হয়তো—খুব হয়।'

লীনা বলল, 'আপনার যেমন কষ্ট হয় না, তেমনি সুন্দরীরও, আপনার জন্যে কষ্ট হয়। আপনি সেটা বোঝেন না। পুরুষমানুষ তো। এদিক ওদিকে খুঁটে খান। কিন্তু সুন্দরী? ওকে সে অধিকার দেয়নি সমাজ। আপনি ছাড়া ও বাঁচবে কি করে? একটু মানিয়ে নিন না—'

ধুপধাপ পদশব্দ থামতেই দ্রুত শ্বাসের ঝড় থেকে আছড়ে পড়ল উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর, 'বিরাট মিছিল এগিয়ে আসছে। কয়েক হাজার মানুষ। হাতে ফেস্টুন, প্লাকার্ড। মিছিলের পুরোভাগে সুনীল মণ্ডল। কিন্তু তাঁদের পথ বেড়ার মত আটকে দিয়েছে আর একটা মিছিল। এর পুরোভাগে জবা। জবা মিত্র। এখুনি চল। তা না হলে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।'

লীনা চমকে তাকিয়ে দেখল কল্পনা। তার বুকে হাপরটানা ওঠানামা। বোধহয়

দৌড়ে এসেছে। সে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। 'হয়ত পারে, কিন্তু কিছুই ঘটবে না। তুমি বসো।'

কল্পনা অবাক, 'কি বলছ তুমি। গরম গরম স্লোগানে টগবগ করে ফুটছে সবাই। একদিকে নারী-আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষক ছড়া, আর একদিকে এই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক স্লোগান।'

কেউটে সাপ যেমন ফোঁস করে গর্ত থেকে মাথা তুলে কারও বুকে কাঁপন তুলে দিয়ে চলে যায়, তেমনি একটা ভয়ের কাঁপন যেন উঠল সবার বুকে। সেই বুক নিয়ে তাকিয়ে থাকল কল্পনার দিকে।

মোনাজাতকে এখনও বাগ মানানো যায়নি। কিভাবে যাবে সেটা ভাবছে। এই ভাবনার মুহূর্তে হঠাৎ এমন উচাটন কথা ভাল লাগে না। একটু বিরক্ত হল লীনা।

'এখুনি যেতে হবে? এই ব্যাপারটা মিটিয়ে নিই।'

কল্পনা বলল, 'বাঃ তুমি যে কি! এত বড় একটা গোলমাল—! যদি হাঙ্গামা-টাঙ্গামা হয়।'

লীনা উঠে দাঁড়াল। 'চৌকিদার, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওঁকে ছাড়বে না।'

এই সময় অরিত এল। এতক্ষণ যেন কিছুই শোনেনি এমন ভান করে বলল, 'কি হয়েছে? কোন গোলমাল?'

অরিতের নিখুঁত অভিনয়টা ধরতে পারল লীনা। সে কৌতুক কৌতুক চোখ নিয়ে বলল, হ্যাঁ, দারুণ গোলমাল। ঐ যে জবা, সে-ই প্রমীলাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। পুরুষদের নেতৃত্বে সুনীলবাবু। দু'পক্ষ মুখোমুখি। সংঘর্ষ অনিবার্য।'

এই কথার পিছনে লীনার বেশ পরিপাটি খোঁচাটা উপলব্ধি করতে পারল অরিত। সে মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিল সবাইকে একবার, কিন্তু কোন কথা না বলে সহসা বেরিয়ে গেল।

অরিতের পিছনে পিছনে লীনাও বেরুতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই জাফর বলল, 'দিদি, থানায় ফোন করে দিয়ে যান। বলা তো যায় না—'

লীনা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কি বলা যায় না?'

'না মানে, জবা যে ধরনের মেয়ে। হঠাৎ কি করে বসে—'

লীনা হাসল, 'কিচ্ছু করবে না। তুমি বসো ভাই। এই এলাম—'

লীনা আর কল্পনা গিয়ে দেখল, হরিপুরের মোড়ে দু'পক্ষ মুখোমুখি। স্লোগান দিচ্ছে, আকাশ ফাটাচ্ছে। লীনাকে দেখে জবারা চুপ। কিন্তু সুনীলরা সেই স্লোগান উচ্চগ্রামে তুলল—

পুরুষ ছাড়া মেয়েমানুষ
চুপশানো সন্দা ফানুস।
ঘরে গিয়ে মা হও
ঘোমটা দিয়ে কথা কও।

জবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে বলল, পুরুষের খবরদারি মানছি না, মানব না। নারীর মুক্তিযুদ্ধ চলছে, চলবে—

সমবেত মেয়েলি কণ্ঠস্বরে বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠল। এর মধ্যেই লীনা চিৎকার করে বলল, 'জবা, বন্ধ কর স্লোগান। পথ ছেড়ে দাও। ওঁদের যেতে দাও।'

লীনার আবেদনে কাজ হল। জবা মিছিল নিয়ে এগিয়ে চলল তকিপুরের দিকে। সুনীলের মিছিলে স্লোগানের ঝড় উঠল।

মিছিল তো হামেশা হচ্ছে, কে আর মিছিল দেখতে রাস্তায় আসে! কিন্তু মিছিলটা যদি রঙবেরঙ পোশাক পরা মেয়েদের হয়, তাহলে ছুটে আসে রাস্তায় অনেকেই, তাকিয়ে দেখে, কৌতূহলী হয়, জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে।

মিছিল দেখার জন্যে বেশ ভিড় জমেছিল রাস্তার দু'ধারে। ভিড়ের মধ্যে থেকে সেরকমই একটা ছেলে বলল আর একটাকে, হিন্দী ফিল্মের মত মেয়ে-পুরুষে ঢিসুম ঢিসুম ফাইট হলে বেশ জমত। নারে?'

ভিড়ের মধ্যে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে থেকে একটা মেয়ে তৎক্ষণাৎ ফোড়ন দিল, 'হ্যাঁ। দারুণ—! জমবেও! একটু বসো।'

॥ চৌদ্দ ॥

অনাগত রোদের বিরহে বিষণ্ন সকাল। বারান্দার চৌখুপিতে ফাল্গুনী বাতাসের স্নিগ্ধ দুরন্তপনার মধ্যে বসে রামসুন্দর আর অরিত। অরিত শুরু করল গতকালের কথা। লীনা, সুহাস, জাফর, চৌকিদার আর মোনাজাত থেকে শুরু করে কল্পনা, জবা আর সুনীল সবার কথাই এসে গেল। শেষ করে অরিতই বলল, 'আমার বাবা নেই। তুমি আমার অভিভাবকের মত। তুমিই অলকেন্দুবাবুকে বলো।'

রামসুন্দর বললেন, 'তুমি তাড়াতাড়ি লীনাকে বলতে গেলে কেন? নাঃ একটু যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে!'

ক' মুহূর্ত নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কাটার পরে রামসুন্দরই আবার বললেন, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, অলকেন্দুকে বলে কোন লাভ হবে না। ও যেমন মানুষ তাতে এ প্রস্তাব এক কথায় নাকচ করবে। তবু যখন বলছ, একবার বলে দেখব।'

অরিতের বয়েস অল্প, অভিজ্ঞতা কম আর সংযম নেই বললেই চলে। সে এই মুহূর্তের মন আর ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। হঠাৎই বলল, 'আসলে কি জান, লীনা ছলছুতোয় আমাকে মাইনাস করতে চাইছে। যদি আমি পিছিয়ে যাই এখন, হেরে যাব। মেয়েমানুষের কাছে হার বড় লজ্জার! আমি জিততে চাই। আমাকে সাহায্য করবে না?'

রামসুন্দর একটু চুপ করে থেকে যেন চাপা-হাসি হাসলেন। 'করব না কেন!'

'না মানে, একে একই দলের, তায় উপপ্রধান। ওর কাজে সরাসরি বিরোধিতা করতে পারছি না।'

'তাতে কি হয়েছে। আমি করব।'

'তুমি! কি ভাবে?'

'বিরাট মিছিল নিয়ে পঞ্চায়েত ঘেরাও করব। অলকেন্দু যদি রাজি হয়, ভালই। না হলে নারী-আন্দোলন বন্ধ করতে শেষ পর্যন্ত কিছু একটা চরম ব্যবস্থা নেব। হয় এসপার, নয় উসপার।'

অরিত অবাক হয়ে গেল। তার মনের কথা বলছেন রামসুন্দর। কেমন করে? এই ধাঁধার উত্তর খুঁজে পাবার আগেই রামসুন্দর বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছে পূরণ হবে। আমি এখন উঠব। সাড়ে আটটায় ট্রেন ধরতে হবে আবার।'

অরিত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি কি কলকাতায় যাবে?'

'হ্যাঁ।'

শেয়ালদা স্টেশনে নেমে, যা কখনও মনে হয়নি রামসুন্দরের, সেটাই মনে হল। একটু মিষ্টি কিনে নিয়ে গেলে কেমন হয়। কথাটা মনে হতেই সামনের মিষ্টির দোকান থেকে দশটাকার সন্দেশ কিনে বাগবাজারের বাসে উঠলেন।

প্রায় বছর খানেক পরে রামসুন্দরকে দেখল পারমিতা। একটু খুশি হল যেন, আসুন দাদু বসুন।

ঘরের চারদিকে তাকিয়ে একটু হেসে রামসুন্দর বললেন, 'ভাল আছ?'

'ওই চলে যাচ্ছে আর কি!'

'তোমার ছেলে কোথায়?

'মামার বাড়ি।'

'তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।'

'সে হবে। আজ রোববার। আমার কলেজ নেই। ব্যস্ত হবেন না।'

পারমিতা চলে যাচ্ছিল, রামসুন্দর বললেন, 'পারমিতা, এই মিষ্টিটা—'

পারমিতা ঘুরে দাঁড়াল। ''আবার মিষ্টি আনতে গেলেন কেন!'

কিছুক্ষণ পরে পারমিতা চা আর মিষ্টি নিয়ে এল। খেতে খেতেই রামসুন্দর বললেন, 'অর্ক বাড়ি নেই?'

পারমিতা সজাগ চোখ রাখল রামসুন্দরের মুখে। তাদের সম্পর্ক এখন ক্ষণভঙ্গুর কূলের মত নড়বড়ে। সামান্য ঢেউ আছড়ে পড়লেই চুকেবুকে যাবে সব। এ কথা কি রামসুন্দর শোনেননি। তাঁর মুখ দেখে কিছুতেই বুঝতে পারল না এটা নিছক প্রশ্ন, না কৌতূহল। সে সপ্রতিভ জবাব দিল, না।

রামসুন্দরের মনের প্রস্তুতি এখন, এই মুহূর্তে, তুঙ্গে। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'ওকে একটু নজরে রেখ। আর বাড়ি গেলে সঙ্গে যেও।'

এর পরের সংলাপ শোনার জন্যে পারমিতা সকৌতুক চোখে তাকিয়ে থাকল রামসুন্দরের মুখে। কিন্তু তিনি কিছু বলছেন না দেখে বলল, 'কেন ?'

রামসুন্দর আকাশ থেকে পড়ার ভান করলেন। 'সে কি, তুমি কিছু শোননি ?'

এবার পারমিতা হেঁয়ালির মধ্যে পড়ল। 'না— !'

অর্কলীনার প্রেমে মশগুল। এ নিয়ে মানুষের কানাকানির শেষ নেই। এখনও শক্ত হাতে হাল ধরো। বলা যায় না, কি জানি কি করে বসে। শেষমেষ পস্তাবে কিন্তু।

সেই সনাতন ভারতীয় চিন্তা যা যুগযুগান্ত ধরে গঙ্গার মত নারীপুরুষের মনে প্রবহমান। স্ত্রী স্বামীর আর স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তি। কড়া পাহারায় রাখো নইলে বেহাত কিংবা নিরেট সম্ভাবনা।

রামসুন্দর জানেন, কিংবা জেনেও বেহুঁশ, তিনি যাই বলুন, যতই কেচ্ছা ছড়ান, পুরুষ পুরুষই। বলা যায়, ক্যাটালিকটিক এজেন্ট। নারীর দৈহিক পরিবর্তন ঘটায়, মাতৃত্ব দেয়। কিন্তু নিজে অপরিবর্তিত। আহা, নারীর দেহ লুটেপুটে খাবার কি অপূর্ব প্রাকৃতিক সুযোগ! ছাড়া যায়, না ছাড়া উচিত। সুতরাং দাও প্রেম। যত্রতত্র দিচ্ছেও। অফুরান। পৃথিবীতে বোধহয় সবচেয়ে সস্তা পুরুষের প্রেম।

পারমিতা বলল, 'সরি, আমি নিরুপায় !'

রামসুন্দর ভাবলেন, এটা পারমিতার বাস্তব অসহায়তা। স্বামীকে স্বমতে আনতে না পেরে এই অসহায়তার মধ্যেই অবধারিতভাবে এসে পড়ে সব স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত হয় সে হাল ছেড়ে দেয়, নয় হা-হুতাশের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরে। তিনি বললেন, 'কি বলছ! এত বাড় ! তোমাকেও পরোয়া করে না ?'

এই সেরেছে, বলছেন কি। এ যে উল্টো বুঝলি রাম। আর বেশি কথার মধ্যে গেলে একটা কিছু আঁচ করে তার কথার গূঢ় অর্থ খুঁজবেনই রামসুন্দর। কি দরকার এ সবের! সে বলল, মুশকিল! ঠিক আছে, আমি ওকে সাবধান করে দেব।'

পারমিতার অবিশ্বাস্য এই নির্লিপ্ত যেন অজানা বিস্ময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর চোখমুখের পয়জনাস ওয়েস্ট-এ মৃতপ্রায় কোষে কোষে। স্ত্রী স্বামীকে এ সব কথা শোনার পরেও সন্দেহ বা অবিশ্বাসের ঘোলা চোখে দেখে না, এ কি সম্ভব। বুকের ভিতর অজস্র অভিজ্ঞতার স্পষ্ট ঝকঝকে আকাশে, হঠাৎ করেই যেন অনভিপ্রেত ছায়া···একে তো পৃথিবীটা অনেক ঘুরেছে। অনেক। বয়েস বেড়েছে। এগিয়েছে। এরই মধ্যে বয়েস বেড়েছে তাঁরও। কিন্তু তিনি এক পা-ও এগোননি। যেখানে ছিলেন, সেখানেই।

হ্যাঁ, সেখানেই তিনি থাকতে চান। অধিকাংশ পুরুষ তাঁর পথের পথিক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে। তাতে হয়েছেটা কি! চিন্তা আর মতাদর্শে মানুষ সেই মধ্যযুগের অন্ধকারে।

হঠাৎ চলচ্চিত্রের মত তাঁর মনের পটে ভেসে উঠল অলকেন্দুর মুখ। হ্যাঁ··· অলকেন্দু চৌধুরী। দপ্ করে বুকে আগুন জ্বলে উঠল। যে ভাবেই হোক, শোধ তুলতেই হবে। তিনি কিছুতেই হার মানতে পারবেন না।

কিন্তু, অর্কের উপর পারমিতার বিশ্বাস যেন গন্ধমাদন পর্বত। অনড়। পবনপুত্রের মত তাঁর ক্ষমতা নেই এ পর্বত নড়ান। অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি মুহূর্তের মধ্যে ভিন্ন পথের সন্ধান পেলেন। এবং প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। অলকেন্দুর মা নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন জানো?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'এই তো সেদিন তিনি মারা গেলেন।'

পারমিতা উদাস গলায় বলল, 'না, একথা শুনিনি।'

'শুনবে কেমন করে? একথা কেউ বলে! কুলত্যাগিনী। এতদিন গ্রামেরই এক সুপুরুষের রক্ষিতা ছিলেন।'

'সুপুরুষ নয়, বলুন কুপুরুষ। কুপুরুষ না হলে কি রক্ষিতা রাখে?'

'যিনি অসহায় এক মহিলাকে আশ্রয় দিলেন তিনি কুপুরুষ হলেন কি করে বুঝতে পারছি না।'

'এই যে বললেন রক্ষিতা।'

'হ্যাঁ। উনি দীর্ঘদিন পরপুরুষের সঙ্গে ছিলেন। আর তাঁরই দয়ায় বেঁচে ছিলেন।'

'এই দয়া পেয়েছিলেন কি শ্রম আর দেহের বিনিময়ে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এ আর এমন কি কথা! এই দুটোর বিনিময়েই তো স্ত্রী স্বামীর ভালবাসা পায়।'

পারমিতা এতক্ষণে হাসতে পারল। 'তাহলে এই সমাজ ব্যবস্থার গলদ আপনিও দেখতে পান?'

রামসুন্দর মুশকিলে পড়লেন। কান ভাঙাতে গেলেন পারমিতার, নিজেই পড়েছেন কলে। মনে মনে একটু ছটফটানি, তারপরই বললেন, 'আমি কেন, সবাই দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু করবে কি?'

বলেই উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হতাশ গলায় বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস হল না! পরে বুঝবে। যাই হোক, আমাকে এখন ট্রেন ধরতে হবে। চলি।'

'এই তো এলেন। এখুনি যাবেন? না না, তা হয় না। দুপুরে খেয়েদেয়ে যাবেন।'

রামসুন্দর একটু ভেবে বসে পড়লেন। সামনে পারমিতা। এক বছর বয়েস বেড়েছে, একটু মুটিয়েছেও, শরীরের বাঁধুনি এখনও নিরেট পারমিতার। পরনে একটা ছাপা শাড়ি। তার সঙ্গে কাল রংয়ের ব্লাউজ। এই সাদামাটা পোশাকেও যেমন মানিয়েছে তেমনি ফুটে বেরিয়েছে ব্যক্তিত্ব। কেন কে জানে, পারমিতা বারবার তাকিয়ে দেখছে রামসুন্দরকে। অপরাধীদের চোখমুখে অনেক সময় অপরাধবোধ ফুটে বেরয়। তাঁর মুখে কি তেমনই…মুখ নিচু করলেন তিনি।

সত্যি, কি যে আশ্চর্য পারমিতা, বিশ্বাস করা যায় না।

দেয়াল ঘড়িতে তিনটে দশ। বিছানায় একটু গড়াচ্ছিলেন রামসুন্দর। এবার উঠে

বসলেন। আর অমনি বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ল মানদার কথা। প্রত্যূষ। তিনি বারান্দায় বসেছিলেন। একা। মানদা এগিয়ে এসে বলেছিল, 'পেরধানের নষ্টামির কথা শুনেচ দাদু ?'

চেয়ারটা টেনে গ্রীলের প্রায় গায়ে এনে তিনি চাপা গলায় বলেছিলেন, 'আবার নষ্টামি !'

'হ্যাঁ গো। একেবারে বিডিও সাহেবের লগে।'

রামসুন্দর কুঁককুঁক করে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'বলিস কি। তলে তলে এত।'

খানিক আগে এক ধরনের নিরাশায় মনটা ভারি হয়ে উঠেছিল রামসুন্দরের। কিন্তু এখন যতই ভাবছেন, নিরাশা চলে যাচ্ছে তার মন থেকে। এখানে যখন কিছু করা গেল না, সুব্রতের মাকে বলতে হবে সব—সব কিছুই। পুলিশি কায়দা ? ছেলেকে পাওয়া গেল না তো বাপকে ধর। তা হোক, তিনি তো পুলিশের মত তিলে খচ্চর। মনে মনে হেসে উঠে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর পারমিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর হাতঘড়িতে প্রায় চারটে। গিরিশমঞ্চের দিকে এগিয়ে চললেন। গিরিশমঞ্চের কাছেপিঠে কোথাও 'নন্দিতা ভিলা'। সুব্রতদের বাড়ি। একদিন সুব্রতই তাঁকে বলেছিল। এ রাস্তা তাঁর নখদর্পণে বলা যায় কিন্তু গলির মধ্যে হলেই তো বিপদ।

গিরিশমঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এক সময় মনে হল কাউকে জিজ্ঞাসা করেন! কিন্তু তার দরকার হল না। পরক্ষণে ডানদিকে তাকাতেই দেখলেন মার্বেল স্ল্যাবের উপর লেখা 'নন্দিতা ভিলা'। সেখানে গিয়ে দেখলেন বড় লোহার গেট। বন্ধ। কি করবেন ভাবছেন, আর তখনই, খানিকটা আচমকাই, অর্ক হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে পথচলতি মানুষের মধ্যে মিশে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যে ধুকপুক। ধুকপুক। ভাগ্যিস তাঁকে দেখে ফেলেনি, তাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

এবার বুঝলেন গেটটা বন্ধ নয়, ভেজানো। গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকার সময় একবার পিছন ফিরে তাকালেন। কেউ দেখছে না তো ? পরিচিত! না। খানিক নিশ্চিন্ত-মনে ঢুকলেন। ঢুকেই অবশ্য অর্কের সঙ্গে তার এই অভাবিত সাক্ষাত হবার ব্যাপারটায় একটু খটকা লাগল। আমল দিলেন না। কাজে অকাজে মানুষ মানুষের বাড়ি আসে। তেমন হতেই পারে!

একটু ভিতরে ঢুকে বাড়িটা। দোতলা। নতুন নয়, কিন্তু সদ্য কলি ফেরান বলে নতুন মনে হচ্ছে। ডানধারে গ্যারেজ ঘর, ড্রাইভারের ঘর। সামনের আর্চে মাধবীলতার ঝাড়। ঢুকতেই ছোটখাট পরিসর। সেটা জুড়ে এক রঙের পুরু কার্পেট আর দু'খানা কাশ্মিরী কার্পেট কোনাকুনি ভাবে পাতা। একধারে একটা সুদৃশ্য পিয়ানো। এর সামনে চারজনের সোফাসেট আর পাশে আলাদাভাবে দু'খানা সোফা। মাঝে একটা সেণ্টার টেবিল, পাশে সাইড টেবিলও। সেখানেই নিচু মানানসই দু'খানা স্টীল ফ্রেমের

চেয়ার। এই পরিসরের ডান হাতের দরজা পেরিয়ে একটা বড় ঘর। ডানপাশে সিঁড়ি। নিচের এই খালি জায়গায় বই ভর্তি দুটো কাঁচের আলমারি, একটা সানমাইকা মোড়া ছোট টেবিল আর দুটো চেয়ার। এটা সুব্রতের লাইব্রেরি রুম। এর পরে একটা ঘর। ছোট। এখানে অর্ক থাকে।

কলিং বেলের টিঙ নানা, টিঙ নানা, টিঙ…শব্দ পেয়ে দরজা খুলল রাঘব। কাজের লোক। সুব্রতের বাবার বয়েসী।

'কাকে চাই?'

'সুব্রতবাবুর মা আছেন?'

'হ্যাঁ। আসুন।'

রামসুন্দরকে বসতে বলে উপরে চলে গেল রাঘব। যেতে যেতেই একটু গলা তুলে বলে গেল, 'ডেকে দিচ্ছি মাকে।'

রামসুন্দরের অন্যমনস্কতার মধ্যেই মিসেস চ্যাটার্জীর প্রশ্ন, 'আপনি…চিনতে পারলাম না তো। কোত্থেকে আসছেন?'

তিনি চমকে তাকালেন। কি হল, কে জানে। তাকিয়েই রইলেন। সাদা খোলের তাঁতের শাড়ির ভাঁজে লুকিয়ে রয়েছে একটা ছিপছিপে দেহ। রং সাদাটে। আটপৌরে ঘোমটায় মাথা ঢাকা থাকলেও সামনের দিকের ক'গুছি সাদা চুল দেখা যাচ্ছে। চোখের স্টীলের ফ্রেমের চশমাটা কেমন যেন মিসট্রেস-মিসট্রেস গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'আজ্ঞে, মোহনপুর। আমার নাম রামসুন্দর দাস।'

মিসেস চ্যাটার্জী তাঁর সামনেই বসে বললেন, 'অর্ককে চেনেন? অর্ক চৌধুরী!'

'এককালের প্রবল প্রতাপ জমিদার দীননাথ চৌধুরীর পৌত্রকে চিনব না? ওর দিদু মানে দীননাথ চৌধুরীর স্ত্রী তো কুলত্যাগিনী। ওর বাবা অলকেন্দু চৌধুরীর এক পালিতা কন্যা আছে। নাম লীনা।'

'ও, হ্যাঁ। ও-ই তো পঞ্চায়েত-প্রধান। ওর কথা প্রায়ই বলে সুব্রত। মেয়েটা নাকি যেমন সুন্দরী, তেমনি স্মার্ট। শুনেছি, 'ও অলকেন্দু চৌধুরীর ভাইঝি—'

'অবশ্য সবাই তাই জানে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। তাছাড়া মেয়েটার স্বভাব-চরিত্তির মোটেই ভাল না। অর্ক বিবাহিত। তার সঙ্গেই গুজগুজ ফুসফুস। অর্ক এখানে। এখন আপনার ছেলের মাথা খাবার তালে আছে।'

হঠাৎ এই কথায় বড় রকমের ধাক্কা খেলেন মিসেস চ্যাটার্জী। কেননা, সুব্রত তাঁকে ফোনে জানিয়েছিল অর্ক নিপাট ভদ্রলোক। অবিবাহিত। লোকটা তাঁর দিকে নির্নিমেষ চেয়ে আছেন, হয়ত তার মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন। মুহূর্তেই সতর্ক হয়ে গেলেন বটে, কিন্তু বুকের ভিতরের চাপা ব্যথা কেমন যেন থামচে বসে রইল।

তিনি ভাবতে পারছেন না রামসুন্দরের এই হঠাৎ আগমন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না শুভ-কাঙ্ক্ষণীয়। এ যেন ছপ্পর ফুঁড়ে বিবেকের বাণী। একি শয়তানি না আর কিছু!

এতক্ষণ মুখ নীচু করে ভাবছিলেন। এবার মুখ তুললেন! তাঁর চোখ এতক্ষণ রামসুন্দরের চোখে বিঁধলেও রামসুন্দর চোখ নামিয়ে নিলেন না। বললেন, 'বিশ্বাস

হচ্ছে না !' জীবনে অনেক কথা বিশ্বাস না করলে জীবনটা সুন্দর হয়। আমরা তা পারি না। বিশ্বাস করতেই হয় মিসেস চ্যাটার্জী। আমি আর কদিন বলুন? এখনও মিথ্যে বলব। এর পরও যদি বিশ্বাস না হয়, ঠিক আছে, অর্ক তো এখানে আসে, ওকেই জিজ্ঞাস করবেন।'

'আসে না, এখানে থাকে অর্ক।'

'মানে !' একরাশ বিস্ময় এই শব্দটার মধ্য দিয়ে ছিটকে বেরল।

'ও আমাদের ভাড়াটে।'

'সেকি, এইতো কাছেই ওদের বাড়ি ! ওর স্ত্রী অধ্যাপিকা। পারমিতা চৌধুরী।'

এমন সন্দেহ মিসেস চ্যাটার্জীর যে হয়নি তা নয় ! আসলে গেজেটেড অফিসারের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট। প্রশাসন মান্য করে। আর তিনি তো কোন ছার। রামসুন্দরের কথা শুনে মনে হল, তাঁর কাছে পারমিতা কিংবা লীনা সম্পর্কিত আরও কিছু বোমা আছে। হঠাৎ উকিলী চিন্তা এল তাঁর মাথায়, করো সওয়াল।

'ওদের কি বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে ?'

'কই আমি তো কিছু শুনিনি ! বিবাহ-বিচ্ছেদ হবেই বা কেন ? ওরা তো সুখী সম্পতি। অবশ্য বছরখানেক কোন যোগাযোগ নেই। এর মধ্যে যদি কিছু ঘটে থাকে—' এই সময় ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল রাঘব। টি-পট থেকে দুধ আর চা কাপে ঢেলে মিসেস চ্যাটার্জী মুখ তুললেন।

'চিনি ?'

'এক চামচ।'

চায়ের কাপ রামসুন্দরের হাতে দিয়ে একটু হাসলেন মিসেস চ্যাটার্জী। কিছু বললেন না।'

চায়ে পর পর কয়েকটা চুমুক দিয়ে রামসুন্দর বললেন, 'এবার উঠব আমি। একটা কথা আপনাকে না বল্লে নয়। আজ, এখনই।'

বোধহয় আবার বোমা ফাটছে। মিসেস চ্যাটার্জী চায়ে চুমুক দিচ্ছেন, তাকাচ্ছেন ? রামসুন্দরের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। মুখে একরাশ উদ্বেগ। কে জানে, কি ধরনের বোমা এটা !

'লীনা নারীবাদী। স্বাধীন যৌনতায় বিশ্বাসী। ওকে সুব্রতবাবু বিয়ে করলে ও আপনার বংশের মুখে চুনকালি দেবেই। সতর্ক হোন। ছেলেকে ওর সঙ্গে মিশতে বারণ করুন। দরকার হলে এখুনি বিয়ে দিয়ে দিন ছেলেকে।'

রামসুন্দরের কথায় সারবত্তা আছে। কেননা পারমিতা নারীবাদী। তাকে নিয়ে স্ক্যাণ্ডাল-মংগার রীতিমত সক্রিয়। তবু এই অনধিকার চর্চার জবাবে মিসেস চ্যাটার্জীর ইচ্ছে করল উঠে গিয়ে তার গালে একটা ভারি চড় বসিয়ে দিতে। ভয়ানক আস্পর্ধা লোকটার। তিনি শুধু গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনি এখন আসুন।'

রামসুন্দরের মুখ অমনি কঠিন হয়ে গেল। বোধহয় বাস্তব অবস্থা বুঝে নিজেকে সামলে নিলেন মুহূর্তের মধ্যে। এবং কথা না বাড়িয়ে পা বাড়ালেন যাবার জন্যে।

ঠিক তারপরেই গুম হয়ে বসে রইলেন মিসেস চ্যাটার্জী। কিছুক্ষণ পরে ড্রাইভার লক্ষণ সিং এল।

'মা, মার্কেটিং-এ যাবেন না?'

'না, আজ যাব না। তুই যা।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে এ কথা শুনতে পেল রাঘব। সে এসে বলল, 'এই তো লোকটা আসার খানিক আগে বল্লে, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় মার্কেটিং-এ যাবে! আমিও বলে এলাম লক্ষণকে। হঠাৎ কি হল?'

তিনি আধিজ-আধিজ চোখ ফেললেন রাঘবের মুখে, বললেন, 'আচ্ছা রাঘব, তুই তো খোকাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিস। তোর কি মনে হয় ও বাজে ছেলে, বংশের মানমর্যাদা নষ্ট করবে?'

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় রাঘব চিৎকার করে উঠল, অসম্ভব। তারপর একই অভিব্যক্তিতে সে বলল, 'এ কথা লোকটা বল্লে বুঝি?'

মিসেস চ্যাটার্জী মাথা নাড়লেন শুধু।

রাঘব আবার বলল, 'লোকটাকে দেখেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল, নিশ্চই কোন বদমতলব নিয়ে এসেছে। বিশ্বাস করো না ওর কথা। মন্দ লোকে মন্দ বলে।'

তারপরেই দেখল সুব্রত দরজা দিয়ে ঢুকছে। সে অকারণ গলা তুলে বলল, মা, খোকাবাবু এসেছে। বলেই ব্যস্তসমস্ত উপরে উঠতে উঠতে বলল, 'তুমি এস খোকাবাবুকে নিয়ে। আমি চা করছি।'

মিসেস চ্যাটার্জীর কাছে এসে সুব্রত বলল, 'এখানে বসে আছ কেন? এসো।'

মনে মনে রাগ ছিল খানিকটা। রাঘব যাই বলুক না কেন, লোকটা তো সুব্রতের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে গেল। তাঁকে শুনতে হল। উঠে দাঁড়িয়ে একটু তীক্ষ্ন চোখে তাকাল সুব্রতের দিকে। চোখে শিশুর সারল্য, মুখে ট্রেনজার্নির ক্লান্তি। কেমন মায়া হল। মনের রাগ মুহূর্তে স্নেহবসে আর্দ্র হল। স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'সকালেই তো ফোনে বললি আজ আসবি না। চলে এলি যে?'

সিঁড়িতে উঠে ঘুরে দাঁড়াল সুব্রত।

'ভাল লাগল না। চলে এলাম। কই, এসো।'

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে গজগজ করলেন মিসেস চ্যাটার্জী।

'তোর ভাবসাব বুঝিনে বাপু। সকালে জানালেই তো স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে দিতাম। এত ধকল হত!'

পরদিন ছুটি বলেই বাড়িতে থেকে গেল সুব্রত। অপরাহ্নের যৌবনকাল। সে এসে পশ্চিমদিকের জানালার ধারে হাতলঅলা চেয়ারে বসল। অ্যাণ্টেনার জঙ্গল ছাড়িয়ে দূরে—বহু দূরে এক চিলতে আকাশ। না না আকাশ নয়, যেন প্রকৃতির ক্যানভাস। কে যেন অদ্ভূত নিপুণতায় এঁকে চলেছে ছবি। মূর্ত, কখনও বিমূর্ত। অপূর্ব। অদ্ভূত। বিস্ময়কর। মনের বন্ধ দরজা জানালাগুলো আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে ভরে উঠল অনির্বচনীয় ঈশ্বর সান্নিধ্যের ভাবুলতায়।

অনেকদিন এই ধরনের ভাবের ঘোর আসেনি। হঠাৎ আজ আবার।

আসলে মাঝে মধ্যে যখন সুব্রত একা বসে থাকত, সে যেখানেই হোক, মনের রঙমহল কেমন যেন প্রশান্তিতে ভরে যেত। গৃহীজীবনের মায়া-বাঁধন ঘিরে ধরত এক অচেনা অজানা জগতের মহত্তর অনুভূতি। সেই মুহূর্তে, মহলের পাখিটা নড়েচড়ে বসত। তার, ঘুম ভাঙলে এই তার এক দারুণ নেশা। গৃহজীবনের বাঁধন ছিঁড়তই। উড়ত অজানায়। সন্ন্যাসী-মন পাখি সে।

সুব্রতের এই ভিন্নতর উপলব্ধি, বিয়ে করে গৃহী হতে বাধা দিয়েছে বারবার। তার মা অনেক মেয়ের ছবি দেখিয়েছেন, যদি কাউকে মনে ধরে! কিন্তু না, কোনো মেয়ের চেহারাই তাকে টানেনি। অবাক হয়েছেন তার মা, কিন্তু হাল ছাড়েনি। এমনকি তার বয়েস হয়েছে, দু-দিন পরে মত দেবেই। কেননা, স্ত্রীর সঙ্গলাভেই তো পুরুষের মন-কলসী ভরে ওঠে।

লীনাই প্রথম নারী যে এই ভাবের রাজ্যে এক বিস্ময়কর স্নিগ্ধ আলো ফেলেছে। সে চমকে তাকিয়েছে। একটু একটু করে সেই আলো তার উপর মোহজাল বিস্তার করেছে। সরে গেছে ব্রহ্ম-সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা এই বোধ।

কিন্তু আজ আবার কেন? লীনাই তাকে পুনরায় এই ভাবের জগতে নিয়ে এল?

মিসেস চ্যাটার্জী চা নিয়ে এলেন। ডাকলেন, 'খোকা—' সুব্রত চমকে তাকিয়ে চা নিল। চা পানের ফাঁকে বলল, 'তোমার কষ্ট আমি বুঝি মা। ব্যস্ত হয়ো না। বিয়ে করব। এবং লীনাকেই—'

মিসেস চ্যাটার্জী চেয়ার টেনে বসলেন, বললেন, 'আশ্চর্য মেয়ে, তোর মত ছেলেকেও প্রত্যাখ্যান করে।'

'প্রত্যাখ্যান! বৃষ্টি কখনও অরণ্যকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে? সে তো অরণ্যেরই বাগদত্তা। এক সময় অরণ্যের কাছে আসতেই হবে। কেবল একটু প্রস্তুতি—একটু প্রতীক্ষা—'

'এমনই প্রতীক্ষা ওর জন্যে আর কেউ করছে না তো!' বলেই মনে মনে হাসলেন মিসেস চ্যাটার্জী। রামসুন্দরের কথা কিছুই বলেননি, অথচ তাঁর কথাকে বাই দি বাই স্পষ্ট করে বলতে পেরেছেন কিনা!

এই কথা তাকে গভীরভবে ছুঁয়ে গেল। তার মুখে কোন কথা এল না। কথা বলতে পারল না সে। সে যেমনি ছিল তেমনি তাকিয়ে থাকল মায়ের দিকে—যার চোখে-মুখে বাড়তি আলো।

মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, 'যেমন লীনা, তেমনি অর্ক। লীনা ধোঁকা দিচ্ছে তোকে। অর্ক আমাকে তো বোকা বানিয়েছেই—'

সুব্রত এবার নড়েচড়ে বসল। বলল, 'এ কথা কেন বলছ! সোজাসিধে বললে কি তুমি ঘরভাড়া দিতে? অর্কবাবু তো এতদিন আছেন। কোনদিন মনে হয়েছে যে লোকটা খারাপ?'

'সে কথা কি বলেছি?'

'তাহলে এখানেই ব্যাপারটা ইতি কর। কি যে হয়েছে তোমার। যে যা বলছে তাই শুনে মন খারাপ করছ। কে একজন বলে গেল অর্কের দিদু কুলত্যাগিনী, লীনা অলকেন্দুবাবুর পালিতা কন্যা বিশ্বাস করে নিলে!

'আচ্ছা, তুই তো লীনার সঙ্গে মেলামেশা করিস, তোর কখনও এমন সন্দেহ হয়নি?'

আশ্চর্য বরাত সুব্রতের। লীনার যে কথা সে শুনতে চায়নি তা-ই এখন উল্টো স্রোতে আসতে চাইছে মনে। সে অন্যমনস্ক স্বরে বলল, 'হয়েছে।'

'তাহলে? তুই লীনা সম্পর্কে ভাল করে খোঁজখবর কর।'

'কি হবে অত খোঁজখবর করে? বিয়ে করব লীনাকে। ওকে জেনেছি। সত্যি খুব ভাল মেয়ে। প্লিজ, তুমি এ নিয়ে আর ভেবো না।'

'বেশ, আমি আর ভাবব না। কিন্তু তোদের মতের মিল যদি না হয়, যদি মুক্ত বিয়ের উপযুক্ত পাত্রপাত্রী না হোস?'

'আশ্চর্য, তুমি এতদূর ভেবেছ। আমি কিন্তু এখনও এসব ভাবিনি। যাই হোক, না হলেও বিয়ে হবে।'

অর্ক বোধহয় বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে পড়িমরি ঘরে ঢুকে হাঁ হাঁ করে উঠল, না, না, অমন কাজ কখনও করবে না। এর ফল মারাত্মক হবে।'

অর্কের এই উপটনের কারণ মুহূর্তের মধ্যে সুব্রতের মনের পর্দায় ভেসে উঠল। কিছু বলল না সে। কিন্তু মিসেস চ্যাটার্জীর মনে হল, এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ! অর্ক মিথ্যে কথায় ফায়দা তুলে হয়ত ভেবেছিল, সে বুদ্ধিমান। বুদ্ধিতে পুরুষের চাঁদি ঘুরিয়ে দিতে তিনিও কম যান না। তৎক্ষণাৎ তিনি কথার বুলেট ফায়ার করলেন, 'কেন, তুমি কি ভুক্তভোগী?'

এই কথায় অর্ক হকচকিয়ে গেল না। বরং একটা প্রশ্ন জাগল মনে। জীবন একটা। আজ আছে, কাল নেই। অথচ, মানুষ মানুষকে আঘাত দিয়ে আনন্দ পায় কেন? কেন এই স্যাডিসটিক প্লেজার? শাস্ত্র বলছে, ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ। শাস্ত্রীয় উপদেশ যা জীবনকে সুন্দর সুস্থ করে, তা যদি সরে যায় জীবন থেকে, তাহলে যে জীবন থাকে, সে কি জীবন না জীবনের কঙ্কাল? এই প্রশ্নে মনোভঙ্গ হলেও সে অতি শান্ত গলায় বলল, 'মাসিমা, আবেগ তরঙ্গের উচ্চতার পার্থক্য অনুযায়ী মানুষ দু-ধরনের—ফ্রিজ ও ফার্নেস। মুক্ত বিয়ের প্রথম ও প্রধান শর্ত, ফ্রিজের সঙ্গে ফ্রিজ আর ফার্নেসের সঙ্গে ফার্নেস বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। কিন্তু আমাদের হয়েছে উল্টো। আমি ফ্রিজ, পারমিতা ফার্নেস। মেয়েরা এখনও লোকলজ্জা কিংবা পাপ নামক বড়ো দৈত্যটার ভয়ে সনাতন মূল্যবোধগুলো ধরে রেখেছে বলে উল্টোসোজার ধার ধারার প্রয়োজন হচ্ছে না, কিন্তু নারী প্রকৃত শিক্ষার আলো পেয়ে যত জাগবে তত এর প্রয়োজন দেখা দেবে। আমি একটুও বুঝতে পারিনি পারমিতা ভীষণ জেগে উঠেছে। ভীষণ। শর্ত-না-মানা হঠকারিতা ভয়ানক অঘটন ঘটাতে পারে। নিশ্চিন্তমনে, সবাই যেমন করে, তেমনি বিয়ে করেছিলাম পারমিতাকে। সত্যি বলতে কি, ওর আর আমার মধ্যে মতের বিস্তর ফারাক। কোনমতেই এ বিয়ে হয় না। অথচ পারমিতা অন্য কোন

বিয়েতে রাজি না। কি করব। শর্ত নয়, শর্তের ছলনাতেই কাত করেছিলাম পারমিতাকে। সেই ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে এখন।'

'ছলনা!' মিসেস চ্যাটার্জী হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'পারমিতার সঙ্গেও ছলনা করেছ। ভারী বদ্ ছেলে তো তুমি। শোন, কালই বাড়ি যাবে। আর হ্যাঁ, পারমিতার সঙ্গে মিলমিশ রেখে চলবে, বুঝেছ?'

নিতান্ত অনিচ্ছায় অর্ক ঘাড় কাত করল, 'হ্যাঁ, মাসিমা।'

অর্কের ঘাড় কাত করার ভঙ্গিতে যে আনুগত্য রয়েছে সেটায় নয়, তার মত সুপুরুষের কাচুমাচু মুখ দেখে ঠোঁট টিপে হেসে বাঁচে না সুব্রত। মেজাজি ঢঙে মিসেস চ্যাটার্জী বেরিয়ে যেতেই সেই অবরুদ্ধ হাসি মুখের আগল ভেঙে সশব্দে বেরিয়ে এল।

অর্ক কেমন রাগরাগ মুখে তাকাল সুব্রতের দিকে। তারপর মিসেস চ্যাটার্জীর গরম করা চেয়ারে ধপ করে বসে অসহায় গলায় বলল, 'আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে, তুমি হাসছ? শেষ পর্যন্ত পারমিতার অন্যায় মেনে নিতে হবে!'

সুব্রত এ কথার প্রতিবাদ করল। 'অন্যায়! কিসের অন্যায়? প্রায় দুশ বছর পরাধীন ছিল ভারতবাসী, স্বাধীনতা পেয়ে আনন্দে কি করেনি! এখনও করছে···কত অবাঞ্ছিত, অসামাজিক কাজ। কত! এতো সামান্য। চারদিকে যখন মুক্তির গান ধরেছে সূর্যের নারীরা তখন হাজার হাজার বছরের পুরনো কারাগারে পরাধীন, পোষমানা একটা নারী সেই গান শুনে আনন্দে কারাগারের বাইরে হুট করে এসে নোংরায় একটু মুখ দিয়েছে! বেশি বাড়াবাড়ি করো না। অনেক, অনেকদিন ওদের। ভিতরের আগ্নেয়গিরিগুলো চুপ করে আছে, জেগে উঠলে মহাপ্রলয় হবে।'

সুব্রতের এই অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর সংলাপ অর্কের সনাতন চিন্তার গলা টিপে ধরল। সে শ্বাসরুদ্ধ। কি বিপদ! ফাউস্টের আত্মাকে উদ্ধার করেছিল প্রেমের শক্তি। তার আত্মাকে উদ্ধার করবে কে? কে? কে?

॥ পনের ॥

'কাকু, একটা কথা বলব?'

মানদার কথা শুনে মুখ তুললেন অলকেন্দু। গাল ঢোবা, ভাত ভর্তি। চর্বনকার্য স্থগিত। চোখ বিস্ফারিত। মানদা কথার তুবড়ি। সকালে সেই তুবড়িতে আগুন দেয়, সারাদিন কথার ফুলঝুরি ঝরে। সে কিনা সবিনয়ে অনুমতি চাইছে। মুখের ভাতগুলো গোৎ করে গিলে, ফিক করে হাসলেন, এখনও বলনি! আচ্ছা, বল—!'

অলকেন্দুর পাতে ভাত নেই। মানদা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'দুটো ভাত দেব?'

অলকেন্দু মাথা নাড়লেন, 'না!'

তারপরই বললেন, 'কই, বল—'

মানদা মুখ নিচু করল। বলল, 'দিদি আর অর্ক দাদাবাবুকে নিয়ে লোকে হাসি করা করতেচে। এই তো সকালে, পুকুরে চান করতি গিচিলাম। কি ধাসটুমু গীদের! হি হি করি হাসতিছিল, বলতিছিল, কত দ্যাখবো আর! একজন তো মাকেই বলল, কি গো মানদা, ভাইবোনে পেরেম করতেচে। তুমি কিছু জান না? িত্তি জ্বলে গিচিল। আমিও মানদা, কথার কম যাইনে, দিইচি দু'কথা শুনিয়ে।'

অলকেন্দু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। হেঁট মুখ। এ কথা তাঁর কানে এসেছে। উড়ো বরের মত। সেটা যে তাঁকে সরাসরি মানদার কাছ থেকে শুনতে হবে তা অভাবিত। ছি ছি! কুণ্ঠিত মুখে হাত ধুয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। মাথার মধ্যে কটা অস্বস্তিকর যন্ত্রণা হচ্ছে। শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

না, আর চুপ করে থাকা যায় না, কিছুতেই না। যে কোন মুহূর্তে বড় কিছু তে পারে। এখুনি কিছু একটা করতে হবে। পারমিতাই বা কেমন মেয়ে! মী কি করে, কোথায় যায়, এ সব কি সে কিছুই জানে না, অথবা জেনেও, নিশ্চিত-র্ভয়?

লীনাকে অবিশ্বাস করতে মন চাইছে না। লীনা যে তাঁরই গড়া। তিলে তিলে, ন্দরভাবে, নিজের মনের মত করে।

তারপরও এক ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল। অলকেন্দু খেয়াল করতে পারলেন। অর্কের সঙ্গে লীনার বিয়ের কথাবার্তা, অর্কের গোঁয়াতুর্মি, পারমিতাকে বিয়ে, দার কথা বিশ্বাস্য কিনা এই সব নানারকম চিন্তার মধ্যে অলস একটা ঘণ্টা। খেয়াল ন হল তখন উঠে পড়লেন।

বিকেলে যথারীতি ঘেরিতে। প্রধান আলার সামনে হাতলওয়ালা আরাম কেদারায়! স্য-চাষ নেই, ব্যস্ততা নেই। নির্জন ঘেরি।

এই সময় রামসুন্দর এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। নিঃশব্দ চরণে। তাকালেন তাঁর ক। অমনি আক্রোশ আর প্রতিশোধস্পৃহা যেন তাঁর মগজে থাবা গেড়ে বসল। দৃষ্টি হল। কিন্তু ঘুঘু রামসুন্দর এই মনোভাবকে মুহূর্তের মধ্যে ফিতের মত গুটিয়ে লন।

অলকেন্দুর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'আপনি! কি ব্যাপার?'

এ কথার কোন জবাব দিলেন না রামসুন্দর। স্মৃতিভারাতুর চোখে চারদিকে কালেন। নেই ছোট আলা। নজরচৌকি। নেই কোন পাহারাদার! অবশ্য ল জল থই থই। তাহলে কি ঘেরির জল সব খালে। ভোঁড় মত। তিনি কেন্দুর দিকে তাকালেন। বললেন, 'তুমি কি ঘেরি তুলে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। খালের ওপারে একটা কমপ্লেক্স গড়ে তুলব।'

'কমপ্লেক্স?'

'কারখানার মত কয়েকটা লম্বা লম্বা শেড। সেখানে সেলাই-মেশিন বসবে। এছাড়া ামঘর, কাটিংশপ, অফিস এই সব আর কি।'

রামসুন্দরের ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল। মুহূর্তমাত্র। তারপর সহজ হয়ে গেল। বললেন, 'মেয়েদের স্বনির্ভর করে তুলতে চাও? ভাল, মনে রাখার মত একটা কাজ।'

রামসুন্দরকে অলকেন্দু হাড়ে-হাড়ে চেনেন। এক পা শ্মশানে, হলেই বা কি, অপর পায়ে ঠিকই বল পাঠিয়ে দেন গোলে। এত কুটিল এবং এতই ধুরন্ধর যে একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার হওয়া সত্ত্বেও তিনি মনে মনে সমীহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এই যে একটু ভুরু কোঁচকালেন এতেই তাঁর অস্বস্তি হচ্ছে। সময় যতই এগোবে, এই অস্বস্তি ততই বাড়বে। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমাকে এখন উঠাত হবে। আপনি কি কিছু বলবেন?'

'তুমি কি লীনার বিয়ের ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?'

'লীনার বিয়ে। না, নাতো—'

'একটা ভাল ছেলে। যদি অনুমতি দাও—'

'অনুমতি আবার কি। দেখুন না, যদি ভাল ছেলে হয়, লীনা নিশ্চয়ই অমত করবে না।'

'না, মানে মেয়ে তো। বুক ফাটে চড়চড়, মুখে ন্যাকামি।'

'লীনা সে ধরনের মেয়ে নয়।' বলেই থমকে গেলেন। মুখ একটু গম্ভীর হল এবং নিচুও।

অলকেন্দুর মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে মনে মনে হাসলেন রামসুন্দর। স্বগতোক্তির মত বললেন, 'অ্যায়, এইবার লেগেছে ভেলকি। লাগ ভেলকি লাগ, সবার চোখ ছেড়ে শুধু অলকেন্দুর চোখে লাগ।'

অলকেন্দু হেঁট মুখ তুলে বললেন, 'কি বললেন?'

'কই, কিছু না তো! তাহলে ছেলেকে বলি যে তোমার মত আছে?'

'ছেলের বাড়ি কোথায়?'

'এই গ্রামে। তুমি তাকে চেন।'

এতে স্তম্ভিত হলেন না অলকেন্দু। এমনও তো হতে পারে, এই গ্রামেরই ছেলে বাইরে চাকরি করে। তিনি বললেন, 'কি নাম তার?'

'অরিত দাস। উপ-প্রধান।'

অলকেন্দু একটু বিরক্ত হলেন। সেটা প্রকাশ পেল চোখেমুখে। গলাটা স্বাভাবিক রেখেই বললেন, 'ওর সঙ্গে লীনার বিয়ে হতে পারে না।'

তারপর একটু ব্যস্ত হয়েই চেয়ারটা গুটিয়ে প্রধান আলার মধ্যে ঢুকলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসে শিকলি তুলে দিয়ে দরজায় তালা দিলেন।

রামসুন্দর বললেন, 'ভুল করছ অলকেন্দু। লীনা ভাল মেয়ে নয়। ডাইনী বিয়ে দিয়ে এখুনি বিদেয় কর। তুমি জান না, ও অর্ককে বশ করেছে। তার সংসার ভেঙেছে। পারমিতা আর অর্ক এখন একসঙ্গে থাকে না।'

অলকেন্দু হেঁদিয়ে এলেন তাঁর কাছে। 'এসব কি বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি। বিশ্বাস না হয়, যাও, কলকাতায় গিয়েই দেখে এস।'

অলকেন্দু গুম মেরে গেলেন। এরপর আর কি বলার আছে তাঁর। হয়ত সত্যিই একটা কিছু ঘটেছে। অর্ক বাড়ি এসেছিল অনেকদিন পরে, একটানা পনের-কুড়ি দিন থেকেও গিয়েছিল। একা। তাঁর একটু সন্দেহ হয়েওছিল। কিন্তু কিছু বলেননি। আসলে অলকেন্দু ওদের সম্পর্কে অদ্ভুত উদাসীন। কখনও কলকাতায় ওদের কাছে যাননি। হৃদয়ে হৃদয় মেশেনি। সুখদুঃখের বিনিময় হয়নি। অর্ক লীনাকে বিয়ে করতে অসম্মত হওয়ায় তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন এক আশ্চর্য সুস্থ মনে। অন্তত পারমিতাকে বুঝতে দেননি যে তিনি এ বিয়েতে অসন্তুষ্ট।

অলকেন্দু কখনও একথা ভাবতে চাননি, বলতেও চাননি কাউকে। তাঁর কাছে এই ঘটনাটাই এক অপমান-জড়ান স্মৃতি। অর্ক আর পারমিতার উপর এখনও তিনি অকরুণ।

কোনও স্মৃতি অমোঘ নিয়মে সময়ের পলিমাটিতে চাপা পড়ে, কোনটা রক্তে বাসা বেঁধে থাকে। এই শেষেরটা বড় তীব্র। অতীত আর বর্তমানকে একাকার করে দেয়। এইরকম স্মৃতির মধ্যে অলকেন্দু। তিনি অসহায়। যন্ত্রণাবিদ্ধ। স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি গোলগোল পাকিয়ে যাবার মুখে হঠাৎ তাঁর মনে হল নারী পুরুষকে সুন্দর করে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীকে। জীবনটা কবিতা হয়ে ওঠে। একটা মেয়ে কিনা পারে। একটা অর্থহীন ছন্নছাড়া পুরুষের জীবনের প্রতিটা ক্ষণকে সে অর্থময় করে তুলতে পারে। লীনা তা পারেনি। সে তার বর্তমান জীবনকে মূলধন করে অর্ককে কাছে টানতে পারেনি। বরং অর্কের ঘৃণা, অবজ্ঞা, অবহেলা মাথায় নিয়ে অসহায়ের মত সরে এসেছিল। আজ কি সেই অপমানের শোধ তুলছে সে?

তিনি কোনমতেই লীনাকে নির্দোষ ভাবতে পারছেন না। একজনের কথা মিথ্যে হতে পারে। লোকে বলছে। যা রটে তার সবটা সত্য না হতে পারে, কিছু তো সত্য বটে। সেই কিছুটা সত্যের প্রখর উত্তাপ তার বুকে বৈশাখের দ্বিপ্রহরের মত ছড়িয়ে পড়ছে। বদলে দিচ্ছে মনের গঠন, চিন্তার প্রকৃতি। তাঁর এতকালের ভালবাসা, অনাবিল উদারতা বাজে কাগজের মত ড্যালা পাকিয়ে অকরুণ হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, তাঁরই ছেলে অর্কের জীবনের সুখশান্তি নষ্ট করছে লীনা। হ্যাঁ, লীনাই। মন যত ভাঙছে, তত অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে তাঁর চেহারা। কপালে ভাঁজ, দৃষ্টিতে কাঠিন্য, উদ্ধত ভঙ্গি।

এভাবে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে রামসুন্দরকে পিছনে ফেলে চলে এলেন বাড়ি। বারান্দায় উঠে অন্ধকার কাঁপিয়ে হাঁক পাড়লেন, লীনা—

লীনা যখন অফিস থেকে বাড়ি এসেছিল, তখন বিকেল ক্লান্ত চরণে সন্ধ্যেমুখো। বাথরুম থেকে ফ্রেসট্রেস হয়ে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। এখন সন্ধ্যে ফিনফিনে কালো শাড়ি পরে মূর্তিমতী।

অলকেন্দুর চিৎকার শুনে সে অবাক হল। অলকেন্দু তো এমন চিৎকার কখনও করেন না। তড়াক করে খাট ছেড়ে নামল। তারপর সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

ইতিমধ্যে অলকেন্দু তার ঘরে চলে এসেছেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল লীনা। 'কাকু, কি হয়েছে?'

যেভাবে গর্জন করে দ্রুত পদক্ষেপে লীনার ঘরে ঢুকেছিলেন, সেইভাবে, মেজাজি কিন্তু বলতে পারলেন না। কিরকম যেন নরম গলায় বললেন, 'লোকে তোকে অর্ককে নিয়ে নানারকম কেচ্ছা কেলেঙ্কারি ছড়াচ্ছে কেন রে ?'

লীনা বুঝতে পারল কেউ অলকেন্দুর কান ভাঙিয়েছে। সে বলল, 'কি যে ব বুঝছি না! এই নাটুকে ডায়লগ কেন, তাও বুঝছি না!'

'তুই বুঝছিস না, আমি কি সব বুঝছি! তুই অর্ককে ভালবাসিস। সে এ তার সঙ্গে ফুসুরফাসুর করিস। এই করেই পারমিতার সংসারে অশান্তির আগুন জে দিয়েছিস। এসব কি শুনছি ?'

'লোকে এ সব বলছে ? কই আমি তো শুনিনি।'

অলকেন্দু কিছুটা চটে গেলেন। 'এত লোকে বলছে—তুই শুনিসনি! তুই কালা।'

লীনা অলকেন্দুর হাত ধরে বলল, কাকু, উত্তেজিত হয়ো না। বসো, বসোতো—

প্রায় টেনে এনে অলকেন্দুকে চেয়ারে বসিয়ে দিল লীনা। তারপর খাটে পা ঝু বসে বলল, 'আচ্ছা, একটুও খটকা লাগছে না তোমার ? মনে হচ্ছে না এর পিছনে ক গোপন অভিসন্ধি কাজ করছে ?'

অলকেন্দু থতমত। তিনি কি ভুল করছেন ? এসব কি শত্রুর রটনা ?

লীনা আবার বলল, 'বিশ্বাস কর, সব—সব মিথ্যে।' ঠিক তখনই ডুব-দেওয়া মা জলের তলা থেকে যেমন ভুস করে মাথা তোলে তেমনি যেন অন্ধকার ফুঁড়ে মাথা ত মানদা।

'মিথ্যে! লোকে মিথ্যে বলতেচে। আর কত ফেরেব্বাজি করবা! আমি বলি কাকু, এর সব—সব সত্যি।'

মানদার স্পর্ধা অসহ্য। চিৎকার মেরে উঠল লীনা, মানদা—'

মানদা অসহায় চোখে অলকেন্দুর দিকে তাকাল। বোধহয় তার পক্ষ নেবেন আশায়। কিন্তু অলকেন্দুর দিক থেকে তেমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তাদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্ক হলেন। মানদার বুকের ভি অসহায়তার একলা পাখিটা তুড়ুক করে লাফাল যেন। সে কঁকিয়ে উঠল, 'এসব আমি বলতিচি। লোকের বুক পাথরপারা। তারাই তো যা-তা বলতেচে। শুনতিচি, ফাটতেচে। হাজার হোক, এ বাড়িতে অনেকদিন কাজ করতিচি। এ বাড়ির কে কেলেঙ্কারি শুনলি কষ্ট হয় না বুঝি? খালি অর্ক দাদাবাবু না, লোকে বলে দিদি নাকি বিডিও সাহেবের সঙ্গেও ফষ্টিনষ্টি করতেচে।'

অলকেন্দু এবার ঘাড় ঘুরিয়ে মানদার দিকে তাকালেন। মানদার চোখে পড়তেই সে চোখ সরিয়ে লীনার চোখে রাখল। উরি বাব্বা, এ যে বাঘিনীর চো আগুন ঝরা। সে ভয়ে ঝিঁ ঝিঁ ডাকার মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।...আমার হ মরণ! কোন্ চুলোয় যে মুখ রাখি এখন।'

লীনার সন্দেহ অনেকক্ষণই দানা বাঁধছিল। এখন তা নিরেট হল। সে মান

একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'ভিতরের খবর জানতে আমার দুটো দিনও লাগবে না। তুই যদি এই চক্রান্তে জড়িত থাকিস, কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেব। এমনকি, গ্রাম ছাড়াও করতে পারি। এখনও বল, কে তোকে একথা রটনা করতে বলেছে, রামসুন্দর না অরিত ?'

ঝাঁঝিয়ে উঠল মানদা। 'বলি আমি কি কুচুটে! যার নুন খাই তারই সব্যনাশ করতিচি ? কত কি জান, মেয়েমানুষের পা হড়কানোর খবর যে হাওয়ায় উড়তি পারে, জান না ?'

আর সহ্য করতে পারল না লীনা। ঠাটিয়ে এক চড় মারল। সঙ্গে সঙ্গে মানদা চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

এতক্ষণে মুখ খুললেন অলকেন্দু—যত দোষ নন্দ ঘোষ এই মানদার ? তোর বুঝি কোন দোষ নেই ?

লীনার মত সবল-মন-মেয়ে এবার কেমন দুর্বলের মত আর্তনাদ করল, কাকু !

মানদা হাউ হাউ করে কাঁদছে। এইমাত্র যেন তার ছেলে মরেছে। এই মড়াকান্নায় বিরক্ত অলকেন্দু ধমক দিলেন। 'মানদা, তুই যা। যা এ ঘর থেকে।'

এই ধমকানিতে মানদার কান্না ফোঁপানিতে সাব্যস্ত হল। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে, লীনার দিকে বিদ্যুৎ চোখে এক পলক তাকিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর তখনই, অলকেন্দু বললেন, 'পারমিতা আর অর্ক একসঙ্গে থাকে না কেন ? কি এমন ঘটনা যা ওদের বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করেছে ?'

অলকেন্দুর এই কথাগুলো লীনার হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে একটা বিষণ্ণ সুর তুলল। এ যেন অর্কের কণ্ঠনিঃসৃত বাণী থেকে ভেসে আসা এক টুকরো সুর। এ সুর ছন্দহীন। জীবন বিবর্জিত। তার মনের অন্দরে জেগে থাকলেও কখনও বেজে ওঠেনি। সেই না-বাজা সুর আজ নির্মম বাস্তব হয়ে হৃৎপিণ্ডের গতিটা ধুকধুক স্পন্দনের সঙ্গে তালে বেজে চলেছে। কে জানে, বুঝিবা ভিতরের উত্তেজনায় এমনটা মনে হচ্ছে।

লীনার মনে পড়ে গেল অর্কের জীবনের সেই ছোট্ট ট্রাজেডি। এমন কিছু নয়। এই সমাজের পুরুষের চিন্তায় হয়ত অনেক, মর্মান্তিক। আর এই কারণেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়। তাদের জীবনের আকাশে ধূমকেতুর মত তার অশুভ ছায়া পড়েইনি। অথচ কি আশ্চর্য, অলকেন্দু তারই ছায়া দেখছেন। ঠিক দেখছেন না, দেখান হচ্ছে। কি অদ্ভুত রটনা মানুষের!

লীনা মনে করতে চাইল, সংসারে সে-ই এখন অলকেন্দুর সুখদুঃখের সাথী, অলকেন্দুর সমস্ত সুখ সমস্ত আনন্দ যে আশঙ্কা, যে সন্দেহ অকারণ কেড়ে নিচ্ছে তা দূর করার তার তো একটা দায় আছে। কলকাতায় গেলে পারমিতা আর অর্কের জীবনের এই করুণ অধ্যায়টা জানতে পারবেন। সবটুকুই কি আর। কিছুটা অজানা থেকেই যাবে। যেটুকু জানবেন, সেটাই তাঁর ভিতরটাকে ভেঙে চুরমার করে দেবে। তাহলে তো এখন

তাকেই বলতে হয়। কিন্তু সে কি পারবে! কেমন করে জানাবে, তাঁর বংশানুক্রমিক ছন্দ কেটে দিয়েছে পারমিতা।

এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, এই অসহায়তার আবর্ত লীনার মনের দৃঢ়তাকে শিথিল করে দিল। সে বিছানায় বসে পড়ে ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমি কিছু জানি না। প্লিজ, আমাকে একটু একা থাকতে দাও। তুমি যাও।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি, উঠে দাঁড়ালেন অলকেন্দু, 'শুনে রাখ, লোকে যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, তোকে কিছুতেই ক্ষমা করব না।'

এই সংসারের যাত্রাপথে লীনার জীবন অনেকটা গড়িয়ে গেছে। পথের বাঁক একটা একটা করে অদৃশ্য হয়েছে, নতুন নতুন আলোর ফোকাস পড়েছে তার চোখে। তার স্বপ্ন চিন্তা কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন পথে এগিয়েছে। তখন হাত ধরে রেখেছিলেন সুরমা। এখন সুরমা নেই। অলকেন্দুই সব।

লীনা একরকম নিশ্চিত, সেই অলকেন্দুই প্রকারান্তরে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে গেলেন। লোকের কথা তাঁর কাছে বড় হয়েছে। তার আর অলকেন্দুর সম্পর্কের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটাই বোধহয় খোয়া গেছে, যার নাম বিশ্বাস। এই অনুভূতি তাকে গভীরভাবে নাড়া দিল। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। বালিশে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠল।

॥ ষোল ॥

রাতে দু' চোখের পাতা এক করতে লীনার কষ্ট হলেও সময় যথারীতি এগিয়েছে। সকাল হয়েছে।

তখন আটটা। ব্রেকফাস্টের সময়।

অলকেন্দুর দেখা নেই।

একটু অবাক হল লীনা। অলকেন্দু রোজ মর্নিংওয়াকে যান। বাড়ি ফেরেন সাতটার মধ্যে।

সে মানদার কাছে গেল। মানদা ঘর মুছছে। পদশব্দ টের পেল, কিন্তু মুখ তুলল না।

লীনা জিজ্ঞাসা করল, 'মানদা, কাকু কোথায় গেছে রে?'

তেমনই ঘর মুছতে মুছতে মানদা বলল, 'কোলকাতা।' বলেই হাতের গতি দ্রুত করল।

লীনা গম্ভীর হল। যে গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব প্রখর হয়ে ওঠে সেই গাম্ভীর্য নয়, একটা কি রকম কষ্টের গাম্ভীর্য ফুটে উঠল লীনার মুখে।

সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কি করে পারবে। সুরমার মৃত্যুর পর লীনাকে না বলে কখনও কোথাও যাননি যে অলকেন্দু!

যা সে করেনি কখনও, সেটাই করল এবার। অন্তরের চোখ দিয়ে দেখল অলকেন্দুকে। ভালবাসা বা শ্রদ্ধার মানুষকে অন্তরের চোখ দিয়েই যে ভালো দেখা যায়! সে দেখল, অলকেন্দুর বুকের গভীরে যেখানে সে এত বছর বসেছিল সেখানে তার সে আসনটা আর নেই। তার বুকের ভিতর মুহূর্তের মধ্যেই সেই কষ্টের দাপাদাপি শুরু হল। এর মধ্যেই সে অনুভব করল, মানুষের জীবনটা বুঝি এই! এই রোদ, এই মেঘ।

এই দার্শনিক ভাবনা যেমনি অকস্মাৎ হল তেমনি চলেও গেল। এমনটাই হয়! তাই তো এত দুঃখ, এত কষ্ট!

সেই কষ্টের আবর্তে ধ্বস্ত দেহমন নিয়ে ঘরে ফিরে এল। টেবিল থেকে সুরমার স্ট্যাণ্ডওয়ালা বাঁধানো ছোট ফটোটা নিয়ে বুকে চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে টপটপ করে দু ফোঁটা জল পড়ল সেটার উপর।

কাঁদতে কাঁদতে লীনা এখন স্মৃতির দেশে। সে এই ঘরে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার দৃষ্টি চোখে নেই। তারা দুটোতে চলে গেছে স্মৃতির স্পষ্টতার দিকে। সুরমা অসুস্থ। এই খাটেই শুয়েছিলেন। একটু একটু করে ক্যানসারের মরণকামড় তার কোষের স্বাভাবিক স্বক্রিয়তাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। অদ্ভুত প্রাণশক্তিতে ভরপুর সুরমা কেমন যেন ক্লান্ত, অবসন্ন। বুকের মধ্যে দমচাপা অন্ধকার। অন্ধকারটা যেন ধীরে ধীরে বুক ঠেলে চোখে নেমে আসছিল। তিনি ইশারায় ডেকেছিলেন লীনাকে। লীনা তার মাথার কাছে গিয়ে বসেছিল। চোখের আকাশ অশ্রু-ঝাপসা। সুরমা তার ডান হাতখানা লীনার হাতের উপর রেখেছিলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'কাঁদিস না মা। চিরকাল কি কেউ বাঁচে! আমার সময় হয়েছে, চলে যাচ্ছি। একটা কথা, বলার দরকার তোকে। এই বাড়িটা তোর নামে উইল করে দিয়েছি। সময় বড় বেইমান। কে জানে কখন কি হয়!'

ফটোটা টেবিলের উপর রেখে সে আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছল। তারপর বিছানায় বসল। সুরমার ছবির দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বলল, 'আণ্টি, সত্যিই তুমি দূরদর্শিনী। এখন আমি কি করব বলে দাও।'

সুরমা এখন অতীত। কিন্তু অনুভূতির সূক্ষ্মতায় এখন, এই মুহূর্তে, তা ধরা দিয়েছে লীনার কাছে। দিলেই বা। অতীত কি কথা কয়! সে নিজেই স্থির করল, এ বাড়িতে সে আর থাকবে না। যে মহীরুহ এতদিন তাকে ছায়া দিয়েছে, জীবনের ঝড়ঝাপটা থেকে বাঁচিয়েছে, সেটা আজ বাজ-ঝলসানো শুকনো প্রাণহীন ন্যাড়া গাছ ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে থাকলে সে মরে যাবে।

আপাতত সে সুব্রতের বাসায় যাবে। তারপর একটা ঘরটর দেখে নিয়ে চলে যাবে। একা। ভাবনা কিসের!

মাঝেমাঝে লীনা একটা এ্যাটাচি নিয়ে অফিসে আসে। তাতেই তার জামাকাপড়, সুরমার

ফটোটা আর অফিসের কিছু কাগজপত্তর ঠেসেঠুসে পুরে নিল। সব কি ধরে! যা ধরে! স্যুটকেশ লোকের কৌতুহল আর বিস্ময়ের উদ্রেক করতে পারে। তাই এই অ্যাটাচি।

লীনা বেলা বারটায় বাড়ি থেকে বের হল। রোজ প্রায় এই সময়ই বার হয়। আসলে সে চায় না মানদা কিছু অনুমান করে।

অরিত অফিসে নেই। হয়ত এখনও আসেই নি। আছেন পঞ্চায়েত-সচিব সুহাস বিশ্বাস আর কর্ম-সহায়ক হারাধন চক্রবর্তী। রোজকার মতই আছে চৌকিদার। সামনের বারান্দায়। টুলে বসে।

লীনার সময় পেরিয়ে গেল কাজের মধ্য দিয়ে, খানিকটা। খানিকটা আবার নৈঃশব্দের বেদনাবিধুর আলাপনে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক একটা নির্জন মুহূর্ত আসে যা পৌষের তীব্র শীতের মত কামড় দেয়। এই মুহূর্তগুলো লীনাকে তেমনি কামড় দিয়েছিল, বেঁচে গেল চৌকিদারের সরব উপস্থিতিতে।

'দিদি, মোনাজাত না ফের সুন্দরীকে ঘরে নেচে।'

এ যেন বিশ্বাস করা যায় না, অসম্ভব বলে মনে হয়। তিন তালাকের পরও সুন্দরী ঘর ফিরে পেল। লীনা নিজেই কত পারিবারিক সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছে, সুষ্ঠুভাবে, আশ্চর্য দক্ষতায়। সেই সব সাফল্য এই সাফল্যের আলোয় ম্লান মনে হল।

'অ্যাঁ, কি বললে? মোনাজাত সুন্দরীকে ঘরে নিয়েছে! সত্যি! সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, গো দিদি। সুন্দরী তো দারুণ খুশী। বলেচে আমাকে দাওয়াত করবে।'

এই সময় ভেসে এল সমবেত কণ্ঠস্বর, কারা যেন সমস্বরে চিৎকার করল, পুরুষ-শাসিত সমাজ—জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। দু মিনিট পরে নতুন নতুন স্লোগানে অফিস কেঁপে উঠল।

লীনা বাইরে এল। পিছনে চৌকিদার। বিশাল মিছিল। লীনার মনে হল মিছিলের লেজ আমলানীর মোড় ছুঁয়েছে। এর পুরোভাগে সুনীল, রামসুন্দর এবং ডাক্তার, উকিল, সরকারী চাকুরে, শিক্ষক……আরও কত পেশার মানুষ। সব স্লোগানেরই এক কথা, নারী আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে কেন? কেন বিকল্প সমাজ আর সংস্কৃতির কথা বলা হচ্ছে? একটা স্লোগান ভিন্ন, একটু অদ্ভুত গোছের। 'নারীর শত্রু নারী / তাকে কি ধার ধারি।'

মানুষগুলো উত্তেজনায় মোচড় মেরে উঠতেই লীনা গলা তুলে বলল, 'দয়া করে আপনারা শান্ত হোন। আমার কথা শুনুন।'

জমায়েতে তেমনি হৈচৈ। কারও কথা বিচ্ছিন্নভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে না।

এই হৈ হট্টগোলের মধ্যেই পুরোভাগ থেকে সুনীল একটু সামনে এগিয়ে এসে, জমায়েতের দিকে মুখ ফিরিয়েই, গলা সপ্তমে তুলে বলল, 'আপনারা একটু চুপ করুন। প্রধান কি বলছেন শুনুন।'

এইবার একটু শান্ত হল জমায়েত। এই সুযোগে একজন তালঢ্যাঙা, কালো, ছুঁচোর মত সরু মুখওয়ালা লোক চিৎকার করে বলল, 'কি শুনব, অ্যাঁ? আমার

ঘরের মেয়েছেলেটাকে উনি ক্যারাটি শিখিয়েছেন। মারতি গেলি মুখে কি রকম বিদ্ঘুটে রকম শব্দ করে সে উল্টে মারতি আসে।'

লোকটা থামতেই ভিড়ের মধ্যে কে যেন বলল, 'আমরা আপনার পাঁচালি শুনতি আসিনি। জানতি এইচি নারী-আন্দোলন বন্ধ করবেন কিনা?'

লীনা বলল, 'কে আপনি? সামনে আসুন।'

সেই তালঢ্যাঙা লোকটাই বলল, 'এই তো সামনে আছি আমরা। বলুন না—'

লীনা বলল, 'এখন কি আন্দোলন বন্ধ করা যায়! করাই বা কি উচিত। এ আন্দোলন নারীর চেতনায় পেঁাছে দিচ্ছে এক আশ্চর্য সুন্দর সম্ভাবনার স্বপ্ন। কি জানেন সেই স্বপ্ন? সম্পত্তির অধিকার। এ অধিকার আপনারা পেয়েছেন সমাজের কাছ থেকে। নারী আর পুরুষ নিয়ে যদি সমাজ হয়, তাহলে এই সম্পত্তি ভোগ করার নৈতিক অধিকার কি শুধু আপানাদেরই? অথচ দেখুন, সম্পত্তির নিরানব্বুই শতাংশের মালিক আপনারাই।

ফের হইচই শুরু হল। এর মধ্যেই একজন লোক ভিড় ঠেলে পুরাভাগে এলেন। কেমন ভোলানাথ-ভোলানাথ চেহারা। চোখের দৃষ্টি দার্শনিক উদাসী। সেই দৃষ্টি আর এক ধাপ উদাসী করে বললেন, 'আমি কিন্তু সম্পত্তির মালিকটালিক নই। মালিক আমার বউ। একমাত্তর বউ। শুধু কি সম্পত্তি, আমার এই দেহটারও একচেটিয়া মালিকানা তার। সন্ধ্যে হলেই গা ম্যাজম্যাজ করে। বলে। গা টিপে দিই, হাত টিপে দিই—'

সেই তালঢ্যাঙা লোকটা বলল, 'দাদা, টেপা থামান। যা ফেস্না তাতে লজ্জাস্থানে চলে যেতে পারে।'

এই কথা শুনে পাশের লোকগুলো খি খি করে হেসে উঠল।

লীনা গলা চড়াল, যতটা সম্ভব চড়ান যায়। বলল, 'বউয়ের নামে সম্পত্তি কিনলেই বউ সেই সম্পত্তির মালিক হয়ে যায় না এই সমাজে। যাক্গে, শুনুন। এই নারী-আন্দোলন সম্পর্কে লোকমুখে হয়ত নানা কথা শুনেছেন। তার সবটা সত্যি নয়। একটা কথা আপনাদের জানা দরকার। সেটা হল, পুরুষের একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যুগ যুগ ধরে এই পৃথিবীতে। অনেকে ভাবছেন, সেটাই নারী গ্রহণ করতে চাইছে। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। ওই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে আমি মেয়েদের বোঝাতে চেয়েছি, নারী নারীই। নারী কখনও পুরুষ হতে পারে না। পুরুষের সংস্কৃতির কিছুটা গ্রহণ করা চলে, কিন্তু সবটা গ্রহণ করলে বিপদ কাটবে না, বাড়বে। কেননা পুরুষের অভ্যস্ত সংস্কৃতি মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলছে। এখন যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন তা হল, পুরুষকে নারী-সংস্কৃতির কিছু গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। নারী-সংস্কৃতিতে এমন অনেক কিছুই আছে যা পুরুষের খামখেয়ালীপনায় 'নষ্ট প্রায়' সভ্যতার রক্ষাকবচ হতে পারে।'

সামনের সারিতেই একজন স্থূলকায় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে কোট-প্যাণ্ট। কালো রংয়ের। তিনি বললেন, 'বেশ কথা বলেন আপনি। ঝানু রাজনীতিকের মত সাজিয়ে গুছিয়ে। আমি উকিল। আমিও কথার প্যাঁচ-পয়জার কম জানি না।'

একটু থেমে গায়ের কোট টেনেটুনে ঠিক করে নিয়ে বললেন, 'পুরুষ নারীর সংস্কৃতি গ্রহণ করবে। রামচন্দ্র! যেমন চলছে তেমনিই সব চলবে। নারী আজকের নারী হয়েছে এক জীবনে নয়, পুরুষানুক্রমে। হাজার হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাস বলে, কর্ম অনুযায়ী পুরুষ আর নারীর দেহমন গড়ে উঠেছে। আর এই কর্মে নারীকে প্রবৃত্ত করিয়েছে নারীই। মা-ই মেয়েকে মা হতে মানসিকভাবে প্রস্তুত করায়। স্বামী নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সর্বদুঃখহারী পরিত্রাতা শ্রীমধুসূদন। এই চেতনানাশক ক্লোরোফর্ম দীর্ঘ অতীত ধরে মেয়ের মনে ইনোকুলেট করেছিল মা-ই। এবং বর্তমানেও করছে। পরিণতি তো দেখাই যাচ্ছে, গভীর এক আচ্ছন্নতার মধ্যে স্বামীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। এবং সঙ্গে সঙ্গেই নারীত্বের পূর্ণতা প্রাপ্তির স্বপ্ন। এইভাবেই স্ত্রী হয়েছে স্বামীর সম্পত্তি। নারী হারিয়েছে তার স্বাধীন সত্তা। সে যদি বলতে পারত, পণ তো দূরের কথা, স্বামীর সম্পত্তির সমান অধিকার না পেলে সে বিয়েই করবে না, তাহলে সমাজকে ঠেলে দিতে পারত সামগ্রিক পরিবর্তনের দিকে।'

ভদ্রলোকের কথা দু-চারজন মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। দু-চারজন ভুরু কুঁচকে না-শোনার ভান করে অন্যমনস্ক হয়েছেন। অধিকাংশই শোনেননি, শুনতে পাননি। মাঝে মাঝে লোকে লোকারণ্য সেই ভিড় এমন মোচড় মেরে উঠছিল যে চিৎকার-চেঁচামেচি ছাড়া কোন কথা শোনা যাচ্ছিল না।

হঠাৎ পিছন থেকে ভেসে আসা কিছু মানুষের ধাক্কায় সামনের নেতারা বেসামাল হলেন। মুহূর্তের মধ্যে সুনীল অফিসের বারান্দায় উঠে ভিড় উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনারা শান্ত হোন। দয়া করে আমার কথা শুনুন।'

কে শোনে কার কথা। হৈ-হট্টগোল চলছেই। দেখে মনে হচ্ছে মিছিলের নিয়ন্ত্রণের রশি সামনের বা পিছনের নেতাদের হাত থেকে ছিটকে পড়েছে।

এতক্ষণে হুঁশ হওয়া চৌকিদার ব্যগ্রকণ্ঠে বলল, 'দিদি, থানায় একটা ফোন করি দাও।'

লীনা তাকে ইশারায় চুপ করতে বলল।

এই সময় অফিসের মুখের ভিড় কাটিয়ে লীনার পাশে চলে এল কল্পনা। মুখটা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার ধূম্রচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন। সে বলল, 'সুনীলবাবু, দেখলাম মিছিলের পিছনের লোকজন ভয়ানক ক্ষিপ্ত। এখন আর নেতাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। অনিয়ন্ত্রিত মিছিল বিপজ্জনক হতে কতক্ষণ! এখুনি সরিয়ে নিয়ে যান এ মিছিল।'

সুনীল চিন্তিতমুখে রামসুন্দরের কাছে গেল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই রামসুন্দর বললেন, 'আহা, এত ভয় কিসের! কেউ কিচ্ছু করবে না। প্রধান নারী-আন্দোলন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিলেই চলে যাবে সবাই।'

এই প্রথম রামসুন্দরের উপস্থিতির কঠিন বাস্তবতায় লীনা চিন্তিত হল। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্রীভূত করে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল তাঁর দিকে। একের পর এক মানদার অস্বাভাবিক পরিবর্তন, অলকেন্দুর এতদিনের যাবতীয় বিশ্বাসের শক্ত ভিত নড়ে ওঠা, তার সঙ্গে অর্ককে জড়িয়ে কেচ্ছা কেলেঙ্কারি রটনা, সব হাজির হল তার মনে।

—কেন তাকে অপদস্থ করার চেষ্টা করা হচ্ছে ? কে বা কারা এর পিছনে ?

এই প্রশ্ন গত রাতে বুকের ভিতর বৈশাখের মধ্যাহ্নে ফাঁকা মাঠের উপর ক্রমশ পাক খেয়ে ওঠা বাতাসের ঘূর্ণির মত ঘুরে ঘুরে উঠছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর এই মিছিলে তার অদৃষ্টপূর্ব রহস্যময় উপস্থিতিতে শানিত ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার মত নির্মম বাস্তবতায় স্পষ্ট।

সেই দৃষ্টি না সরিয়েই লীনা বলল, 'আন্দোলন বন্ধ করার আমি কে ? এখন আন্দোলন চালাচ্ছে মেয়েরাই। গ্রামে-গ্রামে। তারাই পারে বন্ধ করতে।'

'বাঃ, বেশ বলেছেন মাইরি। তা ম্যাডাম, আন্দোলন যে বন্ধ করতেই হবে। কেননা এ তল্লাটে ঘণ্টা একটাই, ঝুড়ি ঝুড়ি কেস সামলাতে হয় তাকে। গ্রামে-গ্রামে গিয়ে মেয়েমানুষের গায়ের গন্ধ শুঁকার সময় কি তার আছে।' সেই তালঢ্যাঙা লোকটা দাঁত বের করে বিচ্ছিরি ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে দু'পা এগিয়ে এল লীনার দিকে, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে বুঝেছেন ? প্রোমিস করুন।'

লোকটার গায়ে জ্বালা ধরানো ভঙ্গিতে কল্পনার চোখ জুড়ে ভাটির আগুন ঠিকরোল। কিন্তু যেহেতু লীনা রয়েছে, শুনেছে সব, সেহেতু সে কিছু বলল না, বরং লীনার বলার অপেক্ষায় তার দিকে তাকাল।

মানুষের অশ্রাব্য কথা হজম করতে লীনা অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নারী-আন্দোলন নিয়ে কত কি কথা বলে লোকে। উত্তর দিলেই অনর্থ। অন্তত লীনার ক্ষেত্রে সেটাই ঘটছে।

কিন্তু এখন, হঠাৎ কি যেন হল তার। মুখের ভাবে পুরুষালি কাঠিন্য দেখা দিল। সে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'বেলেল্লা করছেন কেন ? আস্পর্ধা তো কম নয় আপনার! জানেন এখুনি আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি ?'

লোকটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল, 'পুলিশ, পুলিশের কথা বলে কোন ফায়দা হবে না ম্যাডাম। পুলিশ আমাকে দেখে, আমিও পুলিশকে দেখি। ফালতু ঝামেলা করছেন কেন বলুন তো! ওয়াদা দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

লোকটার কথা কাছেপিঠের লোকজন ছাড়া কেউ শুনেছেন বলে মনে হল না। শুনবেনই বা কি করে! ভিড়ের মধ্যে এখানে-ওখানে থেকে-থেকে হট্টগোলের তুবড়ি সমানেই ফেটে চলেছে।

লোকটার কথা শুনে সুহাস আর হারাধন হতবাক। মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন এক মুহূর্ত। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুহাস। জানলায় দাঁড়িয়ে রইলেন হারাধন তেমনিই। সুহাস লীনাকে প্রায় ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওসি-কে ইনফর্ম করব ? পুলিশ পাঠাতে বলব ?'

লীনা মাথা নেড়ে সায় দিতেই তিনি পুনরায় ভিতরে চলে গেলেন।

লোকটার আশ্চর্য সাহস দেখে কল্পনা চমকে গেল। তার মনে হল, লোকটার এই সাহসের পিছনে কাজ করেছে লীনার হালকা মেজাজের কথাবার্তা আর সুনীলের নীরব প্রশ্রয়। কালবিলম্ব না করে এক পশলা ক্ষোভ বিরক্তি নিয়ে সুনীলের দিকে তাকাল

সে। বলল, 'সুনীলবাবু হচ্ছেটা কি ? লোকটাকে চলে যেতে বলুন। বন্ধ করুন এই পথ-নাটক।'

লোকটা যেন গোড়ালি ঠুকে এগিয়ে এল কল্পনার দিকে, 'তা ম্যাডাম, আপনি কে ? প্রধানের শাকরেদ বুঝি ? যা বলেছেন, অনেক। এবার চুপ। স্পিকটি নট। ঘণ্টার গায়ে খোঁচা মেরে কেউ কখনও বাঁচতে পারেনি।'

এই সময় ভিড়ের মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল, পুলিশ, পুলিশ। মুহূর্তের মধ্যে মানুষের দৌড়ঝাঁপ আর চিৎকারে চমকে উঠল পঞ্চায়েত-অফিস। এরই মাঝে আচমকা এক ঝাঁক ইট এসে পড়ল কল্পনা আর লীনার উপর। হঠাৎ দু'হাতে মাথা চেপে মরণচিৎকারে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল কল্পনা।

অল্পের জন্য বেঁচে গেল চৌকিদার। তার পায়ের কাছে ইট পড়েছে। সে নিচু হয়ে কল্পনার অবস্থা পরখ করতে গিয়েই তার গলায় মৃত্যুঘর্ঘর শুনতে পেল। সারা দেহ কেঁপে উঠল তার।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব সুহাস আর হারাধন একটু পরেই ত্রস্ত বুকে বেরিয়ে এলেন। রক্তে ভিজে যাচ্ছে মেঝে। তাঁরা দুজনেই ঝুঁকে পড়লেন লীনার উপর।

ইট লীনার ডানহাতের কনুইয়ের উপরে পড়তেই সেও আর্তনাদ করে বাঁ হাত দিয়ে সেই ক্ষতস্থান চেপে বসে পড়েছিল। এরই মাঝে একবার কল্পনার দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু কল্পনার স্থির নিস্পন্দ দেহ দেখেও কিছু বুঝতে পারেনি। এখন তার হাত রক্তে ভিজে একসা। কাপড়ও খানিকটা ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে গেছে এরই মধ্যে। হাড় হিম করা অসহ্য যন্ত্রণায় চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। কি দারুণ মনের জোর। তবু সে হুঁশ হারায়নি। সুহাসের দিকে চেয়ে বলল, 'এখুনি হাসপাতালে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলুন। আর কল্পনাকে একটু দেখুন।'

সুহাস প্রায় দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন। এই সময় হারাধন কল্পনার কাছে গেলেন। ইটের আঘাতে কল্পনার কপালের উপরিভাগ ফেটে চৌচির, ঘিলু বেরিয়ে পড়েছে। তার দীঘল ঘন চুলের খানিকটায় অবিশ্বাস্যভাবে ঢাকা পড়েছে এই বীভৎস দৃশ্য। সেটা দেখতে না পেলেও তার জমাটকালো রক্তমাখা দেহের দিকে তাকিয়ে বুক হিম হয়ে গেল হারাধনের। তিনি ভাবলেন, আঘাত গুরুতর। অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে। সেটা ভাল করে বুঝবার জন্যে তিনি তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ছিলেন, ঠিক তখনই লীনার কান বাঁচিয়ে চৌকিদার চাপা গলায় বলল, 'ও মারা গেছে।'

বুলেটের আঘাতে স্পট ডেড স্বাভাবিক, কিন্তু ইটের আঘাতে যে সেটাই ঘটবে তা কেউ বিশ্বাস করতে পারেননি। না-সুহাস, না-হারাধন।

এখন চৌকিদারের কাছ থেকে শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না, কি করে বাস্তবে এটা সম্ভব হল, ইটের আঘাতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল কল্পনা। একটু আগেও কল্পনা ছিল এক আশ্চর্য সুন্দর জীবন্ত ছবি। বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিংবা বিস্ময়ের আবছা ঘোরের মধ্যেই তিনি সামনে তাকালেন। চারপাশ ফাঁকা। একজনও মানুষ নেই কোথাও। কেমন একটা অথৈ শূন্যতা। হঠাৎ মনে হল, কে যেন রাস্তার

উপর পড়ে রয়েছে। তিনি দ্রুত পায়ে তার কাছে গেলেন। আরে, রামসুন্দর! জামা-কাপড় ধুলোমলিন, ফর্দাফাঁই। বোধহয় মানুষের পায়ের চাপে পিষ্ট হয়েছেন। দেখে তো মনে হচ্ছে দেহে প্রাণের স্পন্দন নেই। তবু, কে বলতে পারে, হয়ত বেঁচে আছেন। তিনি কি করবেন ভাবছেন এমন সময় অ্যাম্বুলেন্স এল। একের পর এক তুলে নিল রামসুন্দর, কল্পনা আর লীনাকে। এ কাজে সাহায্য করলেন সুহাস, হারাধন আর চৌকিদার।

অ্যাম্বুলেন্স চলে যাবার প্রায় পনের মিনিট পরে এল পুলিশ। সবকিছু শুনল, জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারপর চলে গেল।

এই খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কাতারে কাতারে ছুটে এল আবাল-বৃদ্ধবনিতা। ছুটে এল কল্পনার বাবা, মা আর ছোট ভাই। তাদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠল বাতাস।

সূর্য পশ্চিমদিগন্তে ডুবুডুবু। তার বুক জুড়ে চিতা জ্বলছে দাউদাউ। সেই আগুন চোখে নিয়ে পেন পথে নেমেছে মেয়েরা। অবিশ্বাস্য, অভাবনীয় মিছিল। পুরোভাগে জবা আর জাফর। তাদের বুকে কালো ব্যাজ। মুখে শোক-ঘৃণা-রাগ মিশ্রিত স্লোগান।

॥ সতের ॥

এই খবরে মানদা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। কেন যেন তার মনে হল এই ঘটনার জন্যে সে-ও কিছুটা দায়ী। এই অপরাধবোধ থেকে উদ্ভূত অসহায়তা তাকে উই পোকার মত কুরে কুরে খেতে লাগল।

অলকেন্দু নেই। তাকে দেখে নিশ্চয়ই মুখ ফিরিয়ে নেবে লীনা। এখন কে যাবে হাসপাতালে? কেইবা তার খোঁজখবর নেবে? সেই মুহূর্তে, তার সুব্রতকেই মনে পড়ল। সুব্রত লীনাকে ভালবাসে, সে অন্তত লীনার এই বিপদের কথা শুনে চুপ করে থাকতে পারবে না।

সুব্রত অফিসে বসে শুনেছিল আমলানী পঞ্চায়েত-অফিসে কি একটা গোলমাল হয়েছে। গোলমালটা যে প্রকৃত কি ধরনের তা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারেনি। ভেবেছিল সন্ধ্যের দিকে ড্রাইভারকে পাঠিয়ে লীনার কাছ থেকে খবরটা যোগাড় করবে।

অফিস থেকে ফিরে, হাত মুখ ধুয়ে একটা লুঙ্গি পরে, সদ্য ড্রয়িং রুমের সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়েছিল সুব্রত, ঠিক তখনই মানদাকে দেখে সোজা হয়ে বসল।

'জানেন দিদি না হাসপাতালে', শুনে বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। মানদার মুখে কেমন ধূসর ছায়া, গলায় বোবা কান্না।

সুব্রত শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, কি হয়েছে ?'

মানদা সে কথার জবাব দিল না। বলল, 'হাসপাতালে গেলেই জানতে পারবেন। যান, শিগ্‌গির যান। টাকি হাসপাতালে।'

এমার্জেন্সির সামনে সুহাস, জাফর, জবা এবং আরও অনেকে দাঁড়িয়ে। তাদের কাছে যাবার আগেই চোখাচোখি হল সুহাসের, তিনি এগিয়ে এলেন।

—'স্যার, আপনি এসেছেন! খুব ভাল হল। ম্যাডামকে কলকাতায় রিমুভ করতে হতে পারে।'

'কি হয়েছে ওর ?'

সুহাস সংক্ষেপে সব কিছু বললেন। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর এমার্জেন্সির দরজা ফাঁক করে ঢুকে পড়ল। একজন বয়স্ক ডাক্তার। চোখে চশমা, একমনে কি লিখছেন।

সুব্রত বলল, 'ডাক্তারবাবু, পেসেণ্টের একটু খবর পাওয়া যাবে ?'

ডাক্তার মুখ তুললেন, কি যেন ভাবলেন। 'কত নম্বর ?'

'তিন।'

'লীনা চৌধুরী।'

'হ্যাঁ।'

'কি খবর ?'

'এই, কেমন আছে এখন……।

আপনি বাইরে থাকুন, প্রয়োজন হলে ডাকা হবে। চিন্তার কোন কারণ নেই।' তিনি আবার লিখতে শুরু করলেন।

ঘরের বাইরে নোংরা করিডোরে বেশিক্ষণ থাকতে হল না সুব্রতদের। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেই ডাক্তারই বেরিয়ে এসে সুব্রতকে বললেন, 'পেসেণ্টকে আপনি কলকাতায় নিয়ে যান।'

সুব্রত বলল, অবস্থা কি খারাপ ?'

'না, তা ঠিক নয়। আসলে মেজর অপারেশনের কেস। এখানে না করাই ভাল।'

'ঠিক আছে, নিয়ে যাচ্ছি। আপনাদের একটা অ্যাম্বুলেন্স পেতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই। আমি বলে দিচ্ছি।' তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

এই মুহূর্তে, প্রথমেই পি জি হাসপাতালের কথা মনে হল সুব্রতের। কেন না ওই হাসপাতালেরই অর্থপোডিক সার্জন তার মামা। শুধু লীনা নয়, কি ভেবে সুহাসকেও তুলে নিল অ্যাম্বুলেন্সে। তারপর পি জি-তে চলে এল।

সুহাসকে নিয়ে সে যখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল তখন রাত প্রায় দশটা। ইতিমধ্যে সে ফোনে মায়ের কাছে লীনার দুর্ঘটনার খবর দিয়েছিল। বলা বাহুল্য সুহাসকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে রাতে এই কথাটাও তাঁকে প্রথমে জানিয়ে দিয়েছিল।

সুব্রতর কথামত পরদিন সকালে সুহাস চলে গেলেন। বিকালে হাসপাতালে যাবার জন্যে বেরুচ্ছিল সুব্রত, মায়ের ডাকে থামতে হল।

'ক'দিন আছিস বাড়ি ? লীনাকে রিলিজ করা পর্যন্ত, না আগেই চলে যাবি ?'

'আগে চলে যাওয়া যায় ? রিলিজ করা পর্যন্ত।'

মিসেস চ্যাটার্জী একটুও খুশি হলেন না। সুব্রত এভাবে বাড়াবাড়ি করবে তিনি আশা করেননি। তবু তিনি আর কিছুই বললেন না।

ভিজিটিং আওয়ার এখনও শুরু হয়নি। গাড়ি থেকে নেমে সুব্রত চলে এল হাসপাতালের সামনে। হাসপাতালের এলাকা বেশ বড়। পুকুর আছে, খেলাধুলো করার মাঠ আছে। আছে বেশ কিছু গাছপালা। রাস্তায় অ্যাশফেল্টের ভিতরে ভিতরে বালি ঢুকে আছে। বোধহয় কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। সেই বালি কিছুটা অন্যমনস্ক উদাসীনতায় জুতোর আগা দিয়ে নাড়াচাড়া করছিল সুব্রত, মেয়েলি কণ্ঠস্বরে চমকে মুখ তুলল।

—'সুব্রতবাবু, দিদি কেমন আছেন এখন ?'

জবা তার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখ তার চোখে। সে একটু হাসল, কেমন বিষণ্ণ। 'এর উত্তর ডাক্তারই দিতে পারেন। আপনি কি এই এলেন ?'

'হ্যাঁ। ভেবেছিলাম, আগে পারমিতাদির কাছে যাব। বোধহয় ওঁরা এখনও এই দুঃসংবাদ পাননি। কিন্তু ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেলে তো দিদির সঙ্গে দেখা করা যাবে না। অগত্যা চলে এলাম এখানে।'

'আমারও খবরটা এখনও দেওয়া হয়ে ওঠেনি। দিতে হবে। হাজার হোক, ওঁরাই তো লীনার আপনজন। আচ্ছা, এই হাসপাতালে এসেছি আমরা, এ কথা কে বলল ?'

'সুহাসবাবু। আসার পথে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

কাল ব্যস্ততার মধ্যে মনে না হলেও রাতে যে কথা কুয়াশার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল সুব্রতকে—যা সুহাসকে বলেনি কিংবা তাঁর কাছে জানতে চায়নি সে সম্পর্কে, তা-ই এখন জবার কাছে জানতে চাইল।

'এই এত বড় একটা দুর্ঘটনা, অথচ অলকেন্দুবাবুকে কাল হাসপাতালে দেখতে পাইনি। কি ব্যাপার বলুন তো ? উনি কি খবর পাননি ?'

'না। উনি তো এখানে, এই কলকাতার বাড়িতে। দুর্ঘটনার খবর শুনেই আমি ওঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম। মানদাই বলেছিল একথা।'

ইতিমধ্যে ভিজিটিং আওয়ার শুরু হয়েছে। এত বড় হাসপাতাল, কত ধরনের পেসেন্ট—তাঁদের কিছু আত্মীয়স্বজন, কিছু পরিচিত বন্ধুবান্ধব যাচ্ছেন আসছেন। সর্বত্র একটা চাঞ্চল্য। এরই মাঝে মৃত্যুর চেনা গন্ধ। এই প্রথম সুব্রতের মনে হল, এই গন্ধের মধ্যেই মানুষ আসে, থাকে এবং চলে যায়। মৃত্যুর সত্য বিজ্ঞান বা অঙ্কের সত্য নয়, মানুষের জীবনের সত্য। ওটা উপলব্ধি করতে পারলে জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে।

কেবিনের পর্দা সরিয়ে সুব্রত আর জবা ঢুকতেই নার্স সুব্রতকে বলল, 'আপনি কি সুব্রত চ্যাটার্জী ?'

সুব্রত নার্সের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

'আপনাকে ডক্টর ব্যানার্জী ডেকেছেন।'

ডক্টর ব্যানার্জী সুব্রতের মামা। সে চলে গেল।

লীনা ঘুমোচ্ছে। সাদা চাদরে পা থেকে বুক পর্যন্ত ঢাকা। এক নাকে সরু নল। আরও কটা নল চাদরের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। স্যালাইন এবং রক্তের বোতল ঝোলান।

এই অবস্থায় লীনাকে ডাকবে কি ডাকবে না ভাবতে ভাবতেই নার্সকে জিজ্ঞাসা করল জবা।

'পেসেণ্টের সঙ্গে কথা বলা যাবে?'

নার্স অদূরে চেয়ারে বসে টেমপারেচার চার্ট-এ চোখ রেখে কি ভাবছিল। সে জবার দিকে তাকাল। একটুক্ষণ পরে বলল, বলুন। 'দু-একটা কথার বেশি নয় কিন্তু।'

জবা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। একটু মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকল, 'দিদি! দিদি!'

লীনা চোখ মেলল। পাতাগুলো যেন ভারী পাথর, কেমন কষ্ট হল।

'দিদি, আমি পারমিতাদিদের বাড়ি যাচ্ছি। কিছু বলতে হবে?'

'না, কিছুই বল না। এই যে আমি হাসপাতালে তা-ও না।' খুব আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল লীনা। তারপর পুনরায় চোখ বুজল।

এই কথা শুনে জবা থিতিয়ে গেল, অবাক হল। কি হয়েছে সে জানে না। যাই হোক না কেন, খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মতান্তর ছাড়া তো অন্য কিছু নয়। সব বাড়িতে এ তো হয়েই থাকে। এ রকম অভিমানের কোন মানে হয়!

তবু এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করল না জবা। করল না এই জন্যেই যে লীনা সম্পর্কে সমীহ, শ্রদ্ধা এবং প্রচ্ছন্ন গর্বের এক ভাবাবেগে সে আচ্ছন্ন।

সুব্রত ঢুকেই বলল, 'জবা, আসুন।'

সুব্রতের দিকে তাকিয়ে জবা চমকে উঠল। স্বাভাবিক আলো মুখে সুব্রত বেরিয়ে গিয়েছিল, এখন চোখেমুখে বিবর্ণ ধূসরতা। তার হঠাৎ কি হল! বাইরে যেতে না যেতেই যেন একরাশ উৎকণ্ঠা আছড়ে পড়ল। 'ডাক্তার কি বললেন?'

সুব্রত হেঁটে চলেছে করিডোর দিয়ে। পাশে পাশে জবা। কিছুক্ষণ পরে রাস্তায় পা দিয়ে, এক পলক জবার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'লীনার ডান হাতখানা কেটে বাদ দিতে হবে।'

সুব্রতের এই বার্তা ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে মেঘ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা বাজের মত যেন আছড়ে পড়ল জবার কানের পাশে। বুকের মধ্যে কাঁপুনি থিরথির করে উঠল। হঠাৎ পা দু'খানা আটকে গেল ব্যথাতুর অনুভূতির বিবশতায়।

'কি হল? আসুন—'

সুব্রতের ডাকে আবার সচল হল জবা। তাকে অনুসরণ করল।

গাড়িতে উঠে বসে সুব্রত বলল, 'আসুন, উঠে আসুন।'

'এখন আমি হোস্টেলে যাব। এক পায়ের পথ। হেঁটেই যাব।'

'পারমিতার ওখানে যাবেন না ?'

'না।' জবা মাথা নাড়ল।'

'এই যে বললেন, যাবেন ! হঠাৎ মত পরিবর্তন ?'

'না, এমনি।' বলতে গিয়েও বলল না। চুপ করে থাকল।

'আপনি না গেলে তো আমাকেই যেতে হয়। এত বড় একটা অপারেশন। ওঁদের তো জানাতেই হবে।' জবার নীরবতায় অবাক হয়ে সে ফের বলল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার জবাকে মুখ খুলতে হল।

'না, আপনিও যাবেন না। ওঁদের কিছু জানানোর দরকার নেই।'

'সেকি ! কেন ? লীনা বলেছে নাকি একথা ?'

জবা মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

সুব্রতের মুখে বিস্ময়ের বাড়তি আলো আর মনের মধ্যে লীনা সম্পর্কে মায়ের কথাগুলো এসে ভিড় করল। আপাতত সেগুলোকে পাশে সরিয়ে রেখে সে বলল, 'তাহলে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে।'

'কষ্ট। মানে ?'

'ভিজিটিং আওয়ার্সে একবার করে আসতে হবে রোজ।'

'এটা এমন কিছু নয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি ? আপনি কি হাসনাবাদ চলে যাচ্ছেন ?'

'না, এখুনি যাচ্ছি না। আসলে সেবাটেবা আমার ঠিক আসে না।'

'ঠিক আছে, চলি।'

জবা চলে যাওয়া সত্ত্বেও সুব্রত লক্ষ্মণ সিংকে গাড়ি স্টার্ট দিতে নির্দেশ দিল না। চুপচাপ বিশ্রামরত বৃষের মত রোমন্থনে ব্যাপৃত হল। মায়ের কথাগুলো মনের মধ্যে নিয়ে এসে নাড়াচাড়া করল। মিনিট দুয়েক। তারপর প্রতিবন্ধী লীনার চেহারা কল্পনা করল। কিন্তু কেউ তার ভালবাসার রঙ ফিকে করতে পারল না, না—মা না—প্রতিবন্ধী লীনা।

॥ আঠার ॥

ইতিমধ্যেই হাসপাতাল থেকে কল্পনার মৃতদেহ তার আত্মীয়স্বজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রামসুন্দরের মৃতদেহ নিতে কেউ না আসায় তা বেওয়ারিস লাস হিসেবে মর্গে পড়ে রয়েছে। পুলিশ কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে অনেককে গ্রেপ্তার করেছে। হাসপাতালে গিয়ে লীনাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

কাগজে এই প্রথম ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে ছাপা হয়েছে। সত্যি বলতে কি, একটু দেরীতে। পৃথিবীটা যখন এত ছোট হয়ে এসেছে এই সংবাদটা পেতে এত দেরী হবার কারণটা সত্যিই বোঝা শক্ত।

খবরটা পড়ে অলকেন্দু কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন। মনে পড়ল এক সঙ্গে অনেক কথা। এক বুক অবিশ্বাস আর সন্দেহ নিয়ে এখানে—এই কলকাতার বাড়িতে এসেছিলেন। পারমিতা আর অর্ককে একই ছাদের তলায় দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল তিনি রামসুন্দরের চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। কেন এই চক্রান্ত? প্রতিহিংসা না অন্য কিছু? তখনই মনের ভিতর উঁকি দিয়েছিল লীনার করুণ মুখটা। অকারণ কটুবাক্য করেছেন তিনি। ব্যস্ত হয়ে পারমিতাকে বলেছিলেন, 'বৌমা, আমি চলে যাচ্ছি।'

'ওমা! কেন? এই তো এলেন!' পারমিতা যৎপরোনাস্তি বিস্মিত।

'না, মানে তোমাদের কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়েছিল। হঠাৎ চলে এসেছিলাম। তোমরা তো ভালোই আছ দেখছি।'

পারমিতার গলায় এক ধরনের উষ্ণ আন্তরিকতা। 'আমাদের বিয়ের পরে এই প্রথম এলেন। জানেন আপনাকে দেখে না কি যে ভাল লাগছে! কটা দিন থেকে যান না—'

অগত্যা নিজেকে সামলাতে হয়েছিল। ক' দিনই বা হয়েছে। এই তো মাত্র সাত দিন। এরই মধ্যে একি দুর্বিপাক!

এখন অলকেন্দু যে রকম চুপসে গেছেন, তাতে মনে হচ্ছে, রামসুন্দর তাঁকে মেরে রেখেই মরেছে। তাঁর গলায় অধীর ডাক, 'বৌমা, বৌমা—'

একটু পরে পারমিতা এসে দাঁড়াতেই কাগজটা তার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'পড়ো।'

সে গ্যাসচুল্লিতে দুধের প্যান চাপিয়ে রেখে এসেছে। এখন কি কাগজ পড়ার সময়। তবু কাগজটা নিল। কেননা, অলকেন্দুর পাথুরে মুখ দেখে তার কেমন সন্দেহ হল। তার সম্পর্কে কি কোন অশোভন কথা লিখেছে! না কি নারী-আন্দোলন নিয়ে কটাক্ষ করেছে! যেমন করছে চারপাশের লোকজন!

প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে নীচে বড় বড় হরফে হেডলাইন। একরকম খুঁজতেই হল না পারমিতাকে। সে খবরটা পড়ল। তার দৃষ্টি পড়ল সেই জায়গাটুকু, যেখানে লেখা রয়েছে, লীনা চৌধুরী, আমলানী পঞ্চায়েত-প্রধান, এক উন্মত্ত জনতার নিক্ষিপ্ত ইটের ঘায়ে আহত। আঘাত গুরুতর। তাকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সে কি বলবে বুঝতে পারছিল না। এর মধ্যে অলকেন্দু জামাকাপড় পরে রেডি। বললেন, 'যাও, কাপড়টা বদলে এসো। আমরা হাসপাতালে যাব এখন।'

পারমিতা দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। সাতটা বাজতে পাঁচ। সে ঠাহর করতে পারল অলকেন্দুর মনে উদ্বেগের জট কত নিবিড়। নইলে এই অসময়ে হাসপাতালে যেতে চান! সে বলল, 'আপনি শান্ত হয়ে একটু বসুন। অত বড় হাসপাতাল। একে বেড নম্বর জানি না, তায় ভিজিটিং আওয়ার্স নয়। এখন গিয়ে ফিরে আসতে হবে। জবার হোস্টেলে ফোন করে দেখি। যদি ও কোন হদিস দিতে পারে। তা না হলে বিকেলে অন্য চেষ্টা করব।'

'সত্যি তো, অনর্থক এখন গিয়ে লাভ কি! মনে মনে লজ্জিত হলেন অলকেন্দু।

কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না। এখন কাগজ পড়ার মনটাও নেই। কেবলই লীনার মুখ মনে পড়ছে। সামাজিক অনুশাসনের বহু প্রচারিত প্রাচীরের ওপারে গিয়ে তাঁর মা আর সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেননি। সেই প্রাচীর ভাঙার যে আয়োজন শুরু হয়েছিল চারদিকে তাতে উৎসাহিত হয়ে, এই অঞ্চলে কি ধরনের আন্দোলন করা যায়, এমন যখন ভাবছিলেন তখন সুরমার কণ্ঠস্বর সুদূর অতীত থেকে এসে ধাক্কা দিয়েছিল তার চেতনায়, লীনা কিন্তু নারীর বর্তমান ভূমিকায় সন্তুষ্ট নয়। ও অন্য-রকম দেখতে চায় নারীকে। আর তখনই মনে হয়েছিল, লীনাই পারবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ; সব দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সেই লীনা এখন হাসপাতালে। হয়ত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। উঃ। ভাবা যায় না ! ভারাক্রান্ত মাথায় তিনি বসে পড়লেন সোফায়।

আজ ক' দিন হল জবা রোজ হাসপাতালে যাচ্ছে, সুব্রতও। পরিচর্যা করছে লীনাকে। লীনা নিষেধ করার পর পুরো একটা হপ্তা, তার মধ্যে সে পারমিতাদের বাড়ি আর যায়নি।

আজ কাগজটা পড়ে হঠাৎ তার মনে হল পারমিতাদের কাছে লীনার খবরটা পেঁাছে না দিয়ে সে ভুল করেছে। পাগলের মত রুগীও প্রলাপ বকে। সে কথা শুনলে হয়। হন্তদন্ত হয়ে চলে এল পারমিতার বাড়ি। বলল, 'দিদি, কাগজের খবরটা পড়েছ ?'

দমকা হাওয়ার মত হঠাৎ এসে এই প্রশ্ন, প্রসঙ্গটা ধরতে একটু সময় লাগল পারমিতার। তারপর বলল, 'হ্যাঁ।'

একটু থেমে বলল, 'এক্ষুনি ভাবছিলাম, রান্নাঘরের কাজ মিটলে তোমাকে ফোন করব। তুমি লীনাকে দেখতে গিয়েছিলে হাসপাতালে ?'

মাথা হেলিয়ে জবা বলল, 'হ্যাঁ।'

এবার রান্নাঘর থেকে অলকেন্দুর ঘরে এল পারমিতা। পিছনে জবা। বলল, 'বসো জবা।'

অলকেন্দুর চোখ কাগজে হলেও মনে অস্থিরতা। স্মৃতির পৃষ্ঠায় ঘুমন্ত অতীত জেগে উঠেছে। একটু চমকে যেন তিনি তাকালেন আগে পারমিতার দিকে, তারপর জবার।

'জবা, তুমি। এখানে ?'

'আমি তো দিদির কাছে প্রায়ই আসি। আপনি আসেন না, তাই জানেন না।

'জানেন জবা না লীনাকে দেখতে গিয়েছিল।' শুনে কাগজটা পাশে রেখে অলকেন্দু বললেন, 'তুমি বিকেলে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে ?'

জবা হেঁট মুখে মাথা হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'ও কেমন আছে এখন ?'

'অপারেশন সাকসেসফুল। এখনও অবস্থা একটু খারাপ। শিগ্‌গির ভাল হয়ে উঠবেন।'

'অপারেশন ! কিসের অপারেশন ?'

চট করে জবার মুখে কোন কথাই এল না। বুকের ভিতর দামামার বাজনা! কেউ শুনতে না পেলেও, সে শুনতে পাচ্ছে। ক' পলক তাকিয়ে থাকল ফ্যালফ্যাল করে। তারপর খেয়াল হতেই দৃষ্টি নামিয়ে নিল। আর তাই সে দেখতে পেল না দুই জোড়া উদ্বিগ্ন চোখ তার দিকে অপলকে চেয়ে আছে।

ক' মুহূর্ত বাদে পারমিতা বলল, 'কি হল, একেবারে চুপ?'

জবা এতক্ষণে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে অকম্পিত গলায় বলল, 'দিদির ডানহাতখানা কেটে বাদ দিতে হয়েছে।'

কথাটা শোনামাত্র পারমিতা আর অলকেন্দুর বুকের ভিতরটা দুমড়ে-মুচড়ে বেদনায় ভারি হয়ে উঠল। অলকেন্দু মুখ ঘুরিয়ে কান্না চাপার নিষ্ফল চেষ্টা করলেও পারমিতা এই আচমকা ধাক্কা পাশের চেয়ারটা ধরে সামলাল। কিন্তু কান্না সামলাতে পারল না, দু' চোখ দিয়ে জল গড়াল। আঁচলের খুঁট দিয়ে জল মুছে সে চেয়ারটায় বসল।

জবা বসে অলকেন্দুর পাশে—একটু তফাত করে। পারমিতা তার বিপরীতে।

তাদের মুখে কোন কথা বেই। এভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। শেষপর্যন্ত পারমিতাই বলল, 'জবা, এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, আমাদের কিছুই জানান হল না। কেন বলতে পার?'

'আমি জানতে চেয়েছিলাম। দিদি নিষেধ করেছিলেন।'

'সে কি? কেন?'

'জানি না।'

হঠাৎ পারমিতার সেই মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়ল। ব্যস্ততাটা যেন কেমন! এসেই চলে যেতে চাওয়া। কেমন এক কৌতূহল বশে পারমিতা অলকেন্দুর দিকে তাকাল।

'বাবা, আপনার সঙ্গে লীনার কি কোন খটাখটি হয়েছিল?'

অলকেন্দু তার দিকে তাকালেন। চোখ দুটো লাল। বুক উথালপাতাল কষ্ট-ঘূর্ণির সঙ্গে সঙ্গে জল নেমেছিল চোখ দিয়ে। সে জন্যেই তাঁর চোখ লাল। কথা বলতে প্রথমেই মুখে বাধল। তার গলা কাঁপল। তবুও তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। তা এমন কিছু নয়। ও কেবল আমাকে বুঝাতে চেয়েছিল যে আমি ভুল করেছি। আমি ওর কথা বিশ্বাস করিনি। আসলে আমি লোকের কথায় বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।'

'লোকের কথা? কি সে কথা?'

'ও তোমার না শোনাই ভাল।'

এই সময় পাশের ঘরে শুভ্র কেঁদে উঠল। পারমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ছেলে উঠেছে। আমি যাচ্ছি। নইলে এখুনি অসভ্যতা করবে।

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'ব্রেকফাস্টের সময় হয়েছে। আপনি জবাকে নিয়ে আসুন।

এরপর রোজ অলকেন্দু গিয়েছেন পারমিতাকে নিয়ে, কখনওবা অর্ককে। কথা হয়েছে সুব্রতের সঙ্গে কত কি। পরিচয় হয়েছে সুব্রতের মামার সঙ্গে। নার্স অভ্যস্ত

কান্নদায় হেসেছে। কথা বলেছে। কিন্তু লীনার সঙ্গে কোন কথা হয়নি। ডাক্তারের নিষেধের বেড়াজালে আটকে পড়ে অসহায় দর্শকের মত কেবল তার নিশ্চল দেহটার দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। এমন সময় একদিন—

সেদিন ডাক্তার বললেন, আজ পেসেণ্টের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তবে একটু সমঝে ; এখনও বিপদ পুরোপুরি কাটেনি। উত্তেজিত হলে ক্ষতি হতে পারে।

জবা আসেনি। সুব্রত এসে বাইরে গেছে। অলকেন্দু লীনার বেডে গেলেন। পিছনে পারমিতা।

লীনা একটু হাসল। উঠে বসল। বলল, 'কাকু বসো।'

পারমিতার দিকে তাকিয়ে আর এক প্রস্থ হাসল। 'বসো বৌদি।'

লীনার পাশে বসে হঠাৎ অলকেন্দু বললেন, 'তুই আমার উপর খুব রাগ করেছিস, তাই না?'

'রাগ করেছিই তো? কেন করব না? আমাকে না বলে চলে এলে! কখনও এমন করেছ?'

কথাটা সহজ শোনালেও কেমন যেন অভিমানে ভরা। অনেক কষ্টে দীর্ঘশ্বাস চেপেও হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তাই বলে কি এই এত বড় বিপদেও একটা খবর পর্যন্ত দিবি না?'

এরপরেও লীনা অকপট। 'না, দেব না। কেনই বা দেব?'

লীনাকে যত দেখছে পারমিতা বিস্ময় ততই বাড়ছে। কোন ফুলের একটা পাপড়ি খসে পড়লে যেমন সৌরভের খুব বেশী হেরফের হয় না, তেমনি একটা হাত হারিয়েও লীনার জীবন-সুরের হেরফের হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। কি অসাধারণ মানসিক বল। এরাই বুঝি বলতে পারে, আই অ্যাম নট হ্যাণ্ডিক্যাপড্। আয়াম হ্যাণ্ডিক্যাপেবল।

'এই দেখ, এখনও দাঁড়িয়ে আছ বৌদি! বসো না ওই চেয়ারটায়!' পারমিতার পাশে একটা চেয়ার। সেটা দেখিয়ে লীনা বলল।

'ঠিক আছে ভাই, ব্যস্ত হয়ো না তো। শোনো, এখান থেকে বাড়ি যেতে পারবে না। আমার কাছে কিছুদিন থাকবে, কেমন?'

ইতিমধ্যে রূঢ় বাস্তব লীনার দেহে প্রতিবন্ধীর তকমা এঁটে দিয়েছে বটে, কিন্তু তার অন্তরের সুরটা জীবনের নতুন প্রকাশের হীনমন্যতায় হারিয়ে যায়নি। সে বলল, 'তোমার কাছে থাকতে খুব ইচ্ছে করে আমার। কিন্তু ওদিকে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম, নারী-আন্দোলন সে সব কে দেখবে?'

অলকেন্দু বললেন, 'সে তোকে ভাবতে হবে না। আমি অরিতকে বলে দেব। তাছাড়া সুব্রত আছে। জবা তো আছেই।'

'শুধু আছে না, ভীষণভাবে আছে। জবা যে লীনাকে এত ভালবাসে তা আগে জানতাম না।' বলতে বলতে ভিতরে ঢুকল সুব্রত, বাইরে থেকে অলকেন্দুর কথাগুলো শুনে থাকবে।

ফলভর্তি ছোট পলিথিনের প্যাকেটটা টুলের উপর রেখে সুব্রত লীনাকে বলল,

'আমার ছুটি তো শেষ হয়ে এল। এঁরা যখন আছেন আর কি থাকার দরকার আছে আমার ?'

কিছু বলল না লীনা। বলার নেইও। সে যা করেছে তাতে সে বিস্মিত, বিমুগ্ধ। কি করে এখন, সবাইকে কাছে পেয়ে, সে বলে, ঠিক আছে। তুমি যাও।'

পারমিতা বলল, 'সুব্রতবাবু, আপনি চলে যান। এদিকে আমরা তো আছি। ওদিকটা দেখুন।'

সুব্রত হেসে বলল, 'লীনার সংসারের কথা বলছেন ?'

পারমিতা হেসে ফেলল, 'তা যা বলেছেন। সংসারই বটে।'

অলকেন্দু আপাতত অন্যমনস্কতার মধ্যে গম্ভীর হয়ে থাকলেও লীনা পারমিতার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল।

হঠাৎ সুব্রত বলল, 'ঠিক আছে, ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। লীনার দিকে একটু বেশী লক্ষ্য রাখবেন। ও বাইরে শক্ত, ভিতরে খুব নরম। অহরহ কাঁদছে।'

অলকেন্দুর উপস্থিতি ভুলেটুলে লীনা হাল্কা সুরে বলল, 'হ্যাঁ কাঁদছি, তুমি দেখেছ—'

এই সুযোগে পারমিতাও একটু রসিকতা করল, 'দেখতে হয় না ভাই। তেমন মন থাকলেই বোঝা যায়।'

লীনার যা হয়নি কখনও তাই হল। কথাটা বুকের কোমল স্পর্শকাতর জায়গায় এসে লাগল। 'যাঃ।' অস্ফুটে বলেই মুখ নিচু করল।

অলকেন্দুর মনে হল, অর্ককে নিয়ে যে কেচ্ছা তা ঠিক নয়। ঠিক সুব্রতকে নিয়ে যেটা, সেটাই। সুব্রত লীনাকে ভালবাসে। এতদিন তার ভালবাসার বীণা কি সুরে বেজেছিল কে জানে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, যে সুরে বাজল তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। যেখানে লীনা ফিজিক্যালি হ্যাণ্ডিক্যাপড সেখানে এই সুর……এও কি সম্ভব !

তিনি দ্বিধা সংকোচহীন গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুব্রত, তুমি কি লীনাকে বিয়ে করতে চাও ?'

'এক মুহূর্ত লীনার দিকে তাকিয়ে নিয়ে সুব্রত হাসল। বলল, 'ওকে জিজ্ঞাসা করুন না! বলেই সে বেরিয়ে গেল, আচমকা।

অলকেন্দু একটু ভেবেই মনে মনে হাসলেন। তারপর লীনাকে বললেন, 'কিরে সুব্রতকে বুঝি পছন্দ নয় তোর ?'

লীনা মুখ তুলল। সেই মুখে নেই লজ্জা কিংবা চলকানো হাসি। আছে অদ্ভুত এক উদাসীনতা যা এই প্রশ্নের কোন উত্তর রাখে না।

আশ্চর্য হলেন না অলকেন্দু। আশ্চর্য হল পারমিতা।

॥ উনিশ ॥

পরদিন সুব্রত গেল না। ছুটি সম্পর্কিত কি একটা কাজে থেকে যেতে হল। অপরাহ্নের নরম রোদ বাইরে। ঘরে ছায়া-ছায়া ভাব। একটু ব্যস্ততার মধ্যে আটপৌরে পোশাকে ফিটবাবু হয়ে বাইরে আসতেই রাঘবের মুখোমুখি।

'এই, মা কোথায় ?'

'রান্নাঘরে।'

সুব্রত রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াল। তারপর একটু গলা তুলে বলল, 'মা, লীনাকে দেখতে যাবে ?'

মিসেস চ্যাটার্জী নীরব থেকে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এই দেখতে যাওয়া নিছক সৌজন্যে নয়, অন্য কিছু। সেটা সম্ভব নয়। কোনমতেই একটা একহাতওয়ালা মেয়েকে ঘরের বউ করতে পারেন না। সুব্রত যখন আবার করল প্রায় একই প্রশ্ন মিসেস চ্যাটার্জী একটু বিরক্তবোধ করে বললেন, 'না।'

'একদিনও গেলে না। কিন্তু তুমিই তো ওকে দেখতে চেয়েছিলে।'

'তুই কি এখন হাসপাতালে যাচ্ছিস ?' একটু ক্ষুণ্ণ মনে কথা ঘুরালেন।

'হ্যাঁ।'

এখন সবকিছুই এমনি যান্ত্রিক। আন্তরিকতা নেই। কটা দিনই বা হয়েছে সুব্রত এবার বাড়ি এসেছে। এর মধ্যে দুজনের সম্পর্কের ভীষণ অবনতি হয়েছে। সব কিছু যেন প্রয়োজনমাফিক।

সুব্রত সবই বোঝে। কষ্ট পায়। কিবা করার আছে তার। ভালবাসাটাই যে এই! নিজে কাঁদে, অপরকে কাঁদায়।

রাতে খাবার টেবিলে সুব্রত বলল, 'মা, আমি কাল চলে যাচ্ছি।'

মিসেস চ্যাটার্জী বিপরীতে বসে খাচ্ছেন। মুখ তুলে এক পলক তাকালেন তার দিকে। একটু হাসার চেষ্টা করলেন।

ব্রেকফাস্টের পর প্রস্তুত হতে খানিকক্ষণ কেটে গেল। তারপর মাকে বলে ঢাউস অ্যাটাচিটা নিয়ে বেরিয়ে এসে ড্রাইভারের ঘরের সামনে দাঁড়াল।

'লক্ষ্মণ সিং—'

লক্ষ্মণ সিং চারপাইয়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়েছিল। সে তড়াক করে উঠে পড়ল। বাইরে এল।

'হাসপাতালে যাবার পথে একদিন অর্কবাবুর বাড়ি দেখিয়েছিলাম, মনে আছে ?'

'জি হাঁ।' লক্ষ্মণ কোন চিন্তা না করেই বলল।

'আসছে সোমবার দিদিমণি ছাড়া পাবে। হাসপাতাল থেকে ওকে নিয়ে অর্কবাবুর বাড়ি পৌঁছে দেবে, মনে থাকবে তো ?'

'জরুর, জরুর মনে থাকবে।'

'আর একটা কাজ করতে হবে যে লক্ষ্মণ—'

'জি বলুন।'

'দিদিমণির একটু ফাইফরমাশ খাটতে হবে। যখন কোথাও যাবে গাড়িতে নিয়ে যাবে এই আর কি!'

'এ আর এমন কি কাম। লেকিন মা—'

'মা কিছু বলবে না। রোজ তো যেতে হচ্ছে না। দিদিমণি যে সময় বলবে শুধু সেই সময়ই যাবে।'

সোমবার বাগবাজারের বাড়িতেই এল লীনা। লক্ষ্মণের মারুতির সওয়ার হয়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

ইতিমধ্যে সুব্রত অলকেন্দুকে ফোনে জানিয়েছিল দলের মধ্যেই একটা দুষ্ট চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা লীনাকে সরিয়ে দিতে চায়।

কালবিলম্ব না করে পরদিন লীনাকে নিয়ে অলকেন্দু উপর নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে এলেন।

লীনার সব কথা শুনে পঞ্চায়েত-মন্ত্রী খুব উৎসাহিত হয়েছেন বলে মনে হল। তিনি তো বলেই ফেললেন, 'আপনি আন্দোলন চালিয়ে যান। মেয়েরা জাগলেই গ্রামের উন্নতি সম্ভব। কেননা গ্রামীণ অর্থনীতির অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে মেয়েরা।'

যাই হোক, লীনা কিন্তু এতেও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। সে অলকেন্দুকে বলল, 'আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

'বল।'

'স্বেচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় হোক মানদা কোন চক্রান্তের শিকার হয়েছিল। পুলিশকে কেন যেন ওর নামটা বলতে গিয়েও বলতে পারিনি।' অরিত আমার সন্দেহের মধ্যে অথচ মিছিলে ছিল না। কি করে করি ওর নাম। কিন্তু এখনও ওদের ঘিরে থমকে আছে আমার সন্দেহ। তুমি চলে যাও। ওদের প্রতি একটু বেশি লক্ষ্য রেখ। তাছাড়া মানদা একা। কি করছে কে জানে। এখুনি তোমার যাওয়া দরকার।'

অলকেন্দু চলে গেলেন। এর কিছুদিন পরে এক বিকেলে—

গাড়িবারান্দায় লক্ষ্মণের মারুতি। তার মধ্যে বসে সে খৈনি বানাচ্ছিল, এক ভদ্রলোককে ইতিউতি তাকাতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খুঁজছেন?'

'এটা কি অর্ক চৌধুরীর বাড়ি?'

'হ্যাঁ', ভদ্রলোকটার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সে বলল, 'আপনি কে সাব, রিপোর্টার? কিছু কভার করবেন?'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। 'হ্যাঁ।'

তর্জনী দিয়ে ইঙ্গিত করেই লক্ষ্মণ বলল, 'ওদিকে গেট আছে। ঢুকেই সদর।'

ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে ডানদিকে তাকাতেই দেখলেন সদর। বনেদী জমানার দু-

মহলা বাড়ি বলে মনে হল। সারা গায়ে সাবেকী মেজাজ। যেখানে দুপাশে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর অবদান স্কাইস্ক্রেপার সেখানে একটুকরো প্রাচীন কলকাতা হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। ভদ্রলোককে একটু বেগ পেতে হল। আজকালের চোখে অচল হয়ে যাওয়া মডেলের কোন ঘরটায় ডোরবেল টিপবেন বুঝতে। কেননা সব ঘরের দরজাতেই বেল, তারপরই বেল টিপলেন। একেবারে বসার ঘরের।

লীনা সোফায় বসে টিভি দেখছিল। পাশে শুভ্র। তার চোখও টিভির পর্দায়।

লীনা বন্ধ দরজার দিকে আগে, তারপর শুভ্রের দিকে তাকাল। এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখল একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। পরণে ধোপদুরস্ত জামাপ্যাণ্ট। তাঁর কাঁধে ঝোলা, হাতে ব্যাগ।

লীনা জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চান?'

'লীনা চৌধুরী।'

লীনার মনে হল কাগজের লোকটাকে? তখনই একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন, ভিতরে আসুন।'

সোফার সামনে একটা ছোট রাউণ্ড টি-টেবিল। লীনা চেয়ার টেনে তার পাশে দিয়ে বলল, 'বসুন।' তারপর টিভি বন্ধ করল।

'ও পিসি, টিভি বন্ধ করলে কেন? উসখুস করল শুভ্র। লীনা সেই একই জায়গায় বসে বলল, 'চুপ করে বসো লক্ষ্মীটি। একটু কথা বলি।'

শুভ্র ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে কেমন চুপ মেরে গেল।

ইতিমধ্যে ভদ্রলোক ঝোলা আর ব্যাগ টেবিলের উপর রেখে বসে পড়েছেন। ভদ্রলোক আর লীনা এখন মুখোমুখি—তফাত ওই টেবিলটা।

ভদ্রলোক বললেন, 'ও, আপনিই তাহলে লীনা চৌধুরী।'

লীনা কিছু বলল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল। তিনি চিন্তিত মুখে এক মিনিট মেঝের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে পারমিতা দরজায় এসে দাঁড়াল। ভদ্রলোককে একঝলক দেখে নিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার রিপোর্টার? সাক্ষাৎকার নিতে বুঝি?'

পারমিতার প্রশ্নে চমকে উঠে ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, সাক্ষাৎকার। আপনি কেমন আছেন?'

'ভাল। ভালই তো।' মনের গহনে লুকানো ক্ষোভ আচমকা বেরিয়ে এল পারমিতার, 'আপনারা যাকে ভাল রাখেন সে কি খারাপ থাকতে পারে!'

গাম্ভীর্যের মুখোশ খসিয়ে ফেলে ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। সেই হাসির শব্দে শুভ্র প্রথমে চোখ বড়বড় করে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল, তারপর ভ্যা করে কেঁদে ফেলল। লীনা আর পারমিতা তার দিকে তাকাল, চোখে কৌতুক।

ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হলেন। 'কি হল? কাঁদছ কেন?'

শুভ্র কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি অত জোরে হাসলে কেন?'

'জোরে হাসলে বুঝি কাঁদতে হয়?'

'হয়। হয়ই তো। আমার ভয় করে না—'

'কি নাম তোমার ?'

'শুভ্র চৌধুরী।'

'বাঃ, বেশ নাম তো। যাও, এখন লক্ষ্মীছেলের মত মায়ের কাছে যাও। আমরা একটু কথা বলি !'

এবার পারমিতা গলা তুলল, 'শুভ্র, চলে এসো।'

শুভ্রকে নিয়ে পারমিতা চলে গেলেই ভদ্রলোক ব্যাগ থেকে একটা নোটবুক আর একটা ডটপেন বের করলেন। তারপর বললেন, 'আপনার নারী-আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই। যদি একটু সময় দেন—

'বেশ, বলুন।'

'গ্রাম্য রাজনীতিতে এখন অনেক মেয়ে আসছেন। ক'জনইবা নারীদের কথা ভাবেন ! দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতায় তাদের বর্তমান অবস্থা আর মনোভাব দুয়েরই পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন ! আপনি হঠাৎ এই প্রয়োজন অনুভব করলেন কেন ?'

'হঠাৎ বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। ঘটনা-পরম্পরায় কেউ কেউ যেমন প্রচারের পাদপ্রদীপে চলে আসে তেমনি বোধহয় আমিও। ছিলাম রাজস্থানী, হয়ে গেলাম বাঙালী ঘরের মেয়ে। অলকেন্দু চৌধুরী যিনি আমার আশ্রয়দাতা, আমার এই নতুন জীবনের রূপকারও বটে, তাঁর সঙ্গে ভারতের এখানে-ওখানে ঘুরেছি। কত কত সামাজিক রীতি-নীতি দেখেছি। সবগুলোই কেমন একপেশে। মনে হয়েছে পৃথিবী শুধু পুরুষেরই। সেই পিতৃতন্ত্রের প্রথম ধাপে মেয়েদের অবস্থানের যে ছবি মিশেল ফুকো স্পষ্ট করেছিলেন ডেমোস্থিনিসের মুখে—আমরা বেশ্যাদের রেখেছি আমাদের জন্যে, রক্ষিতারা আছে আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করবার জন্যে, আর স্ত্রীরা রয়েছে আইনানুগ সন্তান বহনের জন্যে ও গৃহের বিশ্বস্ত পরিদর্শিকা হবার জন্যে। বর্তমানে মেয়েদের অবস্থান কোন সমাজে এর থেকে একচুল নড়েনি। অথচ, আমরা দাবী করি আমরা অনেক এগিয়েছি, সভ্য হয়েছি। সত্যি বলতে কি, এই সমাজের বিরুদ্ধে আমার ভিতরে চিরদিনই একটা আপোসহীন বিদ্রোহ ছিল, হয়ত সেটাই এখন প্রত্যক্ষ।'

'এ ব্যাপারে আপনাকে কেউ উৎসাহ দিয়েছেন ?'

হ্যাঁ, অলকেন্দু চৌধুরী। আমার কাকু। এই সমাজে নারীর অসহায় অবস্থা তাঁর মত এত গভীরভাবে উপলব্ধি কেউ করেছেন বলে আমার মনে হয় না।'

'এই সমাজব্যবস্থার প্রহরী একা পুরুষ নয়, নারীও। এ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ?'

নারী অনন্যোপায়। এই পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষদের যে দিকে মনের গতি, মেয়েদের মনের গতি সেই দিকেই হবে। যে যার আশ্রিত, সে তাকে খুশি করতে চাইবেই। তাই এমন ধারণা করলে ভুল হবে যে মেয়েরা মনেপ্রাণে এর প্রহরী। আসলে কোন গত্যন্তর না থাকায় মেনে নিয়েছে।'

'কেউ কেউ বলেন এখন মেয়েরা আইনের দিক থেকে সব বিষয়ে অধিকার পেয়েছে, স্বাধীনতা—সেটাও বাইরের জগতে যা পাবার তা পেয়েছে, আপনি কি বলেন?'

'সব বিষয় মানে? আইন কি নারীকে এই অধিকার দিয়েছে যে বিয়ের পর তার উপর স্বামীর যেমন পূর্ণ অধিকার জন্মায় তেমনি স্বামীর সম্পত্তির উপরও তার পূর্ণ অধিকার জন্মাবে! তাই যদি দিত, তাহলে কি এত বিবাহ-বিচ্ছেদ হত? আসলে আইন প্রণয়ন করেন পুরুষরা। তাঁরা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই আইনে তাঁদেরই স্বার্থ সুরক্ষিত। আর স্বাধীনতা—সেটাও আজকাল মেয়েরা যা পেয়েছে, তা পুরুষের অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে, তারই দেওয়া গণ্ডির মধ্যে, তারই স্বার্থে। এটাকে কোন অর্থেই স্বাধীনতা বলা যায় না।'

'আপনি কি মনে করেন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারীর সমানাধিকার, নারীমুক্তি—এসব ঘটা সম্ভব?'

'ঘরের কাজ যা মেয়েরাই করে আসছে যুগযুগ ধরে তা লেলিনের ভাষায়—শ্বাসরোধক, দমনমূলক, উৎকর্ষহানিকর, বর্বর, স্নায়ুনিষ্পেশক ও বুদ্ধিনাশী। এই কাজ থেকে মেয়েদের সরিয়ে আনতে পারলেই তারা সামাজিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বেশি পরিমাণে শ্রম প্রয়োগ করার সময় ও সুযোগ পাবে। এই সুযোগ যদি নারীকে সদ্ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, তাহলে নারীমুক্তি সম্ভব। এঙ্গেলস খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, '..The emancipation of women and their equality with men are impossible and must remain so as long as women are excluded from socially productive work and restricted to housework, which is private. The emancipation of women becomes possible only when women are enabled to take part in production on large, social scale land domestic duties require, their attention only to a minor degree.' কিন্তু এটা কখনও পুরুষ হতে দেবে না। তাই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে যদি শ্রেণীচেতনা সৃষ্টি করা যায় তাহলে নারীকে ঘরের কাজ থেকে বিযুক্ত করা সম্ভব।'

'শ্রেণীচেতনা সৃষ্টি করতে চাইছেন। আপনি কি মনে করেন স্ত্রী-পুরুষ দুটো শ্রেণী, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী?'

'অবশ্যই। এর প্রমাণ মেলে বিবর্তন ধারায়। যৌন প্রজননে দুটো প্রাণীর মধ্যে একটা 'সৎ'ভাবে বেশি কাঁচামাল ও শক্তি সরবরাহ করে, অন্যটা ফাঁকি দিয়ে যতটা সম্ভব কম শক্তি ও কাঁচামাল সরবরাহ করে। যদি মানুষের কথা ধরি, তাহলে দেখা যায়, সেই 'সৎ' প্রাণীটা স্ত্রী আর 'ফাঁকিবাজ' পুরুষ। একটা মানবশিশু তৈরি হয় শুক্রকীট আর ডিম্বাণুর সংযোগে। এই ডিম্বাণু শুক্রকীটের চেয়ে অনেক বড়, তাতে শক্তির পরিমাণও বেশি। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুরুষের দান কেবল একটা শুক্রকীট যা আসলে চলন্ত ডি. এন. এ. ছাড়া কিছুই নয়। শিশু জন্মের আগে ও পরে মায়ের শরীর থেকে যে শক্তি সংগ্রহ করে তার কিছুই পুরুষ সরবরাহ করে না। আর এই ফাঁকির মধ্য দিয়েই স্ত্রীর উপর পুরুষের শোষণের প্রক্রিয়া শুরু। এ থেকেই বোঝা যায়, স্ত্রী-পুরুষ

পরস্পরের সহযোগী নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী, উভয়েই চায় তার জিনের বংশবৃদ্ধি বেশি হোক।'

'নারীমুক্তির আন্দোলন যদি প্রধানত বিরোধের আন্দোলন হয়ে ওঠে, তবে সেটা কি সমাজ ও সভ্যতার পক্ষে মঙ্গল হবে ?'

'এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিভিন্ন যুগে লিঙ্গ পক্ষপাতদুষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণার সারাৎসার যেখানে নারীর চেয়ে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, যেখানে বর্তমানে এই তত্ত্বে আস্থাশীল মেয়েরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে যদি বলা হয়, সমাজ ও সভ্যতার কল্যাণের নামে কিংবা আর একটু পিছিয়ে গিয়ে নারীপুরুষের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যের নামে, মেয়েদের জন্যে যে সব সামাজিক আর কৃত্রিম গণ্ডি কেটে দেওয়া হয়েছে সেগুলো মুছে দিয়ে তারা কি পারে আর কি না পারে সেটা দেখা হোক, তাহলে কি তা পিতৃতন্ত্র মেনে নেবে ? তাই অনেক চিন্তাভাবনা করে দুটো পথ বের করেছি যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। সেগুলো হল মুক্ত-বিবাহ ব্যবস্থা আর 'এক দম্পতি এক সন্তান' নীতি। অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মতের মিল না হলে কোন ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়েতে রাজি হবে না। স্ত্রী কোনমতেই দ্বিতীয় সন্তান ধারণ করবে না।'

'কিন্তু পশ্চিমী দেশে স্বীকৃত হলেও আমাদের দেশে বৈবাহিক ধর্ষণ স্বীকৃত নয়। স্ত্রী যদি স্বামীর সঙ্গে সহবাসে আপত্তি জানান তাহলে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে দাম্পত্য অধিকার হরণের মামলা আনতে পারেন। মুসলমান হলে শরিয়তের বিধান অনুসারে স্বামী স্ত্রীকে তালাকও দিতে পারেন। এক্ষেত্রে 'এক দম্পতি এক সন্তান' নীতি কি ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব বলে মনে করেন ?'

'এটা বিজ্ঞানের যুগ। কি না সম্ভব। স্ত্রী যদি গোপনে বার্থ-কন্ট্রোল পিলের মত কনট্র্যাসেপ্টিভ ব্যবহার করেন তাহলে হাজার সহবাসেও কিছু হবে না। আসলে মেয়েদের সন্তানের প্রতি এক ধরনের তীব্র আসক্তি আছে। যতদিন না তাঁরা এই আসক্তি ত্যাগ করতে পারবেন ততদিন মুক্তি আসবে না।'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরও দু-একটা প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময় নেই। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।' বলেই নোটবুক আর ডটপেন ঝোলায় পুরে উঠে দাঁড়ালেন।

বিনিময়ে লীনাও তাঁকে ধন্যবাদ দিল।

এই সময়ে পারমিতা চানাচুর-কাজুবাদাম আর চা নিয়ে এল।

'এ কি ! আপনি চলে যাচ্ছেন ?'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'একটু তাড়া আছে।'

'অন্তত চা-টুকু খেয়ে যান।'

'ঠিক আছে, দিন।'

ভদ্রলোক চলে যেতে পারমিতা সেই চেয়ারে বসল।

'শুভ্র কোথায়।' লীনা বলল।

'পাশের ঘরে। খেলা করছে।'

লীনা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু মনে করো না বৌদি, শুভ্র সম্পর্কে লোকে যা বলছে তা কি সত্যি ?'

'লোকে কি বলছে জানি না। তবে এর মধ্য দিয়ে আমি পুরুষকে একটা কথা জানাতে চেয়েছি, পুরুষের বংশরক্ষার চাবিকাঠি নারীর হাতে। অর্থনৈতিক পরাধীনতার সুযোগ নিয়ে তাকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করলেও তার ক্ষমতা অনেক। সে যদি মনে করে তাহলে পুরুষের জাত্যভিমান ধূলিসাৎ করতে এক মুহূর্ত সময় লাগবে না তার।'

স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। নেই জড়তা, নেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব। মনে দুর্বলতা বা পাপবোধ থাকলে এমন কথা বলা যায় না। একমাত্র কোন মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই বলা যায়। লীনা লজ্জিত হল, 'এবার বুঝতে পেরেছি। ইউ আর রিয়েলি আ গ্রেট ফেমিনিস্ট।'

'না লীনা, এর মধ্যে গ্রেটনেস কিছু নেই। একটু সাহসী হয়ে পুরুষকে বুঝিয়ে দিয়েছি, যুগ পাল্টেছে, এখন পুরুষের বিশেষ অধিকার মান্য হতে পারে না। সাম্য চাই, এরপরও পুরুষ যদি সামাজিক অনাচার আর স্বার্থসিদ্ধি টিকিয়ে রাখার জন্যে তত্ত্বকথা শোনায় তাহলে তার পরিণতি হবে আরও ভয়াবহ।'

'তৎক্ষণাৎ শুভ্র প্রায় দৌড়ে এ-ঘরে এসে মায়ের দিকে খেলনা পিস্তল তাক করে গুলি ছুঁড়ল, ঢিস্যুম—ঢিস্যুম—ঢিস্যুম।

হঠাৎ সামান্য কঠিন হয়ে উঠল পারমিতার মুখ। সে তেড়ে উঠে বলল, 'ফেলে দে, ফেলে দে ওটা।'

রোজ এরকম কত কি করে শুভ্র। পারমিতা কিছুই বলে না। আজকের ব্যাপারটা যেন একটু অন্য মেজাজের, অদ্ভুত বলে মনে হল লীনার।

॥ কুড়ি ॥

যেখানে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মেছোঘেরি ছিল, সেখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে সোয়িং-কমপ্লেক্স।

আজ দুদিন হল, যখন তমোনাশকারী সূর্যদেব সাড়ম্বরে বিদায় নিচ্ছে পশ্চিম দিগন্তে, এটা দেখতে আসছেন অলকেন্দু। সুব্রত নিয়ে আসছে। তাঁর যদি কিছু বলার থাকে!

এই কমপ্লেক্সের ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান কলকাতায় থাকতে করিয়ে নিয়েছিলেন অলকেন্দু। ভেবেছিলেন লীনা সুস্থ হয়ে ফিরলে তার সঙ্গে একটু আলোচনা করে এর কাজ শুরু করবেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে যখন দেখলেন, শত্রুরা বেশ সক্রিয়, মেয়েরা বিভ্রান্ত, তখন সকলের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে তাড়াতাড়ি এটা তৈরির স্বপ্নকে রূপ দেবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। আর তখনই মনে হয়েছিল সুব্রতের কথা। সুব্রত সিনসিয়ার, কাজের মানুষ। এর পুরো দায়িত্ব সুব্রতকে দেওয়া যায়।

এই চিন্তাভাবনায় মধ্যেই সুব্রত এল। তখন সবে সন্ধ্যে ঘন হয়েছে। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন অলকেন্দু।

'কি ব্যাপার, এই সন্ধ্যেবেলা শুয়ে আছেন?'

'তোমার কথা ভাবছিলাম। বসো।'

অলকেন্দু সুইচ অন করে বিছানায় এসে বসেছিলেন।

সুব্রত একটা চেয়ার টেনে পাশে বসতে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাকে একটা কাজের দায়িত্ব নিতে হবে সুব্রত।'

'দায়িত্ব?' সুব্রত তার দিকে তাকাল।

অলকেন্দু ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যানের কাগজপত্র সুব্রতের কাছে দিয়ে সেটার রূপ দেবার কথা বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন, এটা লীনারই স্বপ্ন।

ব্যস, সেই শুরু। তারপর দেখে যেন বিশ্বাস করা যায় না, কি করে এটা বাস্তব হয়, চার মাসের মধ্যে একটা কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে গেল।

লীনার স্বপ্নের রূপ সুব্রতের সামনে এখন, অলকেন্দুর সামনেও। অলকেন্দুর অনুভূতি কি রকম সে জানে না। তার মনে অদ্ভুত এক সুখ, আশ্চর্য অনিবর্চনীয় এক আনন্দ।

এই খবরটা ফোনে লীনাকে জানাতে গিয়েও কি ভেবে ফোন নামিয়ে রাখল সুব্রত। তারপর নিজের প্যাডে চিঠি লিখতে বসল।

চিঠিটা কি ডাকে দেবে? কিংবা কারো হাতে? ভাবতে বসল সুব্রত। এ চিঠি একান্তভাবেই তার নিজের। তার সুখ দুঃখ আনন্দ ভাবনা একান্তভাবে তার নিজের। তার ব্যক্তিগত। এ কথা বলা যায় না। গভীর আবেগে হয়ত যায়, সে পারেনি। না ফোনে, না—সরাসরি।

এ ভাবনা নিয়ে অফিসে এল। নিরিবিলিতে একসময় মনে হল ডাকে দেওয়াই নিরাপদ, যদিও একটু দেরী হবে। তা হোক। কি আর করা যাবে। আর তখনই অফিস-খামে পুরে ফেলল চিঠিটা।

ঠিক সেই মুহূর্তে জবা ঢুকল তার ঘরে। পদ শব্দে মুখ তুলল সুব্রত।

আরে, জবা, 'বল, কি উদ্দেশ্যে আগমন?'

কথাগুলো বলামাত্র সুব্রতের খেয়াল হল যখন কলকাতায় তাদের শেষবার দেখা হয়েছে তখন সে জবাকে আপনি বলেছে। মনে মনে তৎক্ষণাৎ কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলল। ততক্ষণে জবা একটা চেয়ারে বসে পড়েছে।

'চা খাবে', সুব্রত বলল।

'না।' একটু থেমে জবা বলল, 'সুব্রতবাবু, খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি তো জানেন আমি মেয়েদের মার্শাল আর্ট শেখাই। গতকাল তিনটে ছেলে আমাকে থ্রেট করে গেছে। মেয়েদের এ সব শেখানো চলবে না। যদি শেখাই তার পরিণতি ভয়ানক হবে।'

'তুমি তাদের চেন?'

'না। উঠতি মস্তান গোছের ছেলেগুলো, এ তল্লাটের বলে মনে হয় না। আমার কিন্তু সন্দেহ হয় এর পিছনে অরিতবাবু আছেন।'

'যিনিই থাকুন, কোন ভয় নেই তোমার। যেমন শেখাচ্ছ শিখিয়ে যাও।'

'আপনি জানেন না সুব্রতবাবু, লোকটা একেবারে হাড়বজ্জাত। দিদিকে মারার পিছনে লোকটার হাত ছিল। ওকে বিশ্বাস করবেন না?' জবা উত্তেজিত।

সুব্রত সোজা হয়ে বলল, 'কি বলছ তুমি! প্রমাণ দিতে পার?'

জবার মুখে সহসা কোন কথা এল না। সে মেয়েদের মুখ থেকে এ কথা শুনেছে। মেয়েরা অল-ইণ্ডিয়া-রেডিওর মত কত কি খবর দেয়। সেগুলোর মধ্যে কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক। বোঝা সত্যিই কঠিন। সে বলল, 'শোনা কথা। প্রমাণ দেব কি করে?'

'আমারও ওকে সন্দেহ হয়। হলেই বা, এভিডেন্স ছাড়া কিছু করা যায় না। শোন, তুমি লীনার কাছে যাও, বলো। ও এলে সব সমস্যা মিটে যাবে।'

'হ্যাঁ, আমারও এ কথা মনে হয়েছে। কিন্তু দিদি কি এখন আসবেন?'

এই সময় ভাবনাটা এল, চিঠিটা জবার কাছে দিলে কেমন হয়! সেও তো লীনাকে আসতে লিখেছে। একে পঞ্চায়েত, তায় জবার সমস্যা। দুই-ই তাকে ভাবাবে। সুব্রত খামটা এগিয়ে ধরল, 'এই চিঠিটা লীনাকে দিও। দেখ, যদি আসে।

খামটা দেখে হঠাৎ-ই মনে হল, সে না এলে হয়ত ডাকে দেওয়া হত। কেননা খামের উপরে ঠিকানাসহ লেখা রয়েছে লীনা চৌধুরী। চিঠিতে যাই লেখা থাক, একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, সেই লেখার মধ্যে লীনার এখানে আসার আবশ্যকতাও স্থান পেয়েছে।

এ নিয়ে আর কথা বাড়ানোর প্রয়োজন অনুভব করল না জবা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলি।'

পরদিন চলে এল বাগবাজারে। দুপুরের দিকে। ভাবল, এই সময় লীনাকে একা পাওয়া যাবে। পারমিতা কলেজে আর অর্কের বাড়ি ফিরতে তো রোজ প্রায় রাত সাতটা সাড়ে সাতটা হয়ে যায়।

বেল টিপতেই দরজা খুলল পারমিতা।

'ও, আপনি আছেন দিদি! আমি ভেবেছিলাম কলেজে।'

ততক্ষণে জবা ঘরে চলে এসেছে। দরজা বন্ধ করে পারমিতা বলল, 'না আজ একটু রেস্ট নিচ্ছি। তুমি গ্রামের বাড়ি থেকে?'

'না, হোস্টেল। অবশ্য আজই এসেছি।'

খাবার পর একটা গল্পের বই নিয়ে পারমিতাদের খাটে শুভ্রের পাশে শুয়েছিল লীনা। পড়তে পড়তে যখন তন্দ্রার আচ্ছন্নতায় ডুবে গিয়েছিল তখনই বইটা হাত থেকে খসে পড়েছিল। সেটা এখনও তার পাশে পড়ে রয়েছে। লীনার দিকে তাকিয়ে জবা বলল, 'দিদি ঘুমোচ্ছেন। ঠিক আছে, আমি পাশের ঘরে বসছি।'

পাশের ঘরে চলে গেল জবা। পারমিতা একটু গলা তুলে বলল, 'কেন, দরকার আছে নাকি? ডেকে দেব?'

'হ্যাঁ, সুব্রতবাবু একখানা চিঠি দিয়েছেন।'

চিঠির কথা শুনে কেন যেন অজান্তেই পারমিতার ঠোঁটে হাসি ফুটল।

'দাঁড়াও ডেকে দিচ্ছি।'

একটু পরে লীনা এল এ-ঘরে। পিছনে পারমিতা। জবার পাশে বসে লীনা বলল, 'কিছুদিন তো আমার পিছনে নষ্ট হল। এখন তোমার শিক্ষাকেন্দ্র কেমন চলছে ? মেয়েরা কতদূর এগোল ?'

'অনেক মেয়েই ট্রেনিং শেষ করেছে। এখনও মেয়েরা খুব উৎসাহভরে এগিয়ে আসছে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি ?'

'নতুন এক উৎপাত শুরু হয়েছে।'

'উৎপাত ! কিসের উৎপাত ?'

এবার জবা ব্যাপারটা বলল।

হঠাৎ লীনা অসহিষ্ণু হল, 'কি, এত সাহস। তুমি ওদের সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নাও, ভাল করে।'

পারমিতা উল্টোদিকে চেয়ারে বসে বলল, 'দ্যাখো, এখানে এরকম ঘটনা আকছার ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। গরম হলে চলবে না। পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে ঠাণ্ডামাথায়, সতর্কভাবে। আমার মনে হয়, তুমি গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জবা বলল, 'আমি সুব্রতবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। শুনে উনিও একথা বললেন, আর এই চিঠিটা দিলেন।

খামের মুখ খুলে চিঠি বের করে পড়ল লীনা। তারপর হাত বাড়িয়ে পারমিতাকে দিল, 'পড়ো বৌদি।'

এই সময় শুভ্র কেঁদে উঠল। পারমিতা একটু বিরক্ত হয়ে উঠে গেল। তারপর শুভ্রকে নিয়ে এসে জবাকে লক্ষ্য করে বলল, 'জবা, যাও, একটু ঘুরে এসো একে নিয়ে।'

জবা শুভ্রকে নিয়ে বেরিয়ে গেল, দরজা খুলে। পারমিতা চেয়ারে বসে চিঠিতে চোখ রাখল। সুন্দর হস্তাক্ষর। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—

লীনা,

নিশ্চয়ই ভাল আছ। এখানকার লোকে তোমার সম্পর্কে নানা কথা বলছে। এবার নাকি নারী-আন্দোলনে ভাটা পড়বে। তোমার চলার পথ বদলে যাবে। লোকে যাই বলুক, আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। বরং উল্টোটাই হবে, নারী-আন্দোলনে জোয়ার আসবে। তাই চলার পথ বদলে যাবে। আর আমার বারটা বাজবে।

বাজবে কি, বোধহয় এখনই বেজে গেছে। রোজ রাতে ঘুমের মধ্যে তোমাকে দেখি। লাল বেনারসী জড়ানো বেতস দেহ, চন্দনচর্চিত ভাল, কিংশুক লজ্জামাখা দুটো চোখ। অপূর্বা। তোমার অমন রূপ কখনও দেখিনি। শরীর ঘিরে সর্বগ্রাসী কম্পন ওঠে— যা ধীরে ধীরে ভেঙে দেয় সংযমের বাঁধ। সঙ্গে সঙ্গেই স্নায়ুতে দামামা বেজে ওঠে,

শরীরময় কামনার আগুন ভেসে বেড়ায়। শরীরপুজোয় নিজেকে নিবেদন করি! তোমার স্ফুরিত অধরে এঁকে দিই চুম্বন। কলার খোসার মত একটা একটা করে তোমার দেহের আবরণ খুলে ফেলি, চুম্বন করি স্তনফুলে। তারপর···না, থাক। কি দাম আছে এই স্বপ্নের? দিনের ঔজ্জ্বল্যে এক নির্মল অলীক।

সন্দেহ হয় তোমাকে। বিয়ে না হয় করিনি, কিন্তু অনূঢ়া জীবন তো দেখছি অহরহ। আকাশচুম্বী অট্টালিকা থেকে গরীবের পর্ণকুটীর সর্বত্র একই দৃশ্য। মূল্যবান যৌবনসম্ভার দেহময় সাজিয়ে, অতি সন্তর্পণে অনাঘ্রাত রেখে, কোন সুন্দর যুবা পুরুষের জন্যে শর্বরীর প্রতীক্ষা। তোমার কেন এই প্রতীক্ষা নেই? নাকি এক অসম্ভবের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতেছ? যে প্রতিযোগিতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কে জানে! কোন নারীবাদীকে খুব কাছ থেকে এই প্রথম দেখছি, তার ভিতরটা পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌দের মত দীর্ঘদিন ধরে খনন করা হয়নি। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কোন সত্য দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

যদি এমন কোন সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় যা পিতৃতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করার আবশ্যকীয় উপাদান, তাহলে নিজের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধে নামব। সৃষ্টির গোপন আকাঙ্ক্ষার ফুলগুলোকে অঞ্জলী দেব তোমার কর্মবেদিকায়, তোমারই মত।

হয়ত ভাবছ বাকসর্বস্ব বাঙালির মত বাকের বেসাতি করছি আকোমথিত স্বরে! না লীনা, কথার চেয়ে আমি কাজে দড়। এলেই দেখতে পাবে সেই কাজ—নিভাননী সোয়িং-কমপ্লেক্স।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। পঞ্চায়েত-অফিস এখন ছা-পোষা মধ্যবিত্তের বৈঠকখানা, কক্ষচ্যুত তারুণ্যের বিকৃত চিন্তার সূতিকাগার।

এই তো অবস্থা। অফিসে গেলে তোমার অভাব সত্যিই অনুভূত হয়। এখন ভেবে দেখ আসবে কিনা! এলে ভালো। না এলে আরও ভালো। কেননা এলেই তো তোমার বিরুদ্ধে শুরু হবে বহুমুখী, বহুরূপী আক্রমণ এবং তোমাকে বিকৃত, অস্বাভাবিক অপ্রকৃতিস্থ বলে হেয় করার কূট প্রচেষ্টা।

পরিশেষে, একটু ভালবাসা।

সুব্রত

দীর্ঘ চিঠিটা পড়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল পারমিতা। তারপর বলল, 'অদ্ভুত মানুষ। ওঁকে তোমার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করো না লীনা!'

'তুমি কি বলছ ওঁকে আমি বিয়ে করি?'

'সেটা তোমার অভিরুচি।'

'বিয়ে ছাড়া কোন শরীরী ভালবাসায় আমি বিশ্বাসী নই বৌদি।'

'তাহলে বিয়ে কর—'

'সেটাও সম্ভব নয়। চিঠিতে ওঁর যে আবেগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা কি আমার আছে?'

'মুক্ত বিয়ে তোমাদের সম্ভব নয়। কিন্তু প্রচলিত বিয়ে?'

'প্রচলিত বিয়ে মানেই তো পৌরুষের আস্ফালন দেখা। না না, ও বিয়েতে আমি রাজি না।'

'তাহলে তোমাদের বিয়ে আর হল না। মুক্ত বিয়ের যেমন একটা সুবিধে, এতে ছেলেমেয়ের বাহ্যিক রূপ প্রাধান্য পায় না, তেমনি একটা অসুবিধেও আছে, কিছু ছেলে বা মেয়ে এই বিয়ের শর্ত পূরণ করতে পারে না। তাদের চিরকাল বিয়ে না করে থাকতে হয়।'

'আমি তাই-ই থাকব। এবং বলব, আই ডোণ্ট নীড আ হাজব্যাণ্ড। আই হ্যাভ্ অল দ্যাট ওয়ান ওয়াণ্টস ইন আ হাজব্যাণ্ড; আ ডগ দ্যাট গ্রাউলস অল মর্নিং, আ প্যারট দ্যাট সোয়েরস অল আফটারনুন, অ্যাণ্ড আ ক্যাট দ্যাট ইজ নেভার অ্যাট হোম অ্যাট নাইট।'

পারমিতা হাসল, 'লীনা, তোমার সঙ্গে কেউ কণ্ঠ মেলাতে আসবে না। কেননা গ্রামে তো বটেই, শহরেও অধিকাংশ মেয়ে বোধদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীত্বের পাঠ নিতে শুরু করে। আর তখনই মনে মনে কল্পবাসর রচনা করে ফেলে। তবে পণ নিয়ে যেভাবে নারীকে শিখণ্ডী করে নারীর উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তাতে অচিরে যদি অসংখ্য মেয়ে তোমার সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে আসে, বিস্ময়ের কিছু নেই।'

পারমিতা থামামাত্র শুভ্র ছুটে এসে তার কোলে মুখ গুঁজল। পিছনে জবার দূরাগত কণ্ঠস্বর, শুভ্র, শোন—শোন—

জবা প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল। ইতিমধ্যে শুভ্রকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে পারমিতা। হাপরের মত বুকের ওঠা-নামার সঙ্গে জবার মুখ দিয়ে ছিটকে বেরল, দুষ্টু ছেলে!

লীনার দৃষ্টি জবার উপর নিবদ্ধ হল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, জবা, 'তোমার মা হতে ইচ্ছে করে?'

এহেন প্রশ্নে লজ্জিত হল না জবা। প্রথমে পারমিতার তারপর লীনার দিকে তাকাল, 'মা হবার জন্যে তো মেয়েদের জন্ম।'

হা হা করে হেসে উঠল পারমিতা। তারপর বলল, 'অভিজ্ঞতার ঝুলি আর একটা অভিজ্ঞতায় ভারি হল। কি বলো? তাই না?'

লীনা বাক্যহারা। পারমিতা বলে কি! সে কি একথা জানে না?

আসলে পারমিতা তার কথা ঠিক মত হৃদয়সঙ্গম করতে পারেনি। জবার মত তার ভিতরে এখনও কোথাও যেন অন্ধকার আটকে আছে। সচেতন নারীবাদী ভাবনায় বাধা দিচ্ছে। সে মনে মনে বলল, নারীবাদী হওয়া সহজ নয়।

॥ একুশ ॥

অতঃপর আচমকা পারমিতা চলে গেল। যে আলাপ চলছিল তাতে দাঁড়ি পড়ল অনিবার্যভাবে। লীনা, নিজের ব্যক্তিগতবোধে, একান্ত নৈঃসঙ্গের চাপে, স্বতই নীরব হয়ে গেল।

এই সময় টেলিফোনটা বাজল। লীনা ফোন তুলে নিল, হ্যালো।

'সুব্রত বলছি···কে, লীনা ?'

'হ্যাঁ···বল।'

'চিঠি পেয়েছ নিশ্চয়ই···'

লীনার গাল কপাল এমনিতেই লালচে, সুব্রতের এই কথায় সে আরও আরক্ত হয়ে উঠল! হঠাৎ সে যেন সুব্রতের বিমূর্ত উপস্থিতি অনুভব করল। সেই অনুভূতি ক্রমে রক্তের মত ছড়িয়ে পড়ল অস্তিত্বে। কোন কথা এল না মুখে। স্তব্ধ হয়ে রইল ক'-মুহূর্ত। সোহাগ রাতের নববধূর মত অজানা আশঙ্কায় বুকটা ঢিপঢিপ করতে থাকল। সুব্রত ভাবল, বোধহয় লাইন কেটে গেছে, সে বলল, 'হ্যালো, হ্যালো, লীনা !'

'হ্যাঁ···কি সব লিখেছ ! খুব রাগ হচ্ছে।'

'সরি ! একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে।'

'আজকাল সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি করছ। কি ফোন, কি চিঠি···'

'সরি !'

'থাক· ·হয়েছে। কাকু কেমন আছেন···সুব্রত ?'

'খুব ভাল। একটু থেমে সুব্রত বলল, তুমি কি কাল পরশু আসছ ?'

'হ্যাঁ···কাল যাব।'

'উঃ, কি ভাল লাগছে শুনে।'

'আচ্ছা, কত বড় ঘরের ছেলে তুমি। বিয়ে করলে অর্ধেক রাজত্ব সমেত রাজকন্যা পাবে। আমাকে ঘিরে এত আবেগ ছড়াচ্ছ কেন বলতো ?'

'কি জানি ··হয়ত রাজকন্যা চাই না বলে···'

'ও, হোপলেস ! কি কুক্ষণে যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

ও-প্রান্ত থেকে সুব্রতের হাসির শব্দ ভেসে এল। লীনা বলল, 'তুমি হাস, হাসতে থাক। আমি কিন্তু রাখছি···গুডবাই।'

লীনা যখন ফোন ছাড়ল তখন জবার সারা মুখে রাতের নক্ষত্রের সহাস দীপ্তি। এই ঔজ্জ্বল্য বোধহয় লীনার ভিতরের সাধারণ মেয়েটার অপ্রত্যাশিত দর্শন আর তার নিজস্ব প্রাপ্তি এই দুয়েরই মিলিত চাপা আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। লীনা ফিরে তাকাতে জবা সহাস্য মুখে বলল, উঠে দাঁড়িয়েই, 'দিদি, আমার ফিরতে কিন্তু দু-একদিন দেরি হবে। আসি।'

ইতিমধ্যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। লীনা লক্ষ্মণকে ডেকে বলল, 'কাল এখান থেকে চলে যাচ্ছি। অন্য কোথাও না, গ্রামের বাড়ি। শোন, সকাল দশটায় চলে আসবে। মাকে বলে আসবে কিন্তু...'

লক্ষ্মণ রোজকার মত জি বলে চলে গেল। পরদিন দশটার একটু পরে বেরিয়ে পড়ল লীনা। বাড়ি এসে গাড়ি থেকে নেমে সে দেখল চারপাশে অনেক লোক, অধিকাংশই মেয়ে। একটু অবাক হল। তার আসার সংবাদ এত তাড়াতাড়ি এরা পেল কি করে! সে একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল। তারপর তাদের দিকে হাসিমুখে হাত নেড়ে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল। আর তখনই শুনতে পেল শ্লোগান, সম্মিলিত কণ্ঠের, নারী-আন্দোলন জিন্দাবাদ...

পরদিন সকাল সাতটায় এল সুব্রত। একা। নিজে ড্রাইভ করে। লীনা চা খেয়ে সবে চেয়ারে বসে বাঁ হাত দিয়ে লেখা প্রাকটিস করতে শুরু করেছিল, এই প্রথম নয়, আগেও কলকাতায় কিছুদিন প্রাকটিস করেছে, ঠিক সেই সময় সামনে মুক্ত হাসি মেখে দাঁড়াল সুব্রত। 'এসে গেলাম।'

লীনা হেসে মুখ তুলল, 'বসো।'

'সময় নেই।' লীনা শুনছে জেনেই গলা পরিষ্কার করে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল সুব্রত, 'আজ বিকেলে কলকাতায় যেতে হবে। মায়ের হুকুম। চলো এখন তোমাকে কমপ্লেক্সটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই।'

'এখন!' লীনা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সুব্রতের দিকে, 'এই রোদের তাতের মধ্যে।'

'এ সময়ের রোদ একটু দেরিতেই তাতে। ওঠো, ওঠো তো—'

অগত্যা সুব্রতের সঙ্গে বেরতে হল। গেট পর্যন্ত পাশাপাশি হেঁটে এল। গাড়ির কাছে এসে হঠাৎ সুব্রত বলল, 'এসো।' বলেই সে গন্তব্যস্থলের উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল।

লীনা নড়ল না। বলল, 'কোথায়?'

'আরে, এসো না—'

এই প্রথম লীনা যেন একটু দ্বিধায় পড়ল। একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, 'না, আগে বলো—'

সুব্রত দাঁড়াল। 'মন্দিরে।'

সামনে মোড়ের উল্টোদিকে রামসুন্দরের বাড়ি যাবার গলির মুখে ডানদিকে একটা কালীমন্দির আছে। পুরনো। লীনার মনে হল, মন্দিরে গেলে সুব্রত নিশ্চয়ই প্রণামী দিয়ে আশীর্বাদী ফুলটুল নিতে বলবে। সে বলল, 'না, ওখানে যাব না।'

'সেকি! কেন?'

'ভক্তি আসে না। হয়ত উপবীতহীন পুরুষ বা নারীর পৌরোহিত্যের অধিকার নেই বলে।'

সুব্রত শব্দ করে হেসে উঠল। 'তুমি একটা পাগল। হিন্দুধর্মে একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই পৌরোহিত্যের অধিকার আছে।'

'তাই নাকি ?'

'কেন, তুমি জান না ?'

'জানি। কিন্তু মেনে নিতে পারছি না। মাতৃপুজোর জন্যে উপবীতধারী দ্বিজ ব্রাহ্মণ লাগবে কেন ? যে-মানব মাতৃগর্ভে তিলে তিলে বড় হয় তাকে কেন উপনয়নের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়বার শুদ্ধ জন্ম নিতে হয় ? এর মধ্য দিয়ে কি প্রমাণ হয় না মাতৃগর্ভ অশুচি, অপবিত্র ? উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ছাড়া সব মানুষের জন্ম অশুদ্ধ ? মাতৃগর্ভের নামে পরোক্ষে মানবতাকে অপমান করা হচ্ছে ?'

সুব্রত এই মুহূর্তে স্তম্ভিত, বিষণ্ন না আতঙ্কিত বোঝার কোন উপায় নেই, যদিও গাছের ছায়ামাখা পথে ক'পা হেঁটে তার পাশের সীটে বসে অপলকে তাকিয়ে রইল লীনা। এবং তার কথা শুনে চমকে উঠল।

'গাড়ি কি ছেড়ে দেব, এখন ?'

'হ্যাঁ, ছাড়ো', সামনের দিকে তাকাল লীনা।

এবার গাড়িতে স্টার্ট দিল সুব্রত। ইতিমধ্যে কখন যে অরিত তাদের দেখে মোড়ে একটা নারকোল গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল কেউ-ই তা খেয়াল করেনি। এবার সে কমপ্লেক্সের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কমপ্লেক্সের প্রবেশপথের অদূরে গাড়ি রাখল সুব্রত।

চারদিক ঘুরেটুরে দেখে লীনা দারুণ খুশি। সে এত আশা করেনি। গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে সামনে কারখানার মত তিনটে লম্বা লম্বা শেড, ডানদিকে ছোট গুদামঘর, বাঁদিকে কাটিং শপ, পাশে অফিস-ঘর।

ঘুরিয়ে দেখানো শেষ হলে সুব্রত বলল, 'এসো, ওখানে একটু বসি।'

একটা উঁচু ঢিপির মত জায়গায় একটা ঝুপসি বাবলা গাছ ছিল। সেই গাছের নিবিড় ছায়ায় গাছটাকে ঘিরে একটা শান বাঁধানো চত্বর। এটা সুব্রতই করিয়ে নিয়েছে।

বসার পর লীনা বলল, 'বাঃ, সুন্দর ! ভারী সুন্দর।'

'কি, এই চত্বর না সবকিছুই ?' পাশে বসে সুব্রত বলল।

'সব কিছুই।'

'আমিও ?'

লীনা নিঃশব্দে মুখ ফেরাল সুব্রতের দিকে। সুব্রত নেশাচ্ছন্ন মানুষের আতুরতায় লীনার কপাল, নাক, ঠোঁট, চিবুক স্পর্শ করল চোখের ভাষা দিয়ে। সেই মুহূর্তে লীনা তাকাল দূরে, লাল টকটকে সূর্যটার দিকে। মনে মনে বলল, হে সূর্যদেব, ওই আগুন বুকে নিয়েও সৃষ্টি বাঁচাতে পারতে না, যদি না পৃথিবীর উর্বরা শক্তি থাকত। মাত্র একটা কি দুটো মুহূর্ত, কেননা ইতিমধ্যে সুব্রত তার একটা হাত মুঠোর মধ্যে নিয়েছে। সে পুনরায় মুখ ফেরাল, কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিল না। বলল, 'সুব্রত, তুমি একটা বিয়ে কর।'

এই কথা শুনে সুব্রতের আঙুলগুলো সাঁড়াশির মত তার বাহুতে চেপে বসল। একি বেদনার আড়ষ্টতা সুব্রতের, দুর্নিবার কষ্ট !

'প্লিজ, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে ভালবাসি। তাই চাই, তুমি সুখী হও।'

ইতিমধ্যে ভিতরে ঢুকে ওদের কিছুক্ষণ লক্ষ্য করেছিল অরিত। ওরা উল্টোদিকে মুখ করে বসে রয়েছে। দেখতে পায়নি। সতর্ক অরিত নিঃশব্দে কার্টিশপ আর অফিসের মাঝখানের সরু গলিটায় চলে গেছে, আড়াল-আবডালের আর জায়গা না পেয়ে। সে দেখল, সুব্রতের মুখ জমাট বাঁধা লাভার মত কঠিন হয়ে উঠল। হঠাৎই উঠে দাঁড়াল।

না।

'আমি আগে বুঝতে পারিনি, তুমি আমাকে নিয়ে খেলছ। ছিঃ!

লীনাকে চমকে দিয়ে অতি দ্রুততার মধ্যে চোখের পলকে সে বাইরে চলে গেল, যদিও এর মধ্যে লীনা তাকে অনুনয়ের গলায় দুবার ডেকেছে, শোন সুব্রত, শোন!

এবার উঠে পড়ল লীনা। পা বাড়াতে না বাড়াতেই তার কানে এল, 'আরে, লীনা যে! কবে এলে?'

বলার ভঙ্গিটা এমন যে লীনা ভাবল, সে এইমাত্র এসেছে। এবং তাকে দেখেছে। কিন্তু এখানে এসেছে কেন অরিত? প্রশ্নটা মনে জাগলেও ভিতরে একটুও আশঙ্কার মেঘ জমল না। বলল, 'কাল। অকটু ব্যস্ত আছি। চলি।'

কথাটা বলেই মনে হল, না বললেই পারত। সুব্রতকে দেখে থাকলে সন্দেহ করতেও পারে। সত্যিই যদি অন্য উদ্দেশ্য থাকে, এই সন্দেহ কাজে লাগাতে পারে।

এবারও পা বাড়াতে না বাড়াতেই বাধা এল। অরিত খপ্ করে তার হাতটা ধরে বলল, 'এখুনি চলে যাবে। এসো, দুদণ্ড বসে গল্প করি।'

লীনা হিলহিলে গলায় বলল, 'জানোয়ার একটা।' বলেই আচমকা টানে ছাড়িয়ে নিল হাত।

অরিতের কানে এই দুটো শব্দের একটা বাক্য গ্রীষ্মের লু-র ফোস্কা উত্তাপ ছড়াল। তার চোখমুখে ফুটে উঠল তান্ত্রিকের মনুষ্যনিধনক্রূরতা। মুহূর্তের মধ্যে সে ফের চেপে ধরল তার হাত। 'এসো।'

অরিতের তীব্র আকর্ষণে সে দেহের ভারসাম্য রাখতে পারল না। সে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, সময়মত ধরে ফেলায় সে পড়ল অরিতের বুকের উপর। দুটো নরম ভেলভেটের বল যেন চেপে বসল তার বুকে। মুহূর্তে তীব্র উত্তেজনা তার শরীরে চারিয়ে গেল। নিজেকে সামলাতে পারল না, ব্যস্ত চুম্বন এঁকে দিল তার মুখে।

লীনার মনে হল একটা ভয়ংকর অজগর সাপ পেঁচিয়ে ধরেছে তাকে। ভয়ে বুক হিম হয়ে গেল। তবু নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার ব্যর্থ প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে ক'বার চিৎকার করল, সুব্রত, বাঁচাও...বাঁচাও।

ব্যস, সেই শেষ। এর পর গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া কিছু বের হল না। অচেতন দেহের সমস্ত ভার অরিতের উপর পড়ল। আকস্মিক অভাবিত ঘটনায় বিহ্বল হয়ে সে কি করবে ঠিক করতে পারছিল না, ঠিক সেই মুহূর্তে লক্ষ্য করল অফিস-ঘরের দরজা খোলা। নিমেষের মধ্যে সে লীনার অচেতন দেহটা নিয়ে ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিল।

লীনার বেশবাস অসংবৃত। কাপড় সরে যাওয়ায় একটা বুক কুমারী অহংকারে উদ্ধত, নিচের কাপড় উঠে এসেছে প্রায় হাঁটু ইস্তক। সেদিকে তাকাতেই অরিতের সারা শরীর শিউরে উঠল একবার, নিঃশ্বাস ঘন হল। শেষ পর্যন্ত অরিত আর অরিত থাকল না। হিংস্র জন্তুর মত খুবলে খুবলে খেতে আরম্ভ করল তার শরীরটা।

লীনার চিৎকারের শব্দ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভেঙে ভেঙে পড়েছিল সুব্রতের কানে। বিস্ময় আর আশঙ্কা চমকানো চোখে নেমে পড়েছিল গাড়ি থেকে। ধাতস্থ হয়ে বুঝতে যেটুকু সময় লেগেছিল, তারপরই ছুটে গিয়েছিল চত্বরের কাছে।

ততক্ষণে অরিত ঢেলে দিয়েছিল নোনা পাপ—তীব্র, গাঢ়। এবং বেরিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল সেই একই জায়গায়।

লীনা নেই, হা হা বাতাসের মধ্যে সে দিশেহারা। এই বিমূঢ়তার পাশাপাশি সে ভেবে কূল পেল না লীনার আকস্মিক অন্তর্ধান কিংবা চিৎকারের আগুপিছু।

এই ভাবনার মধ্যেই সে অসহায় উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল এদিক-ওদিক। এবং ফাঁকে ফাঁকে ডেকে চলল ক্রমাগত, লীনা—লীনা—

গাছে বসেছিল দু-চারটে কাক আর শালিক। এই শব্দে একবার তারা ড্যাবড্যাব করে তাকাল, তারপর ঝটপট করে উড়ে গেল।

এভাবে ডাকতে-ডাকতে আর তাকাতে-তাকাতে যেই সুব্রত অফিস-ঘরের সামনে এল, অমনি তরল একটা আগুনের হলকা বুক থেকে মাথা ছুঁয়ে ঠাণ্ডা হিমের ধারায় দ্রুত নেমে এল শিরদাঁড়া বেয়ে। একটুক্ষণের মধ্যে সে ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। অগোছালো কাপড় ঠিকঠাক করে দিয়ে করুণ চোখ মেলে দিল তার দিকে। কাঁপা-কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল, হা ঈশ্বর!

এই ফাঁকে, অতি সন্তর্পণে, নিঃশব্দে অফিস-ঘরের পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে গেল অরিত।

সুব্রত দাঁড়িয়ে। তার চোখে সমুদ্র। বুকে আগুন। মনে একটা প্রশ্ন—কে এই সর্বনাশ করল লীনার?

ছোট্ট প্রশ্ন, কিন্তু ভারী। ভিতরে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, উঠছে ধকধক শব্দ। এইটুকুই যা! বাকি সমস্ত চরাচরে তুলো ওড়া স্তব্ধতা।

ভিতরের উত্তেজনা কমতে বোধহীনভাব কাটিয়ে নিজেকে ক্রমে সামলে নিতে একটু সময় লাগল। এই প্রশ্নের উত্তর তো লীনা দিতে পারে সহজে!

সে এক নিমেষ বাইরে তাকিয়ে উবু হয়ে বসল, ডাকল, লীনা—লীনা—

কোন সাড়াশব্দ নেই। চুপ করে গেল সে। একটু ভেবে উঠে দাঁড়াল। নাঃ, জল আনতে হয়!

এই সময় লীনা চোখ মেলল। অনিশ্চিত ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিতে তাকাল চারপাশে। উঠে বসে সুব্রতকে দেখল। সে কিছু বলতে গিয়েও যেন বলল না। বোধহয় মনে পড়েছে সব—সব কিছুই। সে ভুরু কুঁচকে তাকাল গায়ের দিকে। নিজেরই। ফর্দাফাই ব্লাউজের ভিতর থেকে সাদা ফর্সা স্তনযুগলের খানিক পাতলা শাড়ির বাইরে

অস্পষ্ট দৃশ্যমান। কাপড়টা ঠিকঠাক করে গায়ে জড়িয়ে নিল যথাসম্ভব। সুব্রতের সামনেই। নেই তেমন কোন অস্বস্তিবোধ। তারপর তাকাল সুব্রতের দিকে। মুখখানা যেন জলভরা মেঘ।

সেই মুহূর্তে সুব্রত বলল, 'কে তোমার এই সর্বনাশ করেছে?'

এবার চোখের কোণ ছাপিয়ে টপটপিয়ে নেমে এল জল, হাতের চেটোতে তা মুছে নিয়ে বলল, 'অরিত।'

সুব্রত প্রায় গলা ফাটিয়ে গর্জন করে উঠল, 'স্কাউন্ড্রেল। ওকে আমি ছাড়ব না কিছুতেই। লক-আপে পুরে মারব।'

'সুব্রত, প্লিজ! আমি তো শেষ হয়ে গেছি—'

'তোমার মুখে এ কথা! আশ্চর্য! একটা পশুর থাবায় দু'ফোঁটা রক্ত ঝরতে পারে, কিন্তু কেউ শেষ হয়ে যায় না। ওঠো।'

সুব্রত তার হাত ধরল। সুব্রত ঝুঁকে আছে তার দিকে। মনে হল একটা আধুনিক পুরুষ যার কাছে নারী শুধু রক্তমাংসের শরীর নয়, পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ।

ভিতরের না হলেও মুখের অন্ধকারটুকু সরে গেল। সে উঠে দাঁড়াল।